তাফহীমুল কুরআন

PART- 09

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.

www.banglabookpdf.blogspot.com

আল মু'মিনূন

২৩

নামকরণ

প্রথম আয়াত قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু উভয়টি থেকে জানা যায়, এ সূরাটি মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়। প্রেক্ষাপটে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত চলছে। কিন্তু তখনো কাফেরদের নির্যাতন নিপীড়ন চরমে পৌঁছে যায়নি। ৭৫–৭৬ আয়াত থেকে পরিষ্কার সাক্ষ পাওয়া যায় যে, মক্কী যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়। উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরা নাযিল হওয়ার আগেই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারীর বরাত দিয়ে হযরত উমরের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাযিল হয়। অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন এবং এ অবস্থা অতিবাহিত হবার পর নবী (সা) বলেন, এ সময় আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি কেউ সে মানদণ্ডে পুরোপুরি উতরে যায় তাহলে সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শোনান।

বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

রসূলের আনুগত্য করার আহবান হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এখানে বিবৃত সমগ্র ভাষণটি এ কেন্দ্রের চারদিকেই আবর্তিত।

বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয় ঃ যারা এ নবীর কথা মেনে নিয়েছে তাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণাবলী সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবে এ ধরনের লোকেরাই দুনিয়ায় ও আখেরাতে সাফল্য লাভের যোগ্য হয়।

এরপর মানুষের জন্ম, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং বিশ্ব-জাহানের অন্যান্য নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া যে, এ নবী তাওহীদ ও আখেরাতের যে চিরন্তন সত্যগুলো তোমাদের মেনে নিতে বলছেন তোমাদের নিজেদের সত্তা এবং এই সমগ্র বিশ্ব–ব্যবস্থা সেগুলোর সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে।

তারপর নবীদের ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী শুরু হয়ে গেছে। আপাত দৃষ্টিতে এগুলো কাহিনী মনে হলেও মূলত এ পদ্ধতিতে শ্রোতাদেরকে কিছু কথা বুঝানো হয়েছে ঃ

এক ঃ আজ তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ পোষণ ও আপত্তি উত্থাপন করছো সেগুলো নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বেও যেসব নবী দুনিয়ায় এসেছিলেন, যাদেরকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে থাকো, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে তাঁদের যুগে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা এ একই আপত্তি করেছিল। এখন দেখো ইতিহাসের শিক্ষা কি, আপত্তি উত্থাপনকারীরা সত্যপথে ছিল, না নবীগণ?

দুই ঃ তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা দিচ্ছেন এই একই শিক্ষা প্রত্যেক যুগের নবী দিয়েছেন। তার বাইরে এমন কোন অভিনব জিনিস আজ পেশ করা হচ্ছে না যা দুনিয়াবাসী এর আগে কখনো শুনেনি।

তিন ঃ যেসব জাতি নবীদের কথা শোনেনি এবং তাঁদের বিরোধিতার ওপর জিদ ধরেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে।

চার ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক যুগে একই দীন এসেছে এবং সকল নবী একই জাতি বা উম্মাহভুক্ত ছিলেন। সেই একমাত্র দীনটি ছাড়া অন্য যেসব বিচিত্র ধর্মমত তোমরা দুনিয়ার চারদিকে দেখতে পাচ্ছো এগুলো সবই মানুষের স্বকপোলকল্পিত। এর কোনটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়।

এ কাহিনীগুলো বলার পর লোকদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, পার্থিব সমৃদ্ধি, অর্থ–সম্পদ, সন্তান–সন্ততি, প্রভাব–প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এমন জিনিস নয় যা কোন ব্যক্তি বা দলের সঠিক পথের অনুসারী হবার নিশ্চিত আলামত হতে পারে। এর মাধ্যমে একথা বুঝা যায় না যে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তার নীতি ও আচরণ আল্লাহর কাছে প্রিয়। অনুরূপভাবে কারোর গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার ও তার নীতির প্রতি বিরূপ। আসল জিনিস হচ্ছে মানুষের ঈমান, আল্লাহ ভীতি ও সততা। এরি ওপর তার আল্লাহর প্রিয় অপ্রিয় হওয়া নির্ভর করে। একথাগুলো এজন্যে বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় সে সময় যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল তার সকল নায়কই ছিল মক্কার বড় বড় নেতা ও সরদার। তারা নিজেরাও এ আত্মম্ভরিতায় ভুগছিল এবং তাদের প্রভাবাধীন লোকেরাও এ ভুল ধারণার শিকার হয়েছিল যে, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হচ্ছে এবং যারা একনাগাড়ে সামনের দিকে এগিয়েই চলছে তাদের ওপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ও দেবতাদের নেক নজর রয়েছে। আর এ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত লোকেরা যারা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আছে এদের নিজেদের অবস্থাই তো একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ এদের সাথে নেই এবং দেবতাদের কোপ তো এদের ওপর পড়েই আছে।

এরপর মক্কাবাসীদেরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাসী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদেরকে জানানো হয়েছে, তোমাদের ওপর এই যে দুর্ভিক্ষ নাযিল হয়েছে এটা একটা সতর্ক বাণী। এ দেখে তোমরা

নিজেরা সংশোধিত হয়ে যাও এবং সরল সঠিক পথে এসে যাও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। নয়তো এরপর আসবে আরো কঠিন শাস্তি, যা দেখে তোমরা আর্তনাদ করতে থাকবে।

তারপর বিশ্ব-জাহানেও তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যে যেসব নিদর্শন রয়েছে সেদিকে তাদের দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট করা হয়েছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, চোখ মেলে দেখো। এই নবী যে তাওহীদ ও পরকালীন জীবনের তাৎপর্য ও স্বরূপ তোমাদের জানাচ্ছেন চারদিকে কি তার সাক্ষদানকারী নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে নেই? তোমাদের বুদ্ধি ও প্রকৃতি কি তার সত্যতা ও নির্ভুলতার সাক্ষ দিচ্ছে না?

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তোমার সাথে যাই ব্যবহার করে থাকুক না কেন তুমি ভালোভাবে তাদের প্রত্যুত্তর দাও। শয়তান যেন কখনো তোমাকে আবেগ উচ্ছল করে দিয়ে মন্দের জবাবে মন্দ করতে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ না পায়।

বক্তব্য শেষে সত্য বিরোধীদেরকে আখেরাতে জবাবদিহির ভয় দেখানো হয়েছে। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সত্যের আহবায়ক ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যা করছো সেজন্য তোমাদের কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ ۝٤

নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা[১] যারা ঃ

নিজেদের[২] নামাযে বিনয়াবনত[৩] হয়,

বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে,[৪]

যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে,[৫]

১. মু'মিনরা বলতে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তাঁকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছে এবং তিনি জীবন যাপনের যে পদ্ধতি পেশ করেছেন তা অনুসরণ করে চলতে রাজি হয়েছে।

মূল শব্দ হচ্ছে 'ফালাহ'। ফালাহ মানে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। এটি ক্ষতি, ঘাটতি, লোকসান ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। যেমন اَفْلَحَ الرَّجُلُ মানে হচ্ছে, অমুক ব্যক্তি সফল হয়েছে, নিজের লক্ষে পৌঁছে গেছে, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে গেছে, তার প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছে, তার অবস্থা ভালো হয়ে গেছে।

قَدْ اَفْلَحَ "নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ করেছে।" এ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করার গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে হলে যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা অপরিহার্য। তখন একদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াত বিরোধী সরদারবৃন্দ। তাদের ব্যবসা–বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল। তাদের কাছে ছিল প্রচুর ধন–দওলত। বৈষয়িক সমৃদ্ধির যাবতীয় উপাদান তাদের হাতের মুঠোয় ছিল। আর অন্যদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াতের অনুসারীরা। তাদের অধিকাংশ তো আগে থেকেই ছিল গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত। কয়েকজনের অবস্থা সচ্ছল থাকলেও অথবা কাজ–কারবারের ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই সফলকাম থাকলেও সর্বব্যাপী বিরোধিতার কারণে তাদের অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় যখন "নিশ্চিতভাবেই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে" বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তখন এথেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়ে এসেছে যে, তোমাদের সাফল্য ও ক্ষতির মানদণ্ড ভুল, তোমাদের অনুমান ত্রুটিপূর্ণ, তোমাদের দৃষ্টি দূরপ্রসারী নয়, তোমাদের নিজেদের যে সাময়িক ও সীমিত সমৃদ্ধিকে সাফল্য মনে করছো

তা আসলে সাফল্য নয়, তা হচ্ছে ক্ষতি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনুসারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও অসফল মনে করছো তারাই আসলে সফলকাম ও সার্থক। এ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করবে। আর ওকে প্রত্যাখ্যান করে তোমরা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। এর খারাপ পরিণতি তোমরা এখানেও দেখবে এবং দুনিয়ার জীবনকাল শেষ করে পরবর্তী জীবনেও দেখতে থাকবে।

এ হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এ সূরার সমগ্র ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. এখান থেকে নিয়ে ৯ আয়াত পর্যন্ত মু'মিনদের যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ। অন্য কথায়, বলা হচ্ছে, যেসব লোক এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী তারা কেনইবা সফল হবে না। এ গুণাবলী সম্পন্ন লোকেরা ব্যর্থ ও অসফল কেমন করে হতে পারে। তারাই যদি সফলকাম না হয় তাহলে আর কারা সফলকাম হবে।

৩. মূল শব্দ হচ্ছে "খুশূ"। এর আসল মানে হচ্ছে কারোর সামনে ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ অবস্থাটার সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও। মনের খুশূ' হচ্ছে, মানুষ কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরুন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর দেহের খুশূ' হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যংগ ঢিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কন্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে। নামাযে খুশূ' বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন এবং সাথে সাথে এও দেখলেন যে, সে নিজের দাড়ি নিয়ে খেলা করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, لو خشع قلبه خشعت جوارحه "যদি তার মনে খুশূ' থাকতো তাহলে তার দেহেও খুশূ'র সঞ্চার হতো।"

যদিও খুশূ'র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ' আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, যেমন ওপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে এখনই জানা গেলো, তবুও শরীয়াতে নামাযের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশূ' (আন্তরিক বিনয়-নম্রতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশূ'র হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় নামাযের কর্মকাণ্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, নামাযী যেন ডাইনে বামে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে ওপরের দিকে না তাকায়, (বড়জোর শুধুমাত্র চোখের কিনারা দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে পারে। হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম না করা উচিত। কিন্তু মালেকীগণ মনে করেন দৃষ্টি সামনের দিকে থাকা উচিত।) নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদা করার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। গর্বিত ভংগীতে

খাড়া হওয়া, জোরে জোরে ধমকের সুরে কুরআন পড়া অথবা কুরআন পড়ার মধ্যে গান গাওয়াও নামাযের নিয়ম বিরোধী। জোরে জোরে আড়মোড়া ভাংগা ও ঢেকুর তোলাও নামাযের মধ্যে বেআদবী হিসেবে গণ্য। তাড়াহুড়া করে টপাটপ নামায পড়ে নেয়াও ভীষণ অপছন্দনীয়। নির্দেশ হচ্ছে, নামাযের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে সম্পন্ন করতে হবে। এক একটি কাজ যেমন রুকূ', সিজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ অন্য কাজ শুরু করা যাবে না। নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে তা দূর করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা উভয় হাত একসাথে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে নামাযের মধ্যে জেনে বুঝে নামাযের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা–ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। কিন্তু মানুষের পূর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে নামাযের সময় তার মন যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে সে যা কিছু উচ্চারণ করে মনও যেন তারই আর্জি পেশ করে। এ সময়ের মধ্যে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তাভাবনা এসে যায় তাহলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সজাগ হবে তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

৪. মূলে لغو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও যাতে কোন ফল লাভও হয় না। যেসব কথায় বা কাজে কোন লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয়—সেগুলো সবই 'বাজে' কাজের অন্তরভুক্ত।

مُعْرِضُوْنَ শব্দের অনুবাদ করেছি 'দূরে থাকে'। কিন্তু এতটুকুতে সম্পূর্ণ কথা প্রকাশ হয় না। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতুহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরনের কাজ চলতে থাকে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ করতে বিরত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে, এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্ততপক্ষে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। একথাটিকেই অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

"যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।" (আল ফুরকান, ৭২ আয়াত)

এ ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অন্তরভুক্ত। মু'মিন এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে সবসময় দায়িত্বানুভূতি সজাগ থাকে, সে মনে করে দুনিয়াটা আসলে একটা পরীক্ষাগৃহ। যে জিনিসটিকে জীবন, বয়স, সময় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেটি আসলে একটি মাপাজোকা মেয়াদ। তাকে পরীক্ষা করার জন্য এ সময়–কালটি দেয়া হয়েছে। যে ছাত্রটি

পরীক্ষার হলে বসে নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব লিখে চলছে সে যেমন নিজের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে পূর্ণ ব্যস্ততা সহকারে তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দেয়, এ অনুভূতিও ঠিক তেমনি মু'মিনকে গুরুত্ব ও ব্যস্ততা সহকারে নিমগ্ন করে দেয়। সেই ছাত্রটি যেমন অনুভব করে পরীক্ষার এ ঘন্টা ক'টি তার আগামী জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং এ অনুভূতির কারণে সে এ ঘন্টাগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের সঠিক জবাব লেখার প্রচেষ্টায় ব্যয় করতে চায় এবং এগুলোর একটি সেকেণ্ডও বাজে কাজে নষ্ট করতে চায় না, ঠিক তেমনি মু'মিনও দুনিয়ার এ জীবনকালকে এমন সব কাজে ব্যয় করে যা পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর। এমনকি সে খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও এমন সব জিনিস নির্বাচন করে যা নিছক সময় ক্ষেপণের কারণ হয় না বরং কোন অপেক্ষাকৃত ভালো উদ্দেশ্যপূর্ণ করার জন্য তাকে তৈরি করে। তার দৃষ্টিতে সময় 'ক্ষেপণ' করার জিনিস হয় না বরং ব্যবহার করার জিনিস হয়। অন্য কথায়, সময় কাটানোর জিনিস নয়—কাজে 'খাটানোর' জিনিস।

এ ছাড়াও মু'মিন হয় একজন শান্ত-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গপ্ মারা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যাংগ, কৌতুক, ও হাল্কা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা-মস্করা ও ভাঁড়ামি বরদাশত করতে পারে না এবং আনন্দ-ষ্ফূর্তি ও ভাঁড়ামির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না। তার জন্য তো এমন ধরনের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকে না। আল্লাহ তাকে যে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন তার একটি অন্যতম নিয়ামত তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً " সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না।"

৫. "যাকাত দেয়া" ও "যাকাতের পথে সক্রিয় থাকা"র মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিরাট ফারাক আছে। একে উপেক্ষা করে উভয়কে একই অর্থবোধক মনে করা ঠিক নয়। এটা নিশ্চয়ই গভীর তাৎপর্যবহ যে, এখানে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ এর সর্বজন পরিচিত বর্ণনাভংগী পরিহার করে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ এর অপ্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে "পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা তথা পরিশুদ্ধি" এবং দ্বিতীয়টি "বিকাশ সাধন"—কোন জিনিসের উন্নতি সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো দূর করা এবং তার মৌল উপাদান ও প্রাণবস্তুকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা। এ দু'টি অর্থ মিলে যাকাতের পূর্ণ ধারণাটি সৃষ্টি হয়। তারপর এ শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হলে এর দু'টি অর্থ প্রকাশ হয়। এক, এমন ধন-সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দুই, পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটি। যদি يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয় বা আদায় করে। এভাবে শুধুমাত্র সম্পদ দেবার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার কাজ করে এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটি

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٧

নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে,[৬] নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না; তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী,[৭]

শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আত্মার পরিশুদ্ধি চরিত্রের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। আর এছাড়াও এর অর্থ কেবলমাত্র নিজেরই জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং নিজের চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে। কাজেই অন্য কথায় এ আয়াতের অনুবাদ হবে তারা পরিশুদ্ধির কার্য সম্পাদনকারী লোক।" অর্থাৎ তারা নিজেদেরকেও পরিশুদ্ধ করে এবং অন্যদেরকেও পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের মধ্যেও মৌল মানবিক উপাদানের বিকাশ সাধন করে এবং বাইরের জীবনেও তার উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আ'লায় বলা হয়েছে ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

"সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়েছে।"

সূরা শামসে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"সফলকাম হলো সে ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি করেছে এবং ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি যে তাকে দলিত করেছে।"

কিন্তু এ দু'টির তুলনায় সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী। কারণ এ দু'টি আয়াত শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দেয় এবং আলোচ্য আয়তটি স্বয়ং শুদ্ধিকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করে আর এ কর্মটির মধ্যে নিজের সত্তা ও সমাজ জীবন উভয়েরই পরিশুদ্ধি শামিল রয়েছে।

৬. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, নিজের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখে। অর্থাৎ উলংগ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং অন্যের সামনে লজ্জাস্থান খোলে না। দুই, তারা নিজেদের সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান করে না এবং

কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না। (আরো ব্যাখার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, ৩০–৩২ টীকা।)

৭. এটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। "লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" বাক্যাংশটি থেকে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য এ বাক্যটি বলা হয়েছে। দুনিয়াতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজো বহু লোক এ বিভ্রান্তিতে ভুগছে যে, কামশক্তি মূলত একটি খারাপ জিনিস এবং বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহর প্রতি অনুগত লোকদের জন্য সংগত নয়। যদি কেবল মাত্র "সফলতা লাভকারী মু'মিনরা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" এতটুকু কথা বলেই বাক্য খতম করে দেয়া হতো তাহলে এ বিভ্রান্তিটি জোরদার হয়ে যেতো। কারণ এর এ অর্থ করা যেতে পারতো যে, তারা মালকোঁচা মেরে থাকে, তারা সন্যাসী ও যোগী এবং বিয়ে–শাদীর ঝামেলায় তারা যায় না। তাই একটি প্রাসংগিক বাক্য বাড়িয়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বৈধ স্থানে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। তবে কাম প্রবৃত্তির সেবা করার জন্য এ বৈধ পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই গোনাহর কাজ।

এ প্রাসংগিক বাক্যটি থেকে কয়েকটি বিধান বের হয়। এগুলো সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

এক ঃ লজ্জাস্থান হেফাজত করার সাধারণ হুকুম থেকে দু'ধরনের স্ত্রীলোককে বাদ দেয়া হয়েছে। এক, স্ত্রী। দুই, مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ । স্ত্রী (ازواج) শব্দটি আরবী ভাষার পরিচিত ব্যবহার এবং স্বয়ং কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী কেবলমাত্র এমনসব নারী সম্পর্কে বলা হয় যাদেরকে যথারীতি বিবাহ করা হয়েছে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত "স্ত্রী" শব্দটি এরি সমার্থবোধক। আর مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ বলতে যে বাঁদী বুঝায় আরবী প্রবাদ ও কুরআনের ব্যবহার উভয়ই তার সাক্ষী। অর্থাৎ এমন বাঁদী যার ওপর মানুষের মালিকানা অধিকার আছে। এভাবে এ আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় মালিকানাধীন বাঁদীর সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ এবং বৈধতার ভিত্তি বিয়ে নয় বরং মালিকানা। যদি এ জন্যও বিয়ে শর্ত হতো তাহলে একে স্ত্রী থেকে আলাদা করেও বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বিবাহিত হলে সে ও স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত হতো। বর্তমানকালের কোন কোন মুফাস্সির যারা বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগ স্বীকার করেননি তারা সূরা নিসার (২৫ আয়াত) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ আয়াতটি থেকে যুক্তি আহরণ করে একথা প্রমাণ করতে চান যে, বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগও কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। কারণ সেখানে হুকুম দেয়া হয়েছে, যদি আর্থিক দুরবস্থার কারণে তোমরা কোন স্বাধীন পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষমতা না রাখো তাহলে কোন বাঁদীকে বিয়ে করো। কিন্তু এসব লোকের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট লক্ষ করার মতো। এরা একই আয়াতের একটি অংশকে নিজেদের উদ্দেশ্যের পক্ষে লাভজনক দেখতে পেয়ে গ্রহণ করে নেন, আবার সে একই আয়াতের যে অংশটি এদের উদ্দেশ্য বিরোধী হয় তাকে জেনে বুঝে বাদ দিয়ে দেন। এ আয়াতে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ যেসব শব্দের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"কাজেই এ বাঁদীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও এদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে এবং এদেরকে এদের পরিচিত পদ্ধতিতে মোহরানা প্রদান করো।" এ শব্দগুলো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এখানে বাঁদীর মালিকের বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বরং এমন ব্যক্তির বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, যে স্বাধীন মেয়ে বিয়ে করার ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে না এবং এ জন্য অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বাঁদীকে বিয়ে করতে চায়। নয়তো যদি নিজেরই বাঁদীকে বিয়ে করার ব্যাপার হয় তাহলে তার এ "অভিভাবক" কে হতে পারে যার কাছ থেকে তার অনুমতি নেবার প্রয়োজন হয়? কিন্তু কুরআনের সাথে কৌতুককারীরা কেবলমাত্র فَانْكِحُوْهُنَّ -কে গ্রহণ করেন অথচ তার পরেই যে بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ এসেছে তাকে উপেক্ষা করেন। তাছাড়াও তারা একটি আয়াতের এমন অর্থ বের করেন যা এ একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। কোন ব্যক্তি যদি নিজের চিন্তাধারার নয় বরং কুরআন মজীদের অনুসরণ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যি সূরা নিসার ৩-৩৫, সূরা আহযাবের ৫০-৫২ এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ আয়াতকে সূরা মুমিনূনের এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। এভাবে সে নিজেই এ ব্যাপারে কুরআনের বিধান কি তা জানতে পারবে। (এ বিষয়ে আরো বেশী বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৪৪ টীকা; তাফহীমাত (মওদূদী রচনাবলী) ২য় খণ্ড ২৯০ থেকে ৩২৪ পৃঃ এবং রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড, ৩২৪ থেকে ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

দুই ঃ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ বাক্যাংশে عَلٰى শব্দটি একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় যে, এ আনুসংগিক বাক্যে আইনের যে ধারা বর্ণনা করা হচ্ছে তার সম্পর্ক শুধু পুরুষদের সংগে। বাকি قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে নিয়ে خٰلِدُوْنَ পর্যন্ত পুরো আয়াতটিতেই সর্বনাম পুং লিঙ্গে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল রয়েছে। কারণ আরবী ভাষায় পুরুষ ও নারীর সমষ্টির কথা যখন বলা হয় তখন সর্বনামের উল্লেখ পুং লিংগেই করা হয়। কিন্তু এখানে لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ এর হুকুমের বাইরে রেখে عَلٰى শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ব্যতিক্রমটি পুরুষদের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়। যদি "এদের কাছে" না বলে "এদের থেকে" হেফাজত না করলে তাদেরকে নিন্দনীয় নয় বলা হতো, তাহলে অবশ্যই এ হুকুমটিও নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কার্যকর হতে পারতো। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি না বুঝার কারণে হযরত উমরের (রা) যুগে জনৈকা মহিলা তাঁর গোলামের সাথে যৌন সম্ভোগ করে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে শূরায় যখন তাঁর বিষয়টি পেশ হলো তখন সবাই এক বাক্যে বললেন ঃ تاولت كتاب الله تعالى غير تاويله অর্থাৎ "সে আল্লাহর কিতাবের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে।" এখানে কারোর মনে যেন এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, এ ব্যতিক্রম যদি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বামীরা কেমন করে হালাল হলো? এ সন্দেহটি সঠিক না হবার কারণ হচ্ছে এই যে,

যখন স্ত্রীদের ব্যাপারে স্বামীদেরকে পুরুষাংগ হেফাজত করার হুকুমের বাইরে রাখা হয়েছে তখন নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে স্ত্রীরা আপনা আপনিই এ হুকুমের বাইরে চলে গেছে। এরপর তাদের জন্য আর আলাদা সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন থাকেনি। এভাবে এ ব্যতিক্রমের হুকুমের প্রভাব কার্যত শুধুমাত্র পুরুষ ও তার মালিকানাধীন নারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং নারীর জন্য তার গোলামের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হারাম গণ্য হয়। নারীর জন্য এ জিনিসটি হারাম গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, গোলাম তার প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে কিন্তু তার ও তার গৃহের পরিচালক হতে পারে না এবং এর ফলে পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও শৃংখল ঢিলা থেকে যায়।

তিন ঃ "তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী"–এ বাক্যটি ওপরে উল্লেখিত দু'টি বৈধ আকার ছাড়া যিনা বা সমকাম অথবা পশু–সংগম কিংবা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য যাই কিছু হোক না কেন সবই হারাম করে দিয়েছে। একমাত্র হস্তমৈথুনের (Masturbation) ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একে জায়েয গণ্য করেন। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ একে চূড়ান্ত হারাম বলেন। অন্যদিকে হানাফীদের মতে যদিও এটি হারাম তবুও তারা বলেন, যদি চরম মুহূর্তে কখনো কখনো এ রকম কাজ করে বসে তাহলে আশা করা যায় তা মাফ করে দেয়া হবে।

চার ঃ কোন কোন মুফাস্সির মুতা' বিবাহ হারাম হবার বিষয়টিও এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, যে মেয়েকে মুতা' বিয়ে করা হয় সে না স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত, না বাঁদীর। বাঁদী তো সে নয় একথা সুস্পষ্ট, আবার স্ত্রীও নয়। কারণ স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করার জন্য যতগুলো আইনগত বিধান আছে তার কোনটাই তার ওপর আরোপিত হয় না। সে পুরুষের উত্তরাধিকারী হয় না, পুরুষও তার উত্তরাধিকারী হয় না। তার জন্য ইদ্দত নেই, তালাকও নেই, খোরপোশ নেই এবং ঈলা, যিহার ও লি'আন ইত্যাদি কোনটিই নেই। বরং সে চার স্ত্রীর নির্ধারিত সীমানার বাইরে অবস্থান করছে। কাজেই সে যখন "স্ত্রী" ও "বাঁদী" কোনটার সংজ্ঞায় পড়ে না তখন নিশ্চয়ই সে 'এর বাইরে আরো কিছু'র মধ্যে গণ্য হবে। আর এ আরো কিছু যারা চায় তাদেরকে কুরআন সীমালংঘনকারী গণ্য করেছে। এ যুক্তিটি অনেক শক্তিশালী। তবে এর মধ্যে একটি দুর্বলতার দিকও আছে। আর এ দুর্বলতার কারণে এ আয়াতটির বলেই যে, মুতা' হারাম হয়েছে সে কথা বলা কঠিন। এ দুর্বলতাটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতা' হারাম হবার শেষ ও চূড়ান্ত ঘোষণা দেন মক্কা বিজয়ের বছরে। এর পূর্বে অনুমতির প্রমাণ সহী হাদীসগুলোতে পাওয়া যায়। যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, মুতা' হারাম হবার হুকুম কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই এসে গিয়েছিল আর এ আয়াতটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত এবং এটি হিজরতের কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল, তাহলে কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় পর্যন্ত একে জায়েয রেখেছিলেন? কাজেই একথা বলাই বেশী নির্ভুল যে, মুতা' বিয়ে কুরআন মজীদের কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমেই হারাম হয়েছে। সুন্নাতের মধ্যে যদি এ বিষয়টির সুস্পষ্ট

ফায়সালা না থাকতো তাহলে নিছক এ আয়াতের ভিত্তিতে এর হারাম হওয়ার ফায়সালা দেয়া কঠিন ছিল। মুতা'র আলোচনা যখন এসে গেছে তখন আরো দু'টি কথা স্পষ্ট করে দেয়া সংগত বলে মনে হয়। এক, এর হারাম হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই প্রমাণিত। কাজেই হযরত উমর (রা) একে হারাম করেছেন, একথা বলা ঠিক নয়। হযরত উমর (রা) এ বিধিটির প্রবর্তক বা রচয়িতা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন কেবলমাত্র এর প্রচারক ও প্রয়োগকারী। যেহেতু এ হুকুমটি রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আমলের শেষের দিকে দিয়েছিলেন এবং সাধারণ লোকদের কাছে এটি পৌঁছেনি তাই হযরত উমর (রা) এটিকে সাধারণ্যে প্রচার ও আইনের সাহায্যে কার্যকরী করেছিলেন। দুই, শীয়াগণ মুতা'কে সর্বতোভাবে ও শর্তহীনভাবে মুবাহ সাব্যস্ত করার যে নীতি অবলম্বন করেছেন কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও তার কোন অবকাশই নেই। প্রথম যুগের সাহাবা, তাবেঈ ও ফকীহদের মধ্যে কয়েকজন যাঁরা এর বৈধতার সমর্থক ছিলেন তাঁরা শুধুমাত্র অনন্যোপায় অবস্থায় অনিবার্য পরিস্থিতিতে এবং চরম প্রয়োজনের সময় একে বৈধ গণ্য করেছিলেন। তাদের একজনও একে বিবাহের মতো শর্তহীন মুবাহ এবং সাধারণ অবস্থায় অবলম্বনযোগ্য বলেননি। বৈধতার প্রবক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হিসেবে পেশ করা হয় হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) নাম। তিনি নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ ماهى الاكالميتة لاتحل الا للمضطر (এ হচ্ছে মৃতের মতো, যে ব্যক্তি অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থার শিকার হয়েছে তার ছাড়া আর কারোর জন্য বৈধ নয়।) আবার তিনি যখন দেখলেন তাঁর এ বৈধতার অবকাশ–দানমূলক ফতোয়া থেকে লোকেরা অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে যথেচ্ছভাবে মুতা' করতে শুরু করেছে এবং তাকে প্রয়োজনের সময় পর্যন্ত মুলতবী করছে না তখন তিনি নিজের ফতওয়া প্রত্যাহার করে নিলেন। ইবনে আব্বাস ও তাঁর সমমনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁদের এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নটি যদি বাদ দেয়াও যায় তাহলে তাদের মত গ্রহণকারীরা বড় জোর "ইযৃতিরার" তথা অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থায় একে বৈধ বলতে পারেন। অবাধ ও শর্তহীন মুবাহ এবং প্রয়োজন ছাড়াই মুতা' বিবাহ করা এমন কি বিবাহিত স্ত্রীদের উপস্থিতিতেও মুতা–বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্ভোগ করা এমন একটি স্বেচ্ছাচার যাকে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ রুচিবোধও কোনদিন বরদাশত করে না। ইসলামী শরীয়াত ও রসূল বংশোদ্ভূত ইমামদেরকে এর সাথে জড়িত মনে করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি মনে করি, শীয়াদের মধ্য থেকে কোন ভদ্র ও রুচিবান ব্যক্তিও তার মেয়ের জন্য কেউ বিবাহের পরিবর্তে মুতা'র প্রস্তাব দেবে এটা বরদাশত করতে পারেন না। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, মুতা'র বৈধতার জন্য সমাজে বারবনিতাদের মতো মেয়েদের এমন একটি নিকৃষ্ট শ্রেণী থাকতে হবে যাদের সাথে মুতা' করার অবাধ সুযোগ থাকে। অথবা মুতা' হবে শুধুমাত্র গরীবদের কন্যা ও ভগিনীদের জন্য এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করার অধিকারী হবে সমাজের ধনিক ও সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীর পুরুষেরা। আল্লাহ ও রসূলের শরীয়াত থেকে কি এ ধরনের বৈষম্যপূর্ণ ও ইনসাফবিহীন আইনের আশা করা যেতে পারে? আবার আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে কি এটাও আশা করা যেতে পারে যে, তিনি এমন কোন কাজকে মুবাহ করে দেবেন যাকে যে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে নিজের জন্য অমর্যাদাকর এবং বেহায়াপনা মনে করে?

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۭ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١﴾

নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে[৮]

এবং নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে,[৯]

তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস[১০] লাভ করবে এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।[১১]

৮. "আমানত" শব্দটি বিশ্ব–জাহানের প্রভু অথবা সমাজ কিংবা ব্যক্তি যে আমানত কাউকে সোপর্দ করেছেন তা সবগুলোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এমন যাবতীয় চুক্তি প্রতিশ্রুতি ও অংগীকারের অন্তরভুক্ত হয় যা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে অথবা মানুষ ও মানুষের মধ্যে কিংবা জাতি ও জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। মু'মিনের বৈশিষ্ট হচ্ছে, সে কখনো আমানতের খেয়ানত করে না এবং কখনো নিজের চুক্তি ও অংগীকার ভংগ করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর ভাষণে বলতেন ঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"যার মধ্যে আমানতদারীর গুণ নেই তার মধ্যে ঈমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ নেই তার মধ্যে দীনদারী নেই।" (বাইহাকী, ঈমানের শাখা–প্রশাখাসমূহ)

বুখারী ও মুসলিম একযোগে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "চারটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে নিখাদ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন একটি পাওয়া যায় সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে তা মুনাফিকীর একটি অভ্যাস হিসেবেই থাকে। সে চারটি অভ্যাস হচ্ছে, কোন আমানত তাকে সোপর্দ করা হলে সে তার খেয়ানত করে, কখনো কথা বললে মিথ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভংগ করে এবং যখনই কারোর সাথে ঝগড়া করে তখনই (নৈতিকতা ও সততার) সমস্ত সীমা লংঘন করে।"

৯. ওপরের খুশূ'র আলোচনায় নামায শব্দ এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহুবচনে "নামাযগুলো" বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে লক্ষ ছিল মূল নামায আর এখানে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের নামায সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। "নামাযগুলোর সংরক্ষণ"–এর অর্থ হচ্ছে ঃ সে নামাযের সময়, নামাযের নিয়ম–কানুন, আরকান ও আহকাম মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের

প্রতি পুরোপুরি নজর রাখে। শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ পাক রাখে। অযু ঠিক মতো করে। কখনো যেন বিনা অযুতে নামায না পড়া হয় এদিকে খেয়াল রাখে। সঠিক সময়ে নামায পড়ার চিন্তা করে। সময় পার করে দিয়ে নামায পড়ে না। নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ণ একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি সহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না। যা কিছু নামাযের মধ্যে পড়ে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বান্দা তার প্রভু আল্লাহর কাছে কিছু নিবেদন করছে, এমনভাবে পড়ে না যাতে মনে হয় একটি গৎবাঁধা বাক্য আউড়ে শুধুমাত্র বাতাসে কিছু বক্তব্য ফুঁকে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

১০. ফিরদৌস জান্নাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ। মানব জাতির প্রায় সমস্ত ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায়। সংস্কৃতে বলা হয় পরদেষা, প্রাচীন কুলদানী ভাষায় পরদেসা, প্রাচীন ইরানী (যিন্দা) ভাষায় পিরীদাইজা, হিব্রু ভাষায় পারদেস, আর্মেনীয় ভাষায় পারদেজ, সুরিয়ানী ভাষায় ফারদেসো, গ্রীক ভাষায় পারাডাইসোস, ল্যাটিন ভাষায় প্যারাডাইস এবং আরবী ভাষায় ফিরদৌস। এ শব্দটি এসব ভাষায় এমন একটি বাগানের জন্য বলা হয়ে থাকে যার চারদিকে পাঁচিল দেয়া থাকে, বাগানটি বিস্তৃত হয়, মানুষের আবাসগৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেখানে সব ধরনের ফল বিশেষ করে আংগুর পাওয়া যায়। বরং কোন কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে একথাও বুঝা যায় যে, এখানে বাছাই করা গৃহপালিত পশু–পাখিও পাওয়া যায়। কুরআনের পূর্বে আরবদের জাহেলী যুগের ভাষায়ও ফিরদৌস শব্দের ব্যবহার ছিল। কুরআনে বিভিন্ন বাগানের সমষ্টিকে ফিরদৌস বলা হয়েছে। যেমন সূরা কাহফে বলা হয়েছে : كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا "তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলো আছে।" এ থেকে মনের মধ্যে যে ধারণা জন্মে তা হচ্ছে এই যে, ফিরদৌস একটি বড় জায়গা, যেখানে অসংখ্য বাগ–বাগিচা–উদ্যান রয়েছে।

মু'মিনদের ফিরেদৌসের অধিকারী হবার বিষয়টির ওপর সূরা ত্বা–হা (৮৩ টীকা) ও সূরা আল আম্বিয়ায় (৯৯ টীকা) যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

১১. এ আয়াতগুলোতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে :

এক : যারাই কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নিয়ে এ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করবে এবং এ নীতির অনুসারী হবে তারা যে কোন দেশ, জাতি ও গোত্রেরই হোক না কেন অবশ্যই তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হবে।

দুই : সফলতা নিছক ঈমানের ঘোষণা, অথবা নিছক সচ্চরিত্র ও সৎকাজের ফল নয়। বরং উভয়ের সম্মিলনের ফল। মানুষ যখন আল্লাহর পাঠানো পথনির্দেশ মেনে চলে এবং তারপর সে অনুযায়ী নিজের মধ্যে উন্নত নৈতিকতা ও সৎকর্মশীলতা সৃষ্টি করে তখন সে সফলতা লাভ করে।

তিন : নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সম্পদশালিতা এবং সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়। বরং তা একটি ব্যাপকতর কল্যাণকর অবস্থার নাম। দুনিয়ায় ও আখেরাতে

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً
فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ
إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ
فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾

আমি মানুষকে তৈরি করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে টপ্‌কে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি, এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অস্থি–পঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর অস্থি–পঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে,[১২] তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি রূপে।[১৩] কাজেই আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন,[১৪] সকল কারিগরের চাইতে উত্তম কারিগর তিনি। এরপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে, তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

আর তোমাদের ওপর আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি,[১৫] সৃষ্টিকর্ম আমার মোটেই অজানা ছিল না।[১৬] আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসেব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি।[১৭] আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে পারি।[১৮]

স্থায়ী সাফল্য ও পরিতৃপ্তিকেই এ নামে অভিহিত করা হয়। এটি ঈমান ও সৎকর্ম ছাড়া অর্জিত হয় না। পথভ্রষ্টদের সাময়িক সমৃদ্ধি ও সাফল্য এবং সৎ মুমিনদের সাময়িক বিপদ আপদকে এ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক গণ্য করা যেতে পারে না।

চার ঃ মু'মিনদের এ গুণাবলীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার এ বিষয়বস্তুটিই সামনের দিকের ভাষণের সাথে এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক কায়েম করে। তৃতীয় রুকূ'র শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ

ভাষণটির যুক্তির ধারা যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, শুরুতে আছে অভিজ্ঞতা প্রসূত যুক্তি। অর্থাৎ এ নবীর শিক্ষা তোমাদেরই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ বিশেষ ধরনের জীবন, চরিত্র, কর্মকাণ্ড, নৈতিকতা ও গুণাবলী সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, এ শিক্ষা সত্য না হলে এ ধরনের কল্যাণময় ফল কিভাবে সৃষ্টি করতে পারতো? এরপর হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ যুক্তি। অর্থাৎ মানুষের নিজের সত্তায় ও চারপাশের বিশ্বে যে নিদর্শনাবলী পরিদৃষ্ট হচ্ছে তা সবই তাওহীদ ও আখেরাতের এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে। তারপর আসে ঐতিহাসিক যুক্তির কথা। এ যুক্তিগুলোতে বলা হয়েছে, নবী ও তাঁর দাওয়াত অস্বীকারকারীদের সংঘাত আজ নতুন নয় বরং একই কারণে অতি প্রাচীনকাল থেকে তা চলে আসছে। এ সংঘাতের প্রতিটি যুগে একই ফলাফলের প্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় দলের মধ্যে কে সত্য পথে ছিল এবং কে ছিল মিথ্যার পথে।

১২. ব্যাখ্যার জন্য সূরা হজ্জের ৫, ৬ ও ৯ টীকা দেখুন।

১৩. অর্থাৎ কোন মুক্তমনের অধিকারী ব্যক্তি শিশুকে মাতৃগর্ভে লালিত পালিত হতে দেখে একথা ধারণাও করতে পারে না যে, এখানে এমন একটি মানুষ তৈরী হচ্ছে, যে বাইরে এসে জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিল্পকর্মের এসব নৈপুণ্য দেখাবে এবং তার থেকে এ ধরনের বিস্ময়কর শক্তি ও যোগ্যতার প্রকাশ ঘটবে। সেখানে সে হয় হাড় ও রক্ত মাংসের একটি দলা পাকানো পিণ্ডের মতো। তার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবার আগে পর্যন্ত জীবনের প্রারম্ভিক বৈশিষ্টসমূহ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তার মধ্যে থাকে না শ্রবণ শক্তি, থাকে না দৃষ্টি শক্তি, বাকশক্তি, বুদ্ধি–বিবেচনা ও অন্য কোন গুণ। কিন্তু বাইরে এসেই সে অন্য কিছু হয়ে যায়। পেটে অবস্থানকারী ভ্রূণের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই থাকে না। অথচ এখন সে শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও বাকশক্তির অধিকারী একটি সত্তা। এখন সে অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে। এখন তার মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটার সূচনা হয় যে জাগ্রত হবার পরপরই প্রথম মুহূর্ত থেকেই নিজের আওতাধীন প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ও শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। তারপর সে যতই এগিয়ে যেতে থাকে তার সত্তা থেকে এ "অন্য জিনিস" হবার অবস্থা আরো সুস্পষ্ট ও আরো বিকশিত হতে থাকে। যৌবনে পদার্পণ করে শৈশব থেকে ভিন্ন কিছু হয়ে যায়। পৌঢ়ত্বে পৌছে যৌবনের তুলনায় অন্য কিছু প্রমাণিত হয়। বার্ধক্যে উপনীত হবার পর নতুন প্রজন্মের জন্য একথা অনুমান করাই কঠিন হয়ে পড়ে যে, তার শিশুকাল কেমন ছিল এবং যৌবনকালে কি অবস্থা ছিল। এত বড় পরিবর্তন অন্তত এ দুনিয়ার অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে ঘটে না। কোন ব্যক্তি যদি একদিকে কোন বর্ষীয়ান পুরুষের শক্তি, যোগ্যতা ও কাজ দেখে এবং অন্য দিকে একথা কল্পনা করতে থাকে যে, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে একদা যে একটি ফোঁটা মায়ের গর্ভকোষে টপ্‌কে পড়েছিল তার মধ্যে এত সবকিছু নিহিত ছিল, তাহলে স্বতস্ফূর্তভাবে সে একই কথা বের হয়ে আসবে যা সামনের দিকের বাক্যের মধ্যে আসছে।

১৪. মূলে تَبٰرَكَ اللّٰهُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে এর সমগ্র গভীর অর্থ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আভিধানিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর মধ্যে দু'টি অর্থ

পাওয়া যায়। এক, তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। দুই, তিনি এমনই কল্যাণ ও সদগুণের অধিকারী যে, তাঁর সম্পর্কে তোমরা যতটুকু অনুমান করবে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁকে পাবে। এমনকি তাঁর কল্যাণের ধারা কোথাও গিয়ে শেষ হয় না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ১ ও ১৯ টীকা) এ দু'টি অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলে একথা বুঝা যাবে যে, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করার পর فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ বাক্যাংশটি নিছক একটি প্রশংসামূলক বাক্যাংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি বরং এটি হচ্ছে যুক্তির পরে যুক্তির উপসংহারও। এর মধ্যে যেন একথাই বলা হচ্ছে যে, যে আল্লাহ একটি মাটির টিলাকে ক্রমোন্নত করে একটি পূর্ণ মানবিক মর্যাদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন তিনি প্রভুত্বের ব্যাপারে তাঁর সাথে কেউ শরীক হবে এ থেকে অনেক বশী পাক–পবিত্র ও উর্ধে। তিনি এ একই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন, কি পারেন না এরূপ সন্দেহ–সংশয় থেকে অনেক বেশী পাক–পবিত্র। আর তিনি একবারই মানুষ সৃষ্টি করে দেবার পর তাঁর সব নৈপূণ্য খতম হয়ে যায় এবং এরপর তিনি আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ ক্ষমতা সম্পর্কে এটা বড়ই নিকৃষ্ট ধারণা।

১৫. মূলে طَرَائِق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে পথও হয় আবার স্তরও হয়। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে সম্ভবত এর অর্থ হবে সাতটি গ্রহের আবর্তন পথ। আর যেহেতু সে যুগে মানুষ সাতটি গ্রহ সম্পর্কেই জানতো তাই সাতটি পথের কথা বলা হয়েছে। এর মানে অবশ্যই এ নয় যে, এগুলো ছাড়া আর কোন পথ নেই। আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে سَبْعَ طَرَائِقَ এর অর্থ তাই হবে যা سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا (সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে) এর অর্থ হয়। আর এই সংগে যে বলা হয়েছে "তোমাদের ওপর" আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি, এর একটি সহজ সরল অর্থ হবে তাই যা এর বাহ্যিক শব্দগুলো থেকে বুঝা যায়। আর দ্বিতীয় অর্থটি হবে, তোমাদের চাইতে বড় জিনিস আমি নির্মাণ করেছি এ আকাশ। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

"আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চাইতে অনেক বড় কাজ।"

(আল মু'মিন, ৫৭ আয়াত)

১৬. অন্য একটি অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে, "আর সৃষ্টিকূলের পক্ষ থেকে আমি গাফিল ছিলাম না অথবা নই।" মূল বাক্যে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হয় ঃ এসব কিছু যা আমি বানিয়েছি এগুলো এমনি হঠাৎ কোন আনাড়ির হাত দিয়ে আন্দাজে তৈরী হয়ে যায়নি। বরং একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণ জ্ঞান সহকারে প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আইন সক্রিয় রয়েছে। সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ছোট থেকে নিয়ে বড় পর্যন্ত সবকিছুর মধ্যে একটি পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। এ বিশাল কর্ম জগতে ও বিশ্ব–জগতের এ সুবিশাল কারখানায় সব দিকেই একটি উদ্দেশ্যমুখিনতা দেখা যাচ্ছে। এসব স্রষ্টার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ পেশ করছে। দ্বিতীয় অনুবাদটি গ্রহণ করলে এর অর্থ হবে ঃ এ বিশ্ব–জাহানে আমি যা কিছুই সৃষ্টি করেছি

তাদের কারোর কোন প্রয়োজন থেকে আমি কখনো গাফিল এবং কোন অবস্থা থেকে কখনো বেখবর থাকিনি। কোন জিনিসকে আমি নিজের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তৈরী হতে ও চলতে দেইনি। কোন জিনিসের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সরবরাহ করতে আমি কখনো কুন্ঠিত হইনি। প্রত্যেকটি বিন্দু, বালুকণা ও পত্র–পল্লবের অবস্থা আমি অবগত থেকেছি।

১৭. যদিও এর অর্থ হতে পারে মওসুমী বৃষ্টিপাত কিন্তু আয়াতের শব্দ বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে অন্য একটি অর্থও এখান থেকে বুঝা যায়। সেটি হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ একই সংগে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি পৃথিবীতে নাযিল করেছিলেন যা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত এ গ্রহটির প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ পানি পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে রক্ষিত হয়েছে। এর সাহায্যে সাগর ও মহাসাগরের জন্ম হয়েছে এবং ভূগর্ভেও পানি (Sub-soil water) সৃষ্টি হয়েছে। এখন এ পানিই ঘুরে ফিরে উষ্ণতা, শৈত্য ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, সাগর, নদী–নালা ঝরণা ও কুয়া এ পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। অসংখ্য জিনিসের সৃষ্টি ও উৎপাদনে এরি বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যায়। তারপর এ পানি বায়ুর সাথে মিশে গিয়ে আবার তার মূল ভাণ্ডারের দিকে ফিরে যায়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পানির এ ভাণ্ডার এক বিন্দুও কমেনি এবং এক বিন্দু বাড়াবারও দরকার হয়নি। এর চাইতেও বেশী আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রই একথা জানে যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দু'টি গ্যাসের সংমিশ্রণে পানির উৎপত্তি হয়েছে। একবার এত বিপুল পরিমাণ পানি তৈরী হয়ে গেছে যে, এর সাহায্যে সমুদ্র ভরে গেছে এবং এখন এর ভাণ্ডারে এক বিন্দুও বাড়ছে না। কে তিনি যিনি এক সময় এ বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে এ অথৈ পানির ভাণ্ডার সৃষ্টি করে দিয়েছেন? আবার কে তিনি যিনি এখন আর এ দু'টি গ্যাসকে সে বিশেষ অনুপাতে মিশতে দেন না যার ফলে পানি উৎপন্ন হয়, অথচ এ দু'টি গ্যাস এখনো দুনিয়ার বুকে মওজুদ রয়েছে? আর পানি যখন বাষ্প হয়ে বাতাসে উড়ে যায় তখন কে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে বাধা দেয়? নাস্তিক্যবাদীদের কাছে কি এর কোন জবাব আছে? আর যারা পানি ও বাতাস এবং উষ্ণতা ও শৈত্যের পৃথক পৃথক সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের কাছে কি এর কোন জবাব আছে?

১৮. অর্থাৎ তাকে অদৃশ্য করার কোন একটাই পদ্ধতি নেই। অসংখ্য পদ্ধতিতে তাকে অদৃশ্য করা সম্ভব। এর মধ্য থেকে যে কোনটিকে আমরা যখনই চাই ব্যবহার করে তোমাদেরকে জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটি থেকে বঞ্চিত করতে পারি। এভাবে এ আয়াতটি সূরা মুল্‌কের আয়াতটি থেকে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে যেখানে বলা হয়েছে :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

"তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যমীন যদি তোমাদের এ পানিকে নিজের ভেতরে শুষে নেয়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান ঝরণাধারা এনে দেবে।"

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاۤءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

তারপর এ পানির মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যই এ বাগানগুলোয় রয়েছে প্রচুর সুস্বাদু ফল[১৯] এবং সেগুলো থেকে তোমরা জীবিকা লাভ করে থাকো।[২০] আর সিনাই পাহাড়ে যে গাছ জন্মায় তাও আমি সৃষ্টি করেছি[২১] তা তেল উৎপন্ন করে এবং আহারকারীদের জন্য তরকারীও।

আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য গবাদি পশুদের মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের মধ্যে যাকিছু আছে তা থেকে একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই[২২] এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে আরো অনেক উপকারিতাও আছে, তাদেরকে তোমরা খেয়ে থাকো এবং তাদের ওপর ও নৌযানে আরোহণও করে থাকো।[২৩]

১৯. অর্থাৎ খেজুর ও আংগুর ছাড়াও আরো নানান ধরনের ফল–ফলাদি।

২০. অর্থাৎ এসব বাগানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি, ফল, শস্য, কাঠ এবং অন্যান্য যেসব দ্রব্য তোমরা বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করো, এসব থেকে তোমরা নিজেদের জন্য জীবিকা আহরণ করো। مِنْهَا تَأْكُلُوْنَ (যেগুলো থেকে তোমরা খাও) এর মধ্যে যে "যেগুলো" শব্দটি রয়েছে এটির মাধ্যমে বাগানগুলো বুঝানো হয়েছে, ফল–ফলাদি নয়। আর تَأْكُلُوْنَ মানে শুধু এই নয় যে, এ বাগানগুলোর ফল তোমরা খাও বরং এ শব্দটি সামগ্রিকভাবে জীবিকা অর্জন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি নিজের অমুক কাজের ভাত খাচ্ছে, ঠিক তেমনি আরবী ভাষায়ও বলা হয় فلان ياكل من حرفته (অমুক ব্যক্তি তার শিল্পকর্ম থেকে খাচ্ছে অর্থাৎ তার শিল্পকর্ম থেকে জীবিকা অর্জন করছে)।

২১. এখানে জয়তুনের কথা বলা হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের আশপাশের এলাকার উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ গাছগুলো দেড় হাজার দু'হাজার বছর বাঁচে। এমনকি ফিলিস্তিনের কোন কোন গাছের দৈর্ঘ, স্থূলতা ও বিস্তার দেখে অনুমান করা হয়

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২ রুকূ'

আমি নূহকে পাঠালাম তার সম্প্রদায়ের কাছে।[২৪] সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা কি ভয় করো না?[২৫] তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলো তারা বলতে লাগলো, "এ ব্যক্তি আর কিছুই নয় কিন্তু তোমাদেরই মতো একজন মানুষ।[২৬] এর লক্ষ হচ্ছে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা।[২৭] আল্লাহ পাঠাতে চাইলে ফেরেশতা পাঠাতেন।[২৭(ক)] একথা তো আমরা আমাদের বাপদাদাদের আমলে কখনো শুনিনি (যে, মানুষ রসূল হয়ে আসে)। কিছুই নয়, শুধুমাত্র এ লোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়ে বসেছে; কিছু দিন আরো দেখে নাও (হয়তো পাগলামি ছেড়ে যাবে)।"

যে, সেগুলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগ থেকে এখনো চলে আসছে। সিনাই পাহাড়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, সিনাই পাহাড় এলাকার সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য স্থানই এর আসল স্বদেশ ভূমি।

২২. অর্থাৎ দুধ। এ সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, রক্ত ও গোবরের মাঝখানে এটি আর একটি তৃতীয় জিনিস। পশুর খাদ্য থেকে এটি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

২৩. গবাদি পশু ও নৌযানকে একত্রে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরববাসীরা আরোহণ ও বোঝা বহন উভয় কাজের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উট ব্যবহার করতো এবং উটের জন্য "স্থল পথের জাহাজ" উপমাটি অনেক পুরানো। জাহেলী যুগের কবি যুররুম্মাহ বলেন ঃ

سفينة بر تحت خدى زمامها

"স্থলপথের জাহাজ চলে আমার গণ্ডদেশের নিচে তার লাগামটি।"

২৪. তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন আল আ'রাফের ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুসের ৭১ থেকে ৭৩; হূদের ২৫ থেকে ৪৮; বনী ইসরাঈলের ৩ এবং আল আম্বিয়ার ৭৬–৭৭ আয়াত।

২৫. অর্থাৎ নিজেদের আসল ও যথার্থ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করতে তোমাদের ভয় লাগে না? যিনি তোমাদের ও সারা জাহানের মালিক, প্রভু ও শাসক তাঁর রাজ্যে বাস করে তাঁর পরিবর্তে অন্যদের বন্দেগী ও আনুগত্য করার এবং অন্যদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করে নেবার ফলাফল কি হবে সে ব্যাপারে কি তোমাদের একটুও ভয় নেই?

২৬. মানুষ নবী হতে পারে না এবং নবী মানুষ হতে পারে না, এ চিন্তাটি সর্বকালের পথভ্রষ্ট লোকদের একটি সম্মিলিত ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন বারবার এ জাহেলী ধারণাটির উল্লেখ করে এর প্রতিবাদ করেছে এবং পুরোপুরি জোর দিয়ে একথা বর্ণনা করেছে যে, সকল নবীই মানুষ ছিলেন এবং মানুষদের জন্য মানুষেরই নবী হওয়া উচিত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল আ'রাফ, ৬৩–৬৯; ইউনুস, ২; হূদ, ২৭–৩১; ইউসুফ, ১০৯; আর রা'দ, ৩৮; ইবরাহীম, ১০–১১; আন নামূল, ৪৩; বনী ইসরাঈল, ৯৪–৯৫; আল কাহাফ, ১১০; আল আম্বিয়া, ৩–৩৪; অল মু'মিনূন, ৩৩–৩৪ ও ৪৭; আল ফুরকান, ৭–২০; আশ্‌শু'আরা, ১৫৪–১৮৪; ইয়াসীন, ১৫ ও হা–মীম আস্‌ সাজ্‌দাহ, ৬ আয়াত এবং এই সংগে টীকাগুলোও।)

২৭. এটাও সত্য বিরোধীদের একটি পুরাতন অস্ত্র। যে কেউ সংস্কারমূলক কাজের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে সংগে সংগেই তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা হয়। বলা হয়, এর উদ্দেশ্য শুধু ক্ষমতা দখল করা। এ অভিযোগটিই ফেরাউন হযরত মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে এনেছিল। সে বলেছিল, তোমরা দেশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার জন্য এসেছো : (يونس : ٧٨) تكون لكما الكبرياء فى الارض এ অভিযোগ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধেও আনা হয়েছিল। বলা হয়েছিল : এ ব্যক্তি ইহুদিদের বাদশাহ হতে চায়। আর কুরাইশ সরদাররাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও এ একই সন্দেহ পোষণ করতো। এ জন্য কয়েকবারই তারা তাঁর সাথে এভাবে সওদাবাজী করতে চেয়েছে যে, যদি তুমি কর্তৃত্ব লাভ করতে চাও, তাহলে "বিরোধী" দল ছেড়ে দিয়ে "সরকারী" দলে এসে যাও। তোমাকে আমরা বাদশাহ বানিয়ে নেবো। আসলে যারা সারা জীবন দুনিয়া ও তার বৈষয়িক স্বার্থ এবং তার গৌরব ও বাহ্যিক চাকচিক্য লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তাদের পক্ষে একথা কল্পনা করা কঠিন বরং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যে, এ দুনিয়ায় এমন কোন মানুষ থাকতে পারে যে সদুদ্দেশ্যে ও নিস্বার্থপরতার সাথে মানবতার কল্যাণার্থেও নিজের প্রাণপাত করতে পারে। তারা নিজেরাই যেহেতু নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য প্রতিদিন হৃদয়গ্রাহী শ্লোগান ও সংস্কারের মিথ্যা দাবী পেশ করতে থাকে তাই এ প্রতারণা ও জালিয়াতী তাদের দৃষ্টিতে হয় একেবারেই একটি স্বাভাবিক জিনিস। তারা মনে করে সংস্কার কথাটা প্রতারণা ও

জালিয়াতি ছাড়া কিছু নয়। সততা ও আন্তরিকতার সাথে কখনো সংস্কারমূলক কোন কাজ করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তিই এ নামটি উচ্চারণ করে সে নিশ্চয়ই তাদেরই মত ধোঁকাবাজ। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, সংস্কারকদের বিরুদ্ধে."ক্ষমতা লোভের" এ অপবাদ চিরকাল ক্ষমতাসীন লোকেরা ও তাদের তোষামোদী গোষ্ঠীই লাগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ তারা যেন একথা বলতে চায় যে, তারা নিজেরা ও তাদের মহান প্রভুরা যে ক্ষমতা লাভ করেছে তা যেন তাদের জন্মগত অধিকার। তা অর্জন করার ও তা দখল করে রাখার জন্য তারা কোনক্রমে অভিযুক্ত হতে পারে না। তবে এ "খাদ্যে" যাদের জন্মগত অধিকার ছিল না এবং এখন যারা নিজেদের মধ্যে এর "ক্ষুধা" অনুভব করছে তারা চরমভাবে নিন্দাবাদ লাভের যোগ্য। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য ৩৬ টীকা দেখুন)।

এখানে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, প্রচলিত জীবন ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য যে ব্যক্তিই অগ্রসর হবে এবং এর মোকাবিলায় সংস্কারমূলক মতাদর্শ ও ব্যবস্থা পেশ করবে তার জন্য অবশ্যই সংস্কারের পথে যেসব শক্তিই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে তাদেরকে সরিয়ে দেবার জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং যেসব শক্তি সংস্কারমূলক মতাদর্শ ও ব্যবস্থাকে কার্যত প্রবর্তিত করতে পারবে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। তাছাড়া এ ধরনের লোকের দাওয়াত যখনই সফল হবে, তার স্বাভাবিক পরিণতিতে সে জনগণের ইমাম ও নেতায় পরিণত হবে এবং নতুন ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি হয় তার নিজের হাতে থাকবে নয়তো তার সমর্থক ও অনুসারীরা জনগণের ওপর কর্তৃত্বশীল হবে। দুনিয়ায় এমন কোন্ নবী ও সংস্কারক ছিলেন যিনি নিজের দাওয়াতকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করা যার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল না? আর এমন কে আছেন যার দাওয়াতের সাফল্য তাঁকে যথার্থই নেতায় পরিণত করেনি? তারপর এ বিষয়টি কি সত্যিই কারোর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য যথেষ্ট যে, সে আসলে ক্ষমতালোভী ছিল এবং তার আসল উদ্দেশ্য ছিল নেতৃত্ব লাভ এবং তা সে অর্জন করেছিল? অসৎ প্রকৃতির সত্যের দুশমনরা ছাড়া কেউ এ প্রশ্নের জবাবে হাঁ বলবে না। আসলে ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতা কাংখিত হওয়া এবং কোন সৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতা কাংখিত হওয়ার মধ্যে রয়েছে যমীন আসমান ফারাক। এটা এত বড় ফারাক যেমন ফারাক আছে ডাক্তারের ছুরি ও ডাকাতের ছুরির মধ্যে। ডাক্তার ও ডাকাত উভয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের পেটে ছুরি চালায় এবং এর ফলে অর্থ লাভ করে যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র এ কারণে উভয়কে একাকার করে ফেলে তাহলে এটা হবে নিছক তার নিজেরই চিন্তা বা মনের ভুল। নয়তো উভয়ের নিয়ত, কর্মপদ্ধতি ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এত বেশী পার্থক্য থাকে যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ডাকাতকে ডাক্তার এবং ডাক্তারকে ডাকাত মনে করার মতো ভুল করতে পারে না।

২৭(ক). নূহের সম্প্রদায় আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না এবং তারা একথাও অস্বীকার করতো না যে, তিনিই বিশ্ব–জাহানের প্রভু এবং সমস্ত ফেরেশতা তাঁর নির্দেশের অনুগত, এ বক্তব্য তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শির্ক বা আল্লাহকে অস্বীকার করা এ জাতির আসল ভ্রষ্টতা ছিল না বরং তারা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা এবং তাঁর অধিকারে অন্যকে শরীক করতো।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۝

নূহ বললো, "হে পরওয়ারদিগার! এরা যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে এ জন্য তুমিই আমাকে সাহায্য করো।"[২৮] আমি তার কাছে অহী করলাম, "আমার তত্বাবধানে এবং আমার অহী মোতাবেক নৌকা তৈরী করো। তারপর যখন আমার হুকুম এসে যাবে এবং চুলা উথলে উঠবে[২৯] তখন তুমি সব ধরনের প্রাণীদের এক একটি জোড়া নিয়ে এতে আরোহণ করো এবং পরিবার পরিজনদেরকেও সংগে নাও, তাদের ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে এবং জালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলো না, তারা এখন ডুবতে যাচ্ছে।

২৮. অর্থাৎ আমার প্রতি এভাবে মিথ্যা আরোপ করার প্রতিশোধ নাও। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (القمر : ١٠)

"কাজেই নূহ নিজের রবকে ডেকে বললো : আমাকে দমিত করা হয়েছে, এখন তুমিই এর বদ্লা নাও।" (আল কামার, ১০)

সূরা নূহে বলা হয়েছে :

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

"আর নূহ বললো : হে আমার পরওয়ারদিগার! এ পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে একজন অধিবাসীকেও ছেড়ে দিও না। যদি তুমি তাদেরকে থাকতে দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করে দেবে এবং তাদের বংশ থেকে কেবল দুষ্কৃতকারী ও সত্য অস্বীকারকারীরই জন্ম হবে।" (২৭ আয়াত)

২৯. কেউ কেউ تنور (তান্নূর) বলতে ভূমি বুঝেছেন। কেউ এর অর্থ করেছেন ভূমির উচ্চতম অংশ। কেউ বলেছেন, فار التنور মানে হচ্ছে প্রভাতের উদয়। আবার কারোর মতে এটি حمى الوطيس এর মতো একটি উপমা, যার মানে হয় "পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া।" কিন্তু বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করার পথে যখন কোন বাধা নেই তখন কুরআনের

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ
نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا
وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾
ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ
اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾

তারপর যখন তুমি নিজের সাথীদের নিয়ে নৌকায় আরোহণ করবে তখন বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন জালেমদের হাত থেকে।[৩০] আর বলো, হে পরওয়ারদিগার! আমাকে নামিয়ে দাও বরকতপূর্ণ স্থানে এবং তুমি সর্বোত্তম স্থান দানকারী।"[৩১]

এ কাহিনীতে বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে,[৩২] আর পরীক্ষা তো আমি করেই থাকি।[৩৩]

তাদের পরে আমি অন্য এক যুগের জাতির উত্থান ঘটালাম।[৩৪] তারপর তাদের মধ্যে স্বয়ং তাদের সম্প্রদায়ের একজন রসূল পাঠালাম (যে তাদেরকে দাওয়াত দিল এ মর্মে যে,) আল্লাহর বন্দেগী করো, তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা কি ভয় করো না?

শব্দাবলীর কোন প্রকার সম্বন্ধ–সামঞ্জস্য ছাড়াই পরোক্ষ অর্থে গ্রহণ করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। এ শব্দাবলী পড়ার পর প্রথমে মনের মধ্যে যে অর্থটির উদয় হয় তা হচ্ছে এই যে, কোন বিশেষ চুলা পূর্ব থেকেই এভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে, তার নিম্নদেশ ফেটে পানি উথলে ওঠার মাধ্যমে প্লাবনের সূচনা হবে। অন্য কোন অর্থের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন তখনই আসে যখন এত বড় প্লাবন একটি চুলার নিচে থেকে পানি উথলে ওঠার মাধ্যমে শুরু হয়ে থাকবে বলে মানুষ মেনে নিতে রাজি না হয়। কিন্তু আল্লাহর কর্মকাণ্ড বড়ই অদ্ভুত। তিনি যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করেন তখন এমন পথে করেন যার কোন কল্পনাই সে করতে পারে না।

৩০. কোন জাতির ধ্বংসের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার হুকুম দেয়া তার চরম অসদাচার, লাম্পট্য ও দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ।

৩১. নামিয়ে দেয়া মানে নিছক নামিয়ে দেয়া নয় বরং আরবী প্রবাদ অনুযায়ী এর মধ্যে "আপ্যায়নের" অর্থও রয়েছে। অন্য কথায় এ দোয়ার অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! এখন আমরা তোমার মেহমান এবং তুমিই আমাদের আপ্যায়নকারী মেজবান।

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ
وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ
مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا
مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ
تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾
إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

৩ রুকূ'

তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং আখেরাতের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলেছিল, যাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে প্রাচুর্য দান করেছিলাম,[৩৫] তারা বলতে লাগলো, "এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যা কিছু খাও তা–ই সে খায় এবং তোমরা যা কিছু পান করো তা–ই সে পান করে। এখন যদি তোমরা নিজেদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩৬] সে কি তোমাদেরকে একথা জানায় যে, যখন তোমরা সবার পরে মাটিতে মিশে যাবে এবং হাড়গোড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে? অসম্ভব, তোমাদের সাথে এই যে অংগীকার করা হচ্ছে এটা একেবারেই অসম্ভব। জীবন কিছুই নয়, ব্যস এ পার্থিব জীবনটি ছাড়া; এখানেই আমরা মরি–বাঁচি এবং আমাদের কখখনো পুনরুজ্জীবিত করা হবে না।

৩২. অর্থাৎ এর মধ্যে রয়েছে গ্রহণযোগ্য শিক্ষা। এ শিক্ষা হচ্ছে ঃ তাওহীদের দাওয়াত দানকারী নবীগণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং শিরকপন্থী কাফেররা ছিল মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর আজ মক্কায় সে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা এক সময় ছিল হযরত নূহ ও তার জাতির মধ্যে। এর পরিণামও তার চেয়ে কিছু ভিন্ন হবার নয়। আল্লাহর ফায়সালায় যতই বিলম্ব হোক না কেন একদিন অবশ্যই তা হয়েই যায় এবং অনিবার্যভাবে তা হয় সত্যপন্থীদের পক্ষে এবং মিথ্যাপন্থীদের বিপক্ষে।

৩৩. এর অন্য একটি অনুবাদ এও হতে পারে, "পরীক্ষা তো আমি করতেই চেয়েছিলাম" অথবা "পরীক্ষা তো আমাকে করতেই হবে"। তিনটি অবস্থায়ই এ সত্যটি অবগত করানোই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ কোন জাতিকেই নিজের রাজ্যে নিজের অসংখ্য

জিনিসের ওপর কর্তৃত্ব দান করে এমনিই তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন না। বরং তাকে পরীক্ষা করেন এবং নিজের কর্তৃত্ব ক্ষমতাকে সে কিভাবে ব্যবহার করছে তা দেখতে থাকেন। নূহের জাতির সাথে যা কিছু ঘটেছে এ নিয়ম অনুযায়ীই ঘটেছে এবং অন্য কোন জাতিই আল্লাহর এত প্রিয় নয় যে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাণ্ডার থেকে নিজের ইচ্ছে মতো নেবার জন্য তাকে অবাধ স্বাধীনতা দিবেন। এ ব্যাপারে অবশ্যই সবার সাথে একই ব্যবহার করা হয়।

৩৪. কেউ কেউ এখানে সামূদ জাতির কথা বলা হয়েছে বলে মনে করেছেন। কারণ সামনের দিকে গিয়ে বলা হচ্ছে ঃ এ জাতিকে "সাইহাহ" তথা প্রচণ্ড আওয়াজের আযাবে ধ্বংস করা হয়েছিল এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে, সামূদ এমন একটি জাতি যার ওপর এ আযাব এসেছিল। (হূদ, ৬৭; আল হিজ্‌র, ৮৩ ও আল কামার, ৩১) অন্য কিছু মুফাস্‌সির বলেছেন, এখানে আসলে আদ জাতির কথা বলা হয়েছে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে নূহের জাতির পরে এ জাতিটিকেই বৃহৎ শক্তিধর করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ (اعراف : ٦٩)

এ দ্বিতীয় কথাটিই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ "নূহের জাতির পরে" শব্দাবলী এ দিকেই ইংগিত করে। আর "সাইহাহ্" (প্রচণ্ড আওয়াজ, চিৎকার, শোরগোল, মহাগোলযোগ) এর সাথে যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে নিছক এতটুকু সম্বন্ধই এ জাতিকে সামূদ গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এ শব্দটি সাধারণ ধ্বংস ও মৃত্যুর জন্য দায়ী বিকট ধ্বনির জন্য যেমন ব্যবহার হয় তেমনি ধ্বংসের কারণ যাই হোক না কেন ধ্বংসের সময় যে শোরগোল ও মহা গোলযোগের সৃষ্টি হয় তার জন্যও ব্যবহার হয়।

৩৫. এখানে বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলো ভেবে দেখার মতো। নবীর বিরোধিতায় যারা এগিয়ে এসেছিল। তারা ছিল জাতির নেতৃস্থানীয় লোক। তাদের সবার মধ্যে যে ভ্রষ্টতা একযোগে কাজ করছিল তা ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করতো। তাই তাদের মনে আল্লাহর সামনে কোন জবাবদিহি করার আশংকা ছিল না। আর এ জন্যই দুনিয়ার এ জীবনটাই ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং "বৈষয়িক কল্যাণ ও সাফল্যের" উর্ধে অন্য কোন মূল্যবোধের স্বীকৃতি তাদের কাছে ছিল না। আবার যে জিনিসটি তাদেরকে এ ভ্রষ্টতার মধ্যে একেবারেই নিমজ্জিত করে দিয়েছিল তা ছিল এমন পর্যায়ের প্রাচুর্য ও সুখ–সম্ভোগ যাকে তারা নিজেদের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার প্রমাণ মনে করতো। এ সংগে তারা একথাও মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, যে আকীদা–বিশ্বাস, নৈতিক ব্যবস্থা ও জীবনধারার ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে তারা দুনিয়ায় এসব সাফল্য অর্জন করেছে তা ভুলও হতে পারে। মানুষের ইতিহাস বারবার এ সত্যটির পুনরাবৃত্তি করে চলেছে যে, সত্যের দাওয়াতের বিরোধিতাকারীদের দলে সবসময় এ তিন ধরনের বৈশিষ্টের অধিকারী লোকরাই আসে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় তাঁর সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এটিই ছিল সেখানকার পরিস্থিতি।

৩৬. কেউ কেউ ভুল বুঝেছেন যে, তারা নিজেদের মধ্যে এসব কথা বলাবলি করতো। না, বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করে তারা একথা বলতো। জাতির সরদাররা যখন

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿৩৮﴾
قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿৩৯﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ
نَادِمِينَ ﴿৪০﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿৪১﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿৪২﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ
أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿৪৩﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً
رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا
لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿৪৪﴾

এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিছক মিথ্যা তৈরী করছে[৩৬(ক)] এবং আমরা কখনো তার কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।" রসূল বললো, "হে আমার রব! এ লোকেরা যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো এ ব্যাপারে এখন তুমিই আমাকে সাহায্য করো।" জবাবে বলা হলো, "অচিরেই তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করবে।" শেষ পর্যন্ত যথাযথ সত্য অনুযায়ী একটি মহা গোলযোগ তাদেরকে ধরে ফেললো এবং আমি তাদেরকে কাদা[৩৭] বানিয়ে নিক্ষেপ করলাম—দূর হয়ে যাও জালেম জাতি!

তারপর আমি তাদের পরে অন্য জাতিদের উঠিয়েছি। কোন জাতি তার সময়ের পূর্বে শেষ হয়নি এবং তার পরে টিকে থাকতে পারেনি। তারপর আমি একের পর এক নিজের রসূল পাঠিয়েছি। যে জাতির কাছেই তার রসূল এসেছে সে–ই তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, আর আমি একের পর এক জাতিকে ধ্বংস করে গেছি এমনকি তাদেরকে স্রেফ কাহিনীই বানিয়ে ছেড়েছি, —অভিসম্পাত তাদের প্রতি যারা ঈমান আনে না।[৩৮]

আশংকা করলো, জনগণ নবীর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব এবং হৃদয়গ্রাহী কথায় প্রভাবিত হয়ে যাবে এবং তাদের প্রভাবিত হয়ে যাবার পর আমাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আর কাদের ওপর চলবে তখন তারা নিজেদের বক্তৃতার মাধ্যমে এসব কথা জনগণের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকলো। ওপরে নূহের জাতির আলোচনায় যে কথা বলা হয়েছিল এটি তারই দ্বিতীয় একটি দিক। তারা বলতো, আল্লাহর পক্ষ থেকে এসব নবুয়ত টবুয়ত কিছুই দেয়া হয়নি এটা হচ্ছে আসলে ক্ষমতা লিপ্সা, এরি মোহে অন্ধ হয়ে এ ব্যক্তি এসব আবোল তাবোল বলছে। তারা বলে ঃ ভাইসব! একটু ভেবে দেখো, এ ব্যক্তি কোন্ ব্যাপারে

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

তারপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে নিজের নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণ[৩৯] সহকারে ফেরাউন ও তার রাজ পারিষদদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করলো এবং তারা ছিল বড়ই আস্ফালনকারী।[৪০] তারা বলতে লাগলো, "আমরা কি আমাদেরই মতো দু'জন লোকের প্রতি ঈমান আনবো?[৪০(ক)] আর তারা আবার এমন লোক যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস।"[৪১] কাজেই তারা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করলো এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হলো।[৪২] আর মূসাকে আমি কিতাব দান করেছি যাতে লোকেরা তার সাহায্যে পথের দিশা পায়।

আর মারয়াম পুত্র ও তার মাকে আমি একটি নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম[৪৩] এবং তাদেরকে রেখেছিলাম একটি সুউচ্চ ভূমিতে, সে স্থানটি ছিল নিরাপদ এবং সেখানে স্রোতস্বিনী প্রবহমান ছিল।[৪৪]

তোমাদের থেকে আলাদা? তোমাদের শরীর যেমন রক্ত–মাংসের তারও তাই। তোমাদের ও তার মধ্যে কোন ফারাক নেই। তাহলে কেন সে বড় হবে এবং তোমরা তার ফরমানের আনুগত্য করবে? তাদের এসব ভাষণের মধ্যে যেন একথা নির্বিবাদে স্বীকৃত ছিল যে, তারা যে তাদের নেতা এ নেতৃত্ব তো তাদের লাভ করারই কথা, তাদের শরীরের রক্ত মাংস ও তাদের পানাহারের ধরন ধারণের প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রশ্নই দেখা দেয় না, তাদের নেতৃত্ব আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ এটা তো আপনা আপনিই প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। আসলে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এ নতুন নেতৃত্ব, যা এখন প্রতিষ্ঠা লাভের পথে। এভাবে তাদের কথাগুলো নূহের জাতির নেতাদের কথা থেকে কিছু বেশী ভিন্নতর ছিল না। তাদের মতে কোন নতুন আগমনকারীর মধ্যে যে "ক্ষমতা লিপ্সা" অনুভূত হয় অথবা তার মধ্যে এ লিপ্সা থাকার যে সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে সেটিই হচ্ছে নিন্দনীয় ও অপবাদযোগ্য। আর নিজেদের ব্যাপারে তারা মনে করতো যে, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের

প্রকৃতিগত অধিকার, এ অধিকারের ক্ষেত্রে তারা সীমা ছাড়িয়ে গেলেও তা কোন ক্রমেই নিন্দনীয় ও আপত্তিকর হবার কথা নয়।

৩৬(ক). এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর অস্তিত্বকে তারাও অস্বীকার করতো না। তাদেরও আসল ভ্রষ্টতা ছিল শিরক। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ জাতির এ অপরাধই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন দেখুন আল আ'রাফ, ৭: হূদ, ৫৩–৫৪; হা–মীম আস্‌সাজদাহ, ১৪ এবং আল আহকাফ, ২১–২২ আয়াত।

৩৭. মূলে غُثَاءً শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হয় বন্যার তোড়ে ভেসে আসা ময়লা আবর্জনা, যা পরবর্তী পর্যায়ে কিনারায় আটকে পড়ে পচে যেতে থাকে।

৩৮. অন্য কথায় যারা নবীদের কথা মানে না।

৩৯. নিদর্শনের পরে "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলার অর্থ এও হতে পারে যে, ঐ নিদর্শনাবলী তাঁদের সাথে থাকাটাই একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর। অথবা নিদর্শনাবলী বলতে বুঝানো হয়েছে "লাঠি" ছাড়া মিসরে অন্যান্য যেসব মু'জিযা দেখানো হয়েছে সেগুলো সবই, আর "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলতে "লাঠি" বুঝানো হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে যে মু'জিযার প্রকাশ ঘটেছে সেগুলোর পরে তো একথা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এরা দু'ভাই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছেন, (বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আয যুখরুফ, ৪৩–৪৪ টীকা দেখুন)।

৪০. মূলে وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তারা ছিল বড়ই আত্মম্ভরী, জালেম ও কঠোর। দুই, তারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করতো এবং উদ্ধত আস্ফালন করতো।

৪০(ক). ব্যাখ্যার জন্য ২৬ টীকা দেখুন।

৪১. আরবী ভাষায় কারো "ফরমানের অনুগত" হওয়া এবং "তার ইবাদাতগুজার" হওয়া প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হয়। যে ব্যক্তি কারোর বন্দেগী–দাসত্ব ও আনুগত্য করে সে যেন তার ইবাদাত করে। এ থেকে "ইবাদাত" শব্দটির অর্থের ওপর এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাঁর ছাড়া বাকি সবার ইবাদাত পরিত্যাগ করার যে আদেশ নবীগণ তাদের দাওয়াতের মধ্যে দিতেন তার পূর্ণ অর্থ কি ছিল তার ওপর বড়ই গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত হয়। তাঁদের কাছে "ইবাদাত" নিছক "পূজা অনুষ্ঠান" ছিল না। তাঁরা এ দাওয়াত দেননি যে, আল্লাহকে কেবল পূজা করো এবং এরপর যাকে ইচ্ছা তার বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করতে থাকো। বরং তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পূজারী করতে চাইতেন এবং একই সংগে তাঁর ফরমানের অনুগতও। আর এ উভয় অর্থের দৃষ্টিতে অন্য কারো ইবাদাত করাকে পথভ্রষ্টতা গণ্য করতেন। (আরো বেশী জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, আল কাহফ, ৫০ টীকা দেখুন)।

৪২. মূসা ও ফেরাউনের কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য পড়ুন সূরা আল বাকারাহ, ৪৯–৫০; আল আ'রাফ, ১০৩ থেকে ১৩৬; ইউনুস, ৭৫ থেকে ৯২; হূদ, ৯৬ থেকে ৯৯; বনী ইসরাঈল, ১০১ থেকে ১০৪ এবং ত্বা–হা, ৯ থেকে ৮০ আয়াত।

৪৩. একথা বলা হয়নি যে, মারয়াম পুত্র একটি নিদর্শন ছিল এবং স্বয়ং মারয়াম একটি নিদর্শন ছিল। আবার একথাও বলা হয়নি যে, মারয়াম পুত্র ও তার মাকে দু'টি

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

৪ রুকূ'

হে রসূল।[৪৫] পাক–পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো।[৪৬] তোমরা যা কিছুই করো না কেন আমি তা ভালোভাবেই জানি। আর তোমাদের এ উম্মত হচ্ছে একই উম্মত এবং আমি তোমাদের রব, কাজেই আমাকেই তোমরা ভয় করো।[৪৭]

কিন্তু পরে লোকেরা নিজেদের দীনকে পরস্পরের মধ্যে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তার মধ্যেই তারা নিমগ্ন হয়ে গেছে।[৪৮]

নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম। বরং বলা হয়েছে, তাদের দু'জনকে মিলিয়ে একটি নিদর্শনে পরিণত করা হয়েছিল। এর অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, পিতা ছাড়া ইবনে মার্য়ামের জন্ম হওয়া এবং স্বামীর সাহচর্য ছাড়া মার্য়ামের গর্ভধারণ করাই এমন একটি জিনিস যা তাদের দু'জনকে একটি নিদর্শনে পরিণত করে দেয়। যারা পিতা ছাড়া হযরত ঈসার জন্ম অস্বীকার করে তারা মাতা ও পুত্রের একটি নিদর্শন হবার কি ব্যাখ্যা দেবেন? (আরো বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৪৪–৫৩; আন নিসা, ১৯০, ২১২, ২১৩; মার্য়াম, ১৫ থেকে ২২ এবং আল আম্বিয়া, ৮৯–৯০ টীকা দেখুন) এখানে দু'টি কথা আরো ব্যাখ্যা যোগ্য। এক, হযরত ঈসা ও তাঁর মাতার ব্যাপারটি মূর্খ লোকদের আর একটি দুর্বলতা চিহ্নিত করছে। ওপরে যে সকল নবীর কথা আলোচনা করা হয়েছে তাদের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি তো এ বলে অস্বীকার করা হয়েছে যে, তোমরা তো মানুষ আর মানুষ কি কখনো নবী হতে পারে? কিন্তু লোকেরা যখন হযরত ঈসার ও তাঁর মায়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তাদের ভক্ত হয়ে গেলো তখন তাদেরকে মানুষের মর্যাদা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিল। দুই, যারা হযরত ঈসার অলৌকিক জন্ম এবং দোলনায় শায়িত অবস্থায় তাঁর ভাষণ শুনে তাঁর মুজিযা হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখে নেয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং হযরত মার্য়ামকে অপবাদ দিয়েছিল তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হয়েছিল যা সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য চিরকালীন শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

৪৪. বিভিন্ন জন এ থেকে বিভিন্ন স্থানের কথা মনে করেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি ছিল দামেশ্‌ক। কেউ বলেন, আর্‌রম্‌লাহ। কেউ বলেন, বাইতুল মাক্‌দিস আবার কেউ বলেন মিসর। খৃষ্টীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মার্য়াম হযরত ঈসার জন্মের পর তাঁর

হেফাজতের জন্য দু'বার স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রথমবার বাদশাহ হিরোডিয়াসের আমলে তিনি তাকে মিসরে নিয়ে যান এবং বাদশাহর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তারপর আর্‌খিলাউসের শাসনামলে তাঁকে গালীলের নাসেরাহ শহরে আশ্রয় নিতে হয়। (মথি ২ ঃ ১৩ থেকে ২৩) এখন কুরআন কোন্ স্থানটির প্রতি ইংগিত করছে তা নিশ্চয়তা সহকারে বলা কঠিন। আভিধানিক অর্থে "রাবওয়াহ" এমন সুউচ্চ ভূমিকে বলা হয় যা সমতল এবং আশপাশের এলাকা থেকে উঁচু। অন্যদিকে "যা-তি কারার" (ذات قرار) মানে হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং অবস্থানকারী সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে পারে। আর "মাঈন"(معين) মানে হচ্ছে বহমান পানি বা নির্ঝরিণী।

৪৫. আগের ২টি রুকূ'তে বিভিন্ন নবীর কথা বলার পর এখন يَاَيُّهَا الرُّسُلُ বলে সকল নবীকে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে, সকল নবী এক সংগে এক জায়গায় ছিলেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। বরং এ থেকে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, প্রতি যুগে বিভিন্ন দেশে ও জাতির মধ্যে আগমনকারী নবীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের সবাইকে একই হুকুম দেয়া হয়েছিল। পরের আয়াতে যেহেতু সকল নবীকে এক উম্মত, এক জামায়াত ও এক দলভুক্ত গণ্য করা হয়েছে তাই এখানে এমন বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে যার ফলে চোখের সামনে তাদের সবার এক দলভুক্ত হবার ছবি ভেসে ওঠে। তারা যেন সবাই এক জায়গায় সমবেত আছেন এবং সবাইকে একই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ যুগের একদল স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন লোক এ বর্ণনা রীতির সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারেননি এবং তারা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এ সম্বোধনটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আগমনকারী নবীদেরকে করা হয়েছে এবং এ থেকে তাঁর পরে নবুওয়াতের ধারা পরম্পরা জারি হবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাবতে অবাক লাগে যে, যারা ভাষা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম রসবোধ থেকে এত বেশী বঞ্চিত তারা আবার কুরআনের ব্যাখ্যা করার দুঃসাহস করেন।

৪৬. পাক-পবিত্র জিনিস বলে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যা নিজেও পাক-পবিত্র এবং হালাল পথে অর্জিতও হয়। পবিত্র জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। মুসলমান বৈরাগী ও যোগীর মতো পবিত্র জীবিকা থেকে যেমন নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি দুনিয়া পূজারী ও ভোগবাদীর মতো হালাল-হারামের পার্থক্য না করে সব জিনিসে মুখও লাগাতে পারে না।

সৎকাজ করার আগে পবিত্র ও হালাল জিনিস খাওয়ার নির্দেশের মধ্যে এদিকে পরিষ্কার ইংগিত রয়েছে যে, হারাম খেয়ে সৎকাজ করার কোন মানে হয় না। সৎকাজের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে হালাল রিযিক খাওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে লোকেরা! আল্লাহ নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন।" তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন এবং তারপর বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

—বেশ, তাহলে ছেড়ে দাও তাদেরকে, ডুবে থাকুক নিজেদের গাফিলতির মধ্যে একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত।[৪৯]

তারা কি মনে করে, আমি যে তাদেরকে অর্থ ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি, তা দ্বারা আমি তাদেরকে কল্যাণ দানে তৎপর রয়েছি? না, আসল ব্যাপার সম্পর্কে তাদের কোন চেতনাই নেই।[৫০]

اَلرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَارَبِّ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ

"এক ব্যক্তি আসে সুদীর্ঘ পথ সফর করে। দেহ ধূলি ধূসরিত। মাথার চুল এলোমেলো। আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করে : হে প্রভু! হে প্রভু! কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, কাপড় চোপড় হারাম এবং হারাম খাদ্যে তার দেহ প্রতিপালিত হয়েছে। এখন কিভাবে এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে।" [মুসলিম, তিরমিযী ও আহমাদ, আবু হুরাইরা (রা) থেকে]

৪৭. "তোমাদের উম্মত একই উম্মত"—অর্থাৎ তোমরা একই দলের লোক। "উম্মত" শব্দটি এমন ব্যক্তি সমষ্টির জন্য বলা হয় যারা কোন সম্মিলিত মৌলিক বিষয়ের জন্য একতাবদ্ধ হয়। নবীগণ যেহেতু স্থান–কালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই বিশ্বাস, একই জীবন বিধান ও একই দাওয়াতের ওপর একতাবদ্ধ ছিলেন, তাই বলা হয়েছে, তাঁদের সবাই একই উম্মত। পরবর্তী বাক্য নিজেই সে মৌলিক বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছে যার ওপর সকল নবী একতাবদ্ধ ও একমত ছিলেন। (অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারাহ, ১৩০ থেকে ১৩৩; আলে ইমরান, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৪, ৬৪ ও ৭৯ থেকে ৮৫; আন নিসা, ১৫০ থেকে ১৫২; আল আ'রাফ, ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; ইউসুফ, ৩৭ থেকে ৪০; মারয়াম, ৪৯ থেকে ৫৯ এবং আল আম্বিয়া, ৭১ থেকে ৯৩ আয়াত।)

৪৮. এটা নিছক ঘটনার বর্ণনা নয় বরং সূরার শুরু থেকে যে যুক্তিধারা চলে আসছে তার একটি পর্যায়। যুক্তির সারসংক্ষেপ হচ্ছে, নূহ আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবী যখন এ তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়ে এসেছেন তখন অনিবার্যভাবে এ থেকে প্রমাণ হয়, এ ইসলামই মানব জাতির আসল দীন বা ধর্ম। অন্যান্য যেসব ধর্মের অস্তিত্ব আজ দুনিয়ার বুকে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো এ দীনেরই বিকৃত রূপ। এর কোন কোন নির্ভুল অংশের চেহারা বিকৃত করে এবং তার মধ্যে অনেক মনগড়া কথা বাড়িয়ে দিয়ে সেগুলো তৈরী করা হয়েছে। এখন যারা এসব ধর্মের ভক্ত–অনুরক্ত তারাই ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে। অন্যদিকে যারা এগুলো ত্যাগ করে আসল দীনের দিকে আহবান জানাচ্ছে তারা মোটেই বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে না।

৪৯. প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যের মাঝখানে একটি ফাঁক আছে। এ ফাঁকটি ভরে দেয়ার পরিবর্তে শ্রোতার চিন্তা–কল্পনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ ভাষণের পটভূমি নিজেই তাকে ভরে ফেলছে। এ পটভূমি হচ্ছে, আল্লাহর এক বান্দা পাঁচ ছয় বছর থেকে মানুষকে আসল দীনের দিকে ডাকছেন। যুক্তির সাহায্যে তাদেরকে নিজের কথা বুঝিয়ে বলছেন। ইতিহাসের নজীর পেশ করছেন। তার দাওয়াতের প্রভাব ও ফলাফল কার্যত চোখের সামনে আসছে। তারপর তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রও সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। কিন্তু এ সত্ত্বেও লোকেরা শুধু যে বাপ–দাদাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাতিলের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে তা নয় এবং শুধু যে সুস্পষ্ট যুক্তি–প্রমাণ সহকারে যে সত্য পেশ করা হচ্ছে তাকে মেনে নিতেও তারা প্রস্তুত হয়নি তা নয়। বরং তারা আদাপানি খেয়ে সত্যের আহবায়কের পিছনেও লেগে যায় এবং তাঁর দাওয়াতকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য হঠকারিতা, অপবাদ রটনা, জুলুম, নিপীড়ন, মিথ্যাচার তথা যাবতীয় নিকৃষ্ট ধরনের কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকছে না। এহেন পরিস্থিতিতে আসল সত্য দীনের একক অস্তিত্ব এবং পরবর্তীতে উদ্ভাবিত ধর্মসমূহের স্বরূপ বর্ণনা করার পর "ছেড়ে দাও তাদেরকে, ডুবে থাকুক তারা নিজেদের গাফিলতির মধ্যে" একথা বলা স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থ প্রকাশ করে যে, "ঠিক আছে, যদি এরা না মেনে নেয় এবং নিজেদের ভ্রষ্টতার মধ্যে আকন্ঠ ডুবে থাকতে চায় তাহলে এদেরকে সেভাবেই থাকতে দাও।" এই "ছেড়ে দাও"–কে একেবারেই শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করে "এখন আর প্রচারই করো না" বলে মনে করা বাকভংগী সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রমাণ করবে। এ ধরনের অবস্থায় একথা প্রচার ও উপদেশ দানে বিরত থাকার জন্য নয় বরং গাফিলদেরকে ঝাঁকুনি দেবার জন্য বলা হয়ে থাকে। তারপর "একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত" শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি গভীর সতর্ক সংকেত। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ গাফিলতির মধ্যে ডুবে থাকার ব্যাপারটা দীর্ঘক্ষণ চলতে পারবে না। এমন একটি সময় আসবে যখন তারা সজাগ হয়ে যাবে এবং আহবানকারী যে জিনিসের দিকে আহবান করছিল তার স্বরূপ তারা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তারা নিজেরা যে জিনিসের মধ্যে ডুবে ছিল তার সঠিক চেহারাও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

৫০. এখানে এসে সূরার সূচনা পর্বের আয়াতগুলোর ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিন। সে একই বিষয়বস্তুকে আবার অন্যভাবে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা "কল্যাণ", "ভালো" ও "সমৃদ্ধি"র একটি সীমিত বস্তুবাদী ধারণা রাখতো। তাদের মতে, যে ব্যক্তি ভালো খাবার, ভালো পোশাক ও ভালো ঘর–বাড়ি লাভ করেছে, যাকে অর্থ–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি দান করা হয়েছে এবং সমাজে যে খ্যাতি ও প্রভাব–প্রতিপত্তি অর্জন করতে পেরেছে সে সাফল্য লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ মৌলিক বিভ্রান্তির ফলে তারা আবার এর চেয়ে অনেক বড় আর একটি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। সেটি ছিল এই যে, এ অর্থে যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে সে নিশ্চয়ই সঠিক পথে রয়েছে বরং সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নয়তো এসব সাফল্য লাভ করা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হলো। পক্ষান্তরে এ সাফল্য থেকে যাদেরকে আমরা প্রকাশ্যে বঞ্চিত দেখছি তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ভুল পথে রয়েছে এবং তারা খোদা বা খোদাদের গযবের শিকার হয়েছে। এ বিভ্রান্তিটি আসলে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর অধিকারী লোকদের ভ্রষ্টতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্যতম। একে কুরআনের

বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে একে খণ্ডন করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে প্রকৃত সত্য কি তা বলে দেয়া হয়েছে। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা আল বাকারাহ, ১২৬ ও ২১২; আল আ'রাফ, ৩২; আত্ তাওবাহ, ৫৫, ৬৯ ও ৮৫; ইউনুস, ১৭; হূদ, ৩, ২৭ থেকে ৩১, ৩৮ ও ৩৯; আর রা'আদ, ২৬; আল কাহ্ফ, ২৮, ৩২ থেকে ৪৩ ও ১০৩ থেকে ১০৫; মারয়াম, ৭৭ থেকে ৮০; ত্বা-হা, ১৩১ ও ১৩২ ও আল আম্বিয়া, ৪৪ আয়াত এবং এই সংগে টীকাগুলোও)।

এ ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য রয়েছে যেগুলো ভালোভাবে অনুধাবন না করলে চিন্তা ও মন-মানস কখনোই পরিচ্ছন্ন হতে পারে না।

এক ঃ "মানুষের সাফল্য"কে কোন ব্যক্তি, দল বা জাতির নিছক বস্তুবাদী সমৃদ্ধি ও সাময়িক সাফল্য অর্থে গ্রহণ করার চাইতে তা অনেক বেশী ব্যাপক ও উন্নত পর্যায়ের জিনিস।

দুই ঃ সাফল্যকে এ সীমিত অর্থে গ্রহণ করার পর যদি তাকেই সত্য ও মিথ্যা এবং ভালো ও মন্দের মানদণ্ড গণ্য করা হয় তাহলে তা এমন একটি মৌলিক ভ্রষ্টতায় পরিণত হয় যার মধ্য থেকে বাইরে বের না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষ কখনো বিশ্বাস, চিন্তা, নৈতিকতা ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে সঠিক পথ লাভ করতেই পারে না।

তিন ঃ দুনিয়াটা আসলে প্রতিদান দেবার জায়গা নয় বরং পরীক্ষাগৃহ। এখানে নৈতিক শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকলেও তা বড়ই সীমিত পর্যায়ের ও অসম্পূর্ণ ধরনের এবং তার মধ্যেও পরীক্ষার দিকটি রয়েছে। এ সত্যটি এড়িয়ে গিয়ে একথা মনে করা যে, এখানে যে ব্যক্তি যে নিয়ামতই লাভ করছে তা লাভ করছে "পুরস্কার" হিসেবেই এবং সেটি লাভ করা পুরস্কার লাভকারীর সত্য, সৎ ও আল্লাহর প্রিয় হবার প্রমাণ আর যার ওপর যে বিপদও আসছে তা হচ্ছে তার "শাস্তি" এবং তা একথাই প্রমাণ করছে যে, শাস্তিলাভকারী মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে অসৎ ও আল্লাহর কাছে অপ্রিয়। আসলে এসব কিছু একটি বিভ্রান্তি বরং নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভবত আমাদের সত্য সম্পর্কিত ধারণা ও নৈতিকতার মানদণ্ডকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় আর কোন জিনিস নেই। একজন সত্যসন্ধানীকে প্রথম পদক্ষেপেই একথা অনুধাবন করতে হবে যে, এ দুনিয়াটি মূলত একটি পরীক্ষাগৃহ এবং এখানে অসংখ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যক্তিদের, জাতিদের ও সমগ্র বিশ্বমানবতার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এ পরীক্ষার মাঝখানে লোকেরা যে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয় সেগুলো পুরস্কার ও শাস্তির শেষ পর্যায় নয়। কাজেই সেগুলোকে মতবাদ, চিন্তাধারা, নৈতিকতা ও কর্মকাণ্ডের সঠিক ও বেঠিক হওয়ার মানদণ্ডে পরিণত করা এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় ও অপ্রিয় হবার আলামত গণ্য করা যাবে না।

চার ঃ সাফল্যের প্রান্ত নিশ্চিতভাবেই সত্য ও সৎকর্মের সাথে বাঁধা আছে এবং মিথ্যা ও অসৎকর্মের পরিণাম ক্ষতি এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দুনিয়ায় যেহেতু মিথ্যা ও অসৎকর্মের সাথে সাময়িক ও বাহ্যিক সাফল্য এবং অনুরূপভাবে সত্য ও সৎকর্মের সাথে প্রকাশ্য ও সাময়িক ক্ষতি সম্ভবপর আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ জিনিসটি ধোঁকা বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাই সত্য-মিথ্যা ও সৎ-অসৎ যাচাই করার জন্য একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

আসলে কল্যাণের দিকে দৌড়ে যাওয়া ও অগ্রসর হয়ে তা অর্জনকারী লোক[৫০(ক)] তো তারাই যারা নিজেদের রবের ভয়ে ভীত,[৫১] যারা নিজেদের রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে,[৫২] যারা নিজেদের রবের সাথে কাউকে শরীক করে না[৫৩] এবং যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যা কিছুই দেয় এমন অবস্থায় দেয় যে, তাদের অন্তর এ চিন্তায় কাঁপতে থাকে যে, তাদেরকে তাদের রব্বের কাছে ফিরে যেতে হবে।[৫৪] আমি কোন ব্যক্তির ওপর[৫৪(ক)] তার সাধ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব অর্পণ করি না[৫৫] এবং আমার কাছে একটি কিতাব আছে যা (প্রত্যেকের অবস্থা) ঠিকমতো জানিয়ে দেয়[৫৬] আর কোনক্রমেই লোকদের প্রতি জুলুম করা হবে না।[৫৭]

মানদণ্ডের প্রয়োজন, যার মধ্যে প্রতারণার ভয় থাকবে না। নবীগণের শিক্ষা ও আসমানী কিতাবসমূহ আমাদের এ মানদণ্ড সরবরাহ করে। মানুষের সাধারণ জ্ঞান (Common-sense)–এর সঠিক হওয়ার সত্যতা বিধান করে এবং "মারূফ" ও "মুন্‌কার" তথা সৎ–কাজ ও অসৎকাজ সম্পর্কিত মানব জাতির সম্মিলিত মানসিক চিন্তা–অনুভূতি এর সত্যতার সাক্ষ দেয়।

পাঁচ ঃ যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি একদিকে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ফাসেকী, অশ্লীল কার্যকলাপ, জুলুম ও সীমালংঘন করতে থাকে এবং অন্যদিকে তার ওপর অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে তখন বুঝতে হবে, বুদ্ধি ও কুরআন উভয় দৃষ্টিতে আল্লাহ তাকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন এবং তার ওপর আল্লাহর করুণা নয় বরং তাঁর ক্রোধ চেপে বসেছে। ভুলের কারণে যদি তার ওপর আঘাত আসতো তাহলে এর এই অর্থ হতো যে, আল্লাহ এখনো তার প্রতি অনুগ্রহশীল আছেন, তাকে সতর্ক করছেন এবং সংশোধিত হবার সুযোগ দিচ্ছেন। কিন্তু ভুলের জন্য "পুরস্কার" এ অর্থ প্রকাশ করে যে, তাকে কঠিন শাস্তি দেবার ফায়সালা হয়ে গেছে এবং পেট ভরে পানি নিয়ে ডুবে যাওয়ার জন্য তার নৌকাটি ভাসছে। পক্ষান্তরে যেখানে একদিকে থাকে আল্লাহর প্রতি সত্যিকার আনুগত্য, চারিত্রিক পবিত্রতা, পরিচ্ছন্ন লেনদেন, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদাচার, দয়া, স্নেহ

ও মমতা এবং অন্যদিকে তার প্রতি বিপদ–আপদ ও কাঠিন্যের অবিরাম ধারা বর্ষিত হতে থাকে এবং আঘাতের পর আঘাতে সে হতে থাকে জর্জরিত সেখানে তা আল্লাহর ক্রোধের নয় বরং হয় তাঁর অনুগ্রহেরই আলামত। স্বর্ণকার স্বর্ণকে খুব বেশী উত্তপ্ত করতে থাকে যাতে তা খুব বেশী ঝকঝকে তকতকে হয়ে যায় এবং দুনিয়াবাসীর সামনে তার পূর্ণ নিখাদ হওয়া প্রমাণ হয়ে যায়। দুনিয়ার বাজারে তার দাম না বাড়লে কিছু আসে যায় না। স্বর্ণকার নিজেই তার দাম দেবে। বরং নিজের অনুগ্রহে বেশী দিয়ে দেবে। তার বিপদ–আপদে যদি ক্রোধের দিক থেকে থাকে তাহলে তা তার নিজের জন্য নয় বরং তার শত্রুদের জন্য অথবা যে সমাজে সৎকর্মশীলরা উৎপীড়িত হয় এবং আল্লাহর নাফরমানরা হয় অনুগৃহীত সে সমাজের জন্য।

৫০(ক). এখানে আমাদের ভাষায় সহজ ভাব প্রকাশের জন্য আমি ৬১ আয়াতের অনুবাদ আগে করেছি এবং ৫৭ থেকে ৬০ পর্যন্ত আয়াতের অনুবাদ করেছি পরে। কেউ যেন ৬১ আয়াতের অনুবাদ ছুটে গিয়েছে বলে মনে না করেন।

৫১. অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় আল্লাহর ব্যাপারে ভীতি শূন্য ও চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করে না। যা মনে আসে তাই করে না এবং ওপরে একজন আল্লাহ আছেন তিনি জুলুম ও বাড়াবাড়ি করলে পাকড়াও করেন একথা কখনো ভুলে যায় না। বরং তাদের মন সবসময় তাঁর ভয়ে ভীত থাকে এবং তিনিই তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে থাকেন।

৫২. আয়াত বলে দু ধরনের আয়াতই বুঝানো হয়েছে। সেসব আয়াতও যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ পেশ করেন আবার সেগুলোও যেগুলো মানুষের নিজের মনের মধ্যে এবং বিশ্ব চরাচরে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কিতাবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সত্যতার স্বীকৃতি দেয়ারই নামান্তর এবং বিশ্ব চরাচর ও মানব মনের আয়াতের অর্থাৎ নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনা মূলত সেগুলো যেসব সত্য প্রকাশ করছে তার প্রতি ঈমান আনাই প্রমাণ করে।

৫৩. যদিও আয়াতের প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য ফল এ দাঁড়ায় যে মানুষ তাওহীদ বিশ্বাসী ও আল্লাহর একক সত্তার প্রবক্তা হবে কিন্তু এ সত্ত্বেও শিরক না করার কথা আলাদাভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক সময় মানুষ আয়াত মেনে নিয়েও কোন না কোনভাবে শিরকে লিপ্ত হয়। যেমন রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। এটিও এক ধরনের শিরক। অথবা নবী ও অলীগণের শিক্ষার মধ্যে এমন ধরনের বাড়াবাড়ি করা যা শিরক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা। কিংবা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রবের বন্দেগী ও আনুগত্য এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রভুর আইন মেনে চলা। কাজেই আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনার পর আলাদাভাবে শিরক না করার কথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্বকে সম্পূর্ণরূপে একক আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নেয় এবং তার গায়ে অন্য কারোর বন্দেগীর সামান্যতম গন্ধও লাগায় না।

৫৪. আরবী ভাষায় "দেয়া" (ايتاء) শব্দটি শুধুমাত্র সম্পদ বা কোন বস্তু দেয়া অর্থেই ব্যবহার হয় না বরং বিমূর্ত জিনিস দেয়া অর্থেও বলা হয়। যেমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য

গ্রহণ করার জন্য বলা হয় اتيته من نفسى القبول আবার কোন ব্যক্তির আনুগত্য অস্বীকার করার জন্য বলা হয় اتيته من نفسى الابائة কাজেই এ দেয়ার মানে শুধুমাত্র এই নয় যে, তারা আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ দান করে বরং আল্লাহর দরবারে আনুগত্য ও বন্দেগী পেশ করাও এর অর্থের অন্তরভুক্ত।

এ অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতের পুরোপুরি মর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তারা যা কিছু সদাচার, সেবামূলক কাজ ও ত্যাগ করে সে জন্য একটুও অহংকার ও তাকওয়ার বড়াই করে না এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যাবার অহমিকায় লিপ্ত হয় না। বরং নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সবকিছু করার পরও এ মর্মে আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে থাকে যে, নাজানি এসব তাঁর কাছে গৃহীত হবে কিনা, নিজেদের গোনাহের মোকাবিলায় এগুলো ভারী প্রমাণিত হবে কিনা এবং রবের কাছে মাগফেরাতের জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে কিনা। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম ও জারির বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিই এ অর্থ প্রকাশ করে। এখানে হযরত আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! এর অর্থ কি এই যে, এক ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ও শরাব পান করার সময়ও আল্লাহকে ভয় করবে?" এ প্রশ্ন থেকে জানা যায়, হযরত আয়েশা একে يَأْتُوْنَ مَا اَتَوْا অর্থে গ্রহণ করছিলেন অর্থাৎ "যা কিছু করে করেই যায়। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَا يَابِنْتَ الصِّدِّيْقِ وَلٰكِنَّهُ الَّذِىْ يُصَلِّى وَيَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ -

"না, হে সিদ্দীকের মেয়ে! এর অর্থ হচ্ছে এমন লোক, যে নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয় এবং মহান আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।"

এ জবাব থেকে জানা যায় যে, আয়াতের সঠিক পাঠ ياتون নয় বরং يُؤْتُوْنَ এবং এ يُؤْتُوْنَ শুধু অর্থ-সম্পদ দান করার সীমিত অর্থে নয় বরং আনুগত্য করার ব্যাপক অর্থে।

একজন মু'মিন কোন্ ধরনের মানসিক অবস্থা সহকারে আল্লাহর বন্দেগী করে এ আয়াতটি তা বর্ণনা করে। হযরত উমরের (রা) অবস্থাই এর পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে। তিনি সারা জীবনের অতুলনীয় কার্যক্রমের পর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে থাকেন তখন আল্লাহর জবাবদিহির ভয়ে ভীত হতে থাকেন এবং বলে যেতে থাকেন, যদি আখেরাতে সমান সমান হয়ে মুক্তি পেয়ে যাই তাহলেও বাঁচোয়া। হযরত হাসান বাসরী (র) বড়ই চমৎকার বলেছেন ঃ মু'মিন আনুগত্য করে এরপরও ভয় করে এবং মুনাফিক গোনাহ করে তারপরও নির্ভীক ও বেপরোয়া থাকে।

৫৪(ক). উল্লেখ্য, ৬১ আয়াতের অনুবাদ ৫৭ আয়াতের আগে করা হয়েছে। এখান থেকে ৬২ আয়াতের অনুবাদ শুরু হচ্ছে।

৫৫. এ প্রেক্ষাপটে এ বাক্যটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। একে ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। আগের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে তারা প্রকৃত কল্যাণ আহরণকারী। কারা অগ্রবর্তী

হয়ে তা অর্জন করে এবং তাদের গুণাবলী কি কি। এ আলোচনার পর সংগে সংগেই একথা বলা হলো, আমি কখনো কাউকে তার সামর্থের বাইরে কষ্ট দেই না। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, এ চরিত্র, নৈতিকতা ও কার্যক্রম কোন অতিমানবিক জিনিস নয়। তোমাদেরই মতো রক্ত–মাংসের মানুষেরাই এ পথে চলে দেখিয়ে দিচ্ছে। কাজেই তোমরা একথা বলতে পারো না যে, তোমাদের কাছে এমন কোন জিনিসের দাবী জানানো হচ্ছে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তোমরা যে পথে চলছো তার ওপর চলার ক্ষমতা যেমন মানুষের আছে তেমনি তোমাদের নিজেদের জাতির কতিপয় মুমিন যে পথে চলছে তার ওপর চলার ক্ষমতাও মানুষের আছে। এখন এ দু'টি সম্ভাব্য পথের মধ্যে কে কোন্‌টি নির্বাচন করে, শুধুমাত্র তার ওপরই ফায়সালা নির্ভর করে। এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল করে যদি তোমরা আজ তোমাদের সমস্ত শ্রম ও প্রচেষ্টা অকল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করো এবং কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাও তাহলে আগামীতে নিজেদের এ বোকামির দণ্ড নিতেই হবে। সে দণ্ড থেকে এ খোঁড়া অজুহাত তোমাদের বাঁচাতে পারবে না যে, কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছা তোমাদের সামর্থের বাইরে ছিল। তখন এ অজুহাত পেশ করলে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, এ পথ যদি মানুষের সামর্থের বাইরে থেকে থাকে তাহলে তোমাদেরই মতো অনেক মানুষ তার ওপর চলতে সক্ষম হলো কেমন করে?

৫৬. কিতাব বলে এখানে আমলনামাকে বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির এ আমলনামা পৃথক পৃথকভাবে তৈরী হচ্ছে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি নড়াচড়া এমনকি চিন্তা–ভাবনা ও ইচ্ছা–সংকল্পের প্রত্যেকটি অবস্থা পর্যন্ত তাতে সন্নিবেশিত হচ্ছে। এ সম্পর্কেই সূরা কাহ্‌ফে বলা হয়েছে ঃ

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا –

"আর আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তারপর তোমরা দেখবে অপরাধীরা তার মধ্যে যা আছে তাকে ভয় করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য। এ কেমন কিতাব, আমাদের ছোট বা বড় এমন কোন কাজ নেই যা এখানে সন্নিবেশিত হয়নি। তারা যে যা কিছু করেছিল সবই নিজেদের সামনে হাজির দেখতে পাবে। আর তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করেন না।" (৪৯ আয়াত)

কেউ কেউ এখানে কিতাব অর্থে কুরআন গ্রহণ করে আয়াতের অর্থ উল্‌টে দিয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ কারোর বিরুদ্ধে এমন কোন দোষারোপ করা হবে না যে জন্য সে মূলত দায়ী নয়। কারোর এমন কোন সৎকাজ গ্রাস করে ফেলা হবে না যার প্রতিদানের সে প্রকৃতপক্ষে হকদার। কাউকে অনর্থক শাস্তি দেয়া হবে না। কাউকে সত্য অনুযায়ী যথার্থ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রাখাও যাবে না।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ
لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ
يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ
آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾

কিন্তু তারা এ ব্যাপারে অচেতন।[৫৮] আর তাদের কার্যাবলীও এ পদ্ধতির (যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে) বিপরীত। তারা নিজেদের এসব কাজ করে যেতে থাকবে, অবশেষে যখন আমি তাদের বিলাসপ্রিয়দেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করবো[৫৯] তখন তারা আবার চিৎকার করতে থাকবে[৬০]—এখন বন্ধ করো[৬১] তোমাদের আর্তচিৎকার আমার পক্ষ থেকে এখন কোন সাহায্য দেয়া হবে না। আমার আয়াত তোমাদের শোনানো হতো, তোমরা তো (রসূলের আওয়াজ শুনতেই) পিছন ফিরে কেটে পড়তে,[৬২]

৫৮. অর্থাৎ যা কিছু তারা করছে, বলছে ও চিন্তা–ভাবনা করছে—এসব কিছু অন্য কোথাও সন্নিবেশিত হচ্ছে এবং কখনো এর হিসেব হবে না, এ ব্যাপারে তারা বেখবর।

৫৯. "مُتْرَفِيْنَ" শব্দের অনুবাদ এখানে করা হয়েছে "বিলাসপ্রিয়"। "মুত্‌রফীন" আসলে এমনসব লোককে বলা হয় যারা পার্থিব ধন–সম্পদ লাভ করে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার থেকে গাফিল হয়ে গেছে। "বিলাসপ্রিয়" শব্দটির মাধ্যমে এ শব্দটির সঠিক মর্মকথা প্রকাশ হয়ে যায়, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে একে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির খায়েশ পূর্ণ করার অর্থে গ্রহণ করা যাবে না বরং বিলাস প্রিয়তার ব্যাপকতার অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

আযাব বলতে এখানে সম্ভবত আখেরাতের আযাব নয় বরং দুনিয়ার আযাবের কথা বলা হয়েছে। জালেমরা দুনিয়ায়ই এ আযাবের মুখোমুখি হয়।

৬০. মূলে جُؤَار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অত্যধিক কষ্টের মধ্যে গরুর মুখ দিয়ে যে আওয়াজ বের হয় তাকে 'জুআর' বলে। এ শব্দটি এখানে নেহাত ফরিয়াদ ও কাতর আর্তনাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং এমন ব্যক্তির আর্তনাদ ও ফরিয়াদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে কোন প্রকার করুণার যোগ্য নয়। এর মধ্যে ব্যাংগ ও তাচ্ছিল্যভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এর মধ্যে এ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে যে, "বেশ, এখন নিজের কৃতকর্মের মজা টের পাওয়ার সময় এসেছে, তাই তো জোরে জোরে চিৎকার করছো।"

৬১. অর্থাৎ তখন তাদেরকে একথা বলা হবে।

৬২. অর্থাৎ তাঁর কথা শুনতেই তো প্রস্তুত ছিলে না। তাঁর আওয়াজ কানে পড়ুক এতটুকুও সহ্য করতে না।

مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٠﴾

অহংকারের সাথে তা অগ্রাহ্য করতে, নিজেদের আড্ডায় বসে তার সম্পর্কে গল্প দিতে[৬৩] ও আজেবাজে কথা বলতে।

তারা কি কখনো এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা করেনি?[৬৪] অথবা সে এমন কথা নিয়ে এসেছে যা কখনো তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?[৬৫] কিংবা তারা নিজেদের রসূলকে কখনো চিনতো না বলেই (অপরিচিত ব্যক্তি হবার কারণে) তাকে অস্বীকার করে?[৬৬] অথবা তারা কি একথা বলে যে, সে উন্মাদ?[৬৭] না, বরং সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং সত্যই তাদের অধিকাংশের কাছে অপছন্দনীয়।

৬৩. মূলে سٰمِرًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। سمر মানে রাতের বেলা কথাবার্তা বলা, গল্প করা, কথকতা করা ও গল্প-কাহিনী শুনানো। গ্রামীন ও মফস্বল শহরে জীবনে সাধারণত এ রাত্রিকালের গপ্‌সপ্‌ হয় বৈঠক খানায় ও দহলিজে বসে। মক্কাবাসীদের রীতিও এটাই ছিল।

৬৪. অর্থাৎ তাদের এ মনোভাবের কারণ কি? তারা কি এ বাণী বোঝেইনি, তাই একে মানছে না? মোটেই না, কারণ এটা নয়। কুরআন কোন হেঁয়ালি নয়। কোন দুর্বোধ্য ভাষায় কিতাবটি লেখা হয়নি। কিতাবটিতে এমন সব বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটানো হয়নি যা মানুষের বোধগম্য নয়। তারা এর প্রত্যেকটি কথা ভালোভাবে বোঝে। এরপরও বিরোধিতা করছে। কারণ তারা একে মানতে চায় না। এমন নয় যে, তারা একে বুঝার চেষ্টা করছে কিন্তু বুঝতে পারছে না তাই মানতে চায় না।

৬৫. অর্থাৎ তিনি কি এমন একটি অভিনব কথা পেশ করছেন যা তাদের কান কোনদিন শুনেনি এবং এটিই তাদের অস্বীকারের কারণ? মোটেই না, কারণ এটাও নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের আসা, কিতাবসহকারে আসা, তাওহীদের দাওয়াত দেয়া, আখেরাতের জবাবদিহির ভয় দেখানো এবং নৈতিকতার পরিচিত সৎবৃত্তিগুলো পেশ করা, এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও এমন নয় যা ইতিহাসে আজ প্রথমবার দেখা দিয়েছে এবং ইতিপূর্বে আর কখনো এসব কথা শুনা যায়নি। তাদের আশপাশের দেশগুলোয় ইরাকে, সিরিয়ায় ও মিসরে নবীর পর নবী এসেছেন। তাঁরা এসব কথাই বলেছেন। এগুলো তারা জানে না এমন নয়। তাদের নিজেদের দেশেই ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এসেছেন। হূদ, সালেহ ও শোআইব আলাইহিমুস সালামও এসেছেন। তাঁদের নাম

আজো তাদের মুখে মুখে। তারা নিজেরাই তাঁদেরকে আল্লাহর প্রেরিত বলে মানে। তারা একথাও জানে যে, তাঁরা মুশরিক ছিলেন না বরং এক আল্লাহর বন্দেগীর শিক্ষা দিতেন। তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্বীকারের কারণ এই নয় যে, তারা এমন একটি পুরোপুরি আনকোরা নতুন কথা শুনছে যা ইতিপূর্বে কখনো শোনেনি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন আল ফুর্‌কান, ৮৪; আস্ সাজ্‌দাহ, ৫ ও সাবা ৩৫ টীকা)।

৬৬. অর্থাৎ একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে তারা কোনদিনই জানতো না, হঠাৎ তাদের মধ্যে এসে পড়েছেন এবং বলছেন আমাকে মেনে নাও, এটাই কি তাদের অস্বীকারের কারণ? না, একথা মোটেই নয়। যিনি এ দাওয়াত পেশ করছেন তিনি তাদের নিজেদের গোত্রের ও ভ্রাতৃসমাজের লোক। তাঁর বংশগত মর্যাদা তাদের অজানা নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তদের চোখের আড়ালে নেই। তিনি তাদের সামনেই শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। তাঁর সততা, সত্যতা, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পর্কে তারা খুব ভালোভাবেই জানে। তারা নিজেরাই তাঁকে আমীন বলতো। তাদের সমগ্র ভ্রাতৃসমাজ তাঁর বিশ্বস্ততার ওপর ভরসা করতো। তার নিকৃষ্টতম শত্রুও একথা স্বীকার করে যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। সমগ্র যৌবনকালেই তিনি ছিলেন পূতপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী। সবাই জানে তিনি একজন অত্যন্ত সৎ, ভদ্র ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, সত্যসেবী ও শান্তিপ্রিয় লোক। তিনি ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে থাকেন। পরিচ্ছন্ন লেনদেন করেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তাঁর জুড়ি নেই। নিজে জুলুম করেন না এবং জালেমদের সাথে সহযোগিতাও করেন না। কোন হকদারের হক আদায় করতে তিনি কখনো কুন্ঠিত হননি। প্রত্যেক বিদপগ্রস্ত, অভাবী ও অসহায়ের জন্য তাঁর দরজা হচ্ছে একজন দয়ার্দ্রচিত্ত, স্নেহ পরায়ণ সহানুভূতিশীলের দরজা। তারপর তারা এও জানতো যে, নবুওয়াতের দাবীর একদিন আগে পর্যন্তও কেউ তাঁর মুখ থেকে এমন কোন কথা শোনেনি যা থেকে এ সন্দেহ করা যেতে পারে যে, তিনি কোন দাবী করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর যেদিন তিনি দাবী করেন তার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একই কথা বলে আসছেন। তিনি কোন মোড় পরিবর্তন করেননি বা ডিগবাজী খাননি। নিজের দাওয়াত ও দাবীর মধ্যে কোন রদবদল করেননি। তাঁর দাবীর মধ্যে এমন কোন পর্যায়ক্রমিক ক্রমবিকাশ দেখা যায়নি যার ফলে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, ধীরে ধীরে পা শক্ত করে দাবীর ময়দানে এগিয়ে চলার কাজ চলছে। আবার তাঁর জীবন যাপন প্রণালী সাক্ষ দিচ্ছে যে, অন্যদেরকে তিনি যা কিছু বলেন, তা সবার আগে নিজে পালন করে দেখিয়ে দেন। তাঁর কথায় ও কাজে বৈপরীত্য নেই। তাঁর কাছে হাতির দাঁত নেই, যা দেখাবার জন্য এক রকম এবং খাবার জন্য আবার অন্য রকম। তিনি নেবার জন্য এক পাল্লা এবং দেবার জন্য ভিন্ন পাল্লা ব্যবহার করেন না। এ ধরনের সুপরিচিত ও সুপরীক্ষিত ব্যক্তি সম্পর্কে তারা একথা বলতে পারে না যে, "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। বড় বড় প্রতারক আসে এবং হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় কথা বলে প্রথম প্রথম আসর জমিয়ে ফেলে, পরে জানা যায় সবই ছিল ধোঁকা। এ ব্যক্তিও কি জানি আসলে কি এবং বানোয়াট পোশাক আশাক নামিয়ে ফেলার পর ভেতর থেকে কে বের হয়ে আসে কি জানি। তাই একে মেনে নিতে আমাদের মনে সংশয় জাগছে।" (এ প্রসংগে আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, ২১; ইউনুস, ২১ ও বনী ইসরাঈল, ১০৫ টীকা)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ
خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ
إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ
الصِّرَاطِ لَنٰكِبُونَ ﴿٧٤﴾

—আর সত্য যদি কখনো তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যের সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ওলট পালট হয়ে যেতো[৬৮]—না, বরং আমি তাদের নিজেদের কথাই তাদের কাছে এনেছি এবং তারা নিজেদের কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।[৬৯]

তুমি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছো? তোমার জন্য তোমার রব যা দিয়েছেন, সেটাই ভালো এবং তিনি সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা।[৭০] তুমি তো তাদেরকে সহজ সরল পথের দিকে ডাকছো, কিন্তু যারা পরকাল স্বীকার করে না তারা সঠিক পথ থেকে সরে ভিন্ন পথে চলতে চায়।[৭১]

৬৭. অর্থাৎ তাদের অস্বীকার করার কারণ কি এই যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল মনে করে? মোটেই না, এটাও আসলে কোন কারণই নয়।

কারণ মুখে তারা যাই বলুক না কেন মনে মনে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি দিয়ে চলছে। তাছাড়া একজন পাগল ও সুস্থ–সচেতন ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য এমন কোন অস্পষ্ট বিষয় নয় যে, উভয়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। একজন হঠকারী ও নির্লজ্জ ব্যক্তি ছাড়া কে এ বাণী শোনার পর একথা বলতে পারে যে, এটা একজন পাগলের প্রলাপ এবং এ ব্যক্তির জীবনধারা দেখার পর এ অভিমত ব্যক্ত করতে পারে যে, এটা একজন বুদ্ধিভ্রষ্ট উন্মাদের জীবন? বড়ই অদ্ভুত সেই পাগলামি (অথবা পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের প্রলাপ অনুযায়ী মৃগীরোগীর সংজ্ঞাহীনতা) যার মধ্যে মানুষের মুখ দিয়ে কুরআনের মতো অলৌকিক সৌন্দর্যময় বাণী বের হয়ে আসে এবং যার মাধ্যমে মানুষ একটি আন্দোলনের এমন সফল পথনির্দেশনা দেয় যার ফলে কেবলমাত্র নিজের দেশেরই নয়, সারা দুনিয়ার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৬৮. এ ছোট্ট বাক্যটির মধ্যে একটি অনেক বড় কথা বলা হয়েছে। এটি ভালোভাবে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। দুনিয়ায় সাধারণত অজ্ঞ মূর্খ লোকদের নিয়ম এই হয়ে

থাকে যে, তাদের সামনে যে ব্যক্তি সত্য কথাটি বলে দেয় তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। প্রকারান্তরে তারা যেন বলতে চায়, যা সত্য ও বাস্তব সম্মত তা না বলে তাদের মনের মতো কথা বলা হোক। অথচ কেউ পছন্দ করুক বা না করুক সত্য সব অবস্থায়ই সত্য থাকে। সারা দুনিয়ার লোকেরা এক জোট হলেও সত্য ও বাস্তবতাকে এক এক ব্যক্তির ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী ঢেলে বের করে আনা এবং প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বিপরীতমুখী বাসনার সাথে একাত্ম হওয়া তো দূরের কথা কোন বাস্তব ঘটনাকে অবাস্তব এবং সত্যকে অসত্যে পরিণত করাও সম্ভবপর নয়। নির্বুদ্ধিতায় আক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তি কখনো একথা চিন্তা করার প্রয়োজনই বোধ করে না যে, সত্য ও তাদের বাসনার মধ্যে যদি বিরোধ থাকে তাহলে এ দোষটা সত্যের নয় বরং তাদের নিজেদের। তার বিরোধিতা করে তারা তার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না বরং নিজেদেরই ক্ষতি করবে। বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল ব্যবস্থা যেসব অবিচল সত্য ও আইনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তার ছত্রছায়ায় বাস করে মানুষের জন্য নিজের চিন্তা, বাসনা ও কর্মপদ্ধতিকে সত্য অনুযায়ী তৈরী করে নেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য জানার চেষ্টা করতে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কেবলমাত্র একজন নির্বোধই এখানে যা কিছু সে বোঝে বা যা কিছু হয়ে যাক বলে তার মন চায় অথবা নিজের বিদ্বিষ্ট মনোভাবের কারণে যা কিছু হয়েছে বা হওয়া উচিত বলে সে ধারণা করে নিয়েছে তার ওপর দ্বিধাহীন হয়ে যাওয়া এবং তার বিরুদ্ধে কারোর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ন্যায়সংগত যুক্তি-প্রমাণও শুনতে প্রস্তুত না হওয়ার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

৬৯. এখানে 'কথা' শব্দটির তিনটি অর্থ হওয়া সম্ভব এবং তিনটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

(ক) 'কথা' প্রকৃতির বর্ণনা অর্থে। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে, আমি অন্য কোন জগতের কথা বলছি না। বরং তাদের নিজেদেরই সত্য ও প্রকৃতি এবং তার দাবী-দাওয়া তাদের সামনে পেশ করছি, যাতে তারা নিজেদের এ ভুলে যাওয়া পাঠ মনে করতে পারে। কিন্তু তারা এটা গ্রহণ করতে পিছপাও হচ্ছে। তাদের এ পলায়ন কোন অসংশ্লিষ্ট জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই কথা থেকে।

(খ) 'কথা' উপদেশ অর্থে। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যা কিছু পেশ করা হচ্ছে তা তাদেরই ভালোর জন্য একটি উপদেশ এবং তাদের এ পলায়ন অন্য কোন জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই কল্যাণের কথা থেকে।

(গ) 'কথা' সম্মান ও মর্যাদা অর্থে। এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, আমরা এমন জিনিস তাদের কাছে এনেছি যা তারা গ্রহণ করলে তারাই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে। এ থেকে তাদের এ মুখ ফিরিয়ে নেয়া অন্য কোন জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই উন্নতি এবং নিজেদেরই উত্থানের একটি সুবর্ণ সুযোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নামান্তর।

৭০. এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের পক্ষে আর একটি প্রমাণ। অর্থাৎ নিজের এ কাজে আপনি পুরোপুরি নিস্বার্থ। কোন ব্যক্তি সততার সাথে এ দোষারোপ করতে পারে না যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য আপনার সামনে রয়েছে তাই আপনি এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে আপনার ভালোই উন্নতি হচ্ছিল।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾ حَتّٰىٓ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾

যদি আমি তাদের প্রতি করুণা করি এবং বর্তমানে তারা যে দুঃখ–কষ্টে ভুগছে তা দূর করে দেই, তাহলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার স্রোতে একেবারেই ভেসে যাবে।[৭২] তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি তাদেরকে দুঃখ–কষ্টে ফেলে দিয়েছি, তারপরও তারা নিজেদের রবের সামনে নত হয়নি এবং বিনয় ও দীনতাও অবলম্বন করে না। তবে যখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, আমি তাদের জন্য কঠিন আযাবের দরজা খুলে দেবো তখন অকস্মাত তোমরা দেখবে যে, এ অবস্থায় তারা সকল প্রকার কল্যাণ থেকে হতাশ হয়ে পড়েছে।[৭৩]

এখন দারিদ্র ও অর্থসংকটের সম্মুখীন হলেন। জাতির মধ্যে আপনাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। লোকেরা মাথায় করে রাখতো। এখন গালাগালি ও মার খাচ্ছেন বরং প্রাণ নাশের পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। নিজের পরিবার–পরিজন নিয়ে নিশ্চিন্তে সুখে জীবন যাপন করছিলেন। এখন এমন একটি কঠিন দ্বন্দ্ব–সংঘাতের মধ্যে পড়ে গেছেন যার ফলে এক মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস ফেলতে পারছেন না। এর ওপর আরো সমস্যা হলো এমন বিষয় নিয়ে সামনে এসেছেন যার ফলে সারা দেশের লোক শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি নিজের জ্ঞাতি ভাইরা আপনাকে হত্যা করার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছে। কে বলতে পারে, এটা একজন স্বার্থবাদী লোকের কাজ? স্বার্থবাদী লোক তো নিজের জাতি ও গোত্রপ্রীতির ঝাণ্ডা উঁচিয়ে নিজের যোগ্যতা ও যোগসাজশের মাধ্যমে নেতৃত্ব লাভ করার প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি কখনো এমন কোন বিষয় নিয়ে আবির্ভূত হতেন না যা কেবলমাত্র সমগ্র জাতীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থপ্রীতির বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জই নয় বরং আরবের মুশরিকদের মধ্যে তার গোত্রের সরদারী যে জিনিসের বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে তার শিকড়ও কেটে দেয়। এটি এমন একটি যুক্তি যা কুরআনে শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই নয় বরং সাধারণভাবে সকল নবীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে বারবার পেশ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল আন'আম, ৯০; ইউনুস, ৭২; হূদ, ২৯ ও ৫১; ইউসুফ, ১০৪; আল ফুরকান, ৫৭; আশ্ শু'আরা, ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৫ ও ১৮০; সাবা ৪৭; ইয়াসীন, ২১; সাদ, ৮৬; আশ্শূরা, ২৩ ও আন্ নাজম্, ৪০ আয়াত এবং এই সংগে টীকাগুলোও দেখুন।

৭১. অর্থাৎ আখেরাত অস্বীকার করার ফলে তারা দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং দায়িত্বের অনুভূতি না থাকায় তারা একেবারেই বেপরোয়া হয়ে গেছে। তাদের এ জীবনের একটা সমাপ্তি ও ফলাফল যে আছে এবং কারোর সামনে এ সমগ্র জীবনকালের

কার্যাবলীর হিসেব যে দিতে হবে, এটাই যখন তারা বুঝে না, তখন সত্য কি ও মিথ্যা কি তা নিয়ে তাদের কিইবা চিন্তা হতে পারে? জন্তু–জানোয়ারের মতো দেহ ও প্রবৃত্তির প্রয়োজন খুব ভালোভাবে পূর্ণ হতে থাকুক এটিই হয় তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পর সত্য ও মিথ্যার আলোচনা তাদের কাছে নেহাতই অর্থহীন। আর এ উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি দেখা দিলে বড় জোর তারা এ ত্রুটির কারণ কি এবং কিভাবে একে দূর করা যায় এতটুকুই চিন্তা করবে। এ ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা কোন দিন সঠিক পথ চাইতে পারে না এবং পেতেও পারে না।

৭২. দুর্ভিক্ষের কারণে আরববাসী যে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে অবস্থান করছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত করতে গিয়ে কেউ কেউ দু'টি দুর্ভিক্ষকে এক সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন। এর ফলে এটি হিজরতের আগের না পরের ঘটনা তা বুঝা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। আসল ঘটনা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মক্কাবাসীরা দুবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। একবার নবুওয়াতের সূচনার কিছুদিন পর। দ্বিতীয়বার হিজরাতের কয়েক বছর পর যখন সামামাহ ইবনে উসাল ইয়ামামাহ থেকে মক্কার দিকে খাদ্য শস্য রফতানী করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখানে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষটির নয় প্রথমটির কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যখন কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত অস্বীকার করতেই থাকলো এবং কঠোরভাবে বাধা দিতে শুরু করলো তখন তিনি দোয়া করলেন ঃ

اللهم اعنى عليهم بسبع كسبع يوسف

"হে আল্লাহ! এদের মোকাবিলায় ইউসুফের সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মতো সাত বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।"

ফলে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেলো যে, মৃতের গোশ্‌ত খাওয়ার ঘটনাও ঘটলো। মক্কী সূরাগুলোতে বহু জায়গায় এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা আল আন'আম, ৪২ থেকে ৪৪; আল আ'রাফ, ৯৪ থেকে ৯৯; ইউনুস, ১১, ১২, ২১; আন নহল, ১১২, ১১৩ ও আদ্ দুখান, ১০ থেকে ১৬ আয়াত এবং এ সংগে সংশ্লিষ্ট টীকাগুলোও।

৭৩. মূলে مُبْلِسُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হতাশা শব্দটি এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। اِبْلَاس ও بَلَس শব্দের কয়েকটি অর্থ হয়। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়া, ভয়ে ও আতংকে নিথর হয়ে যাওয়া, দুঃখে ও শোকে মনমরা হয়ে যাওয়া, সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে সাহস হারিয়ে ফেলা এবং এরি একটি দিক হতাশা ও ব্যর্থতার ফলে মরিয়া (Desperate) হয়ে ওঠা। এ কারণেই শয়তানের নাম ইবলিস রাখা হয়েছে। এ নামের মধ্যে যে অর্থ প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা হলো, হতাশা ও নিরাশার (Frustration) ফলে তার আহত অহমিকা এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, এখন সে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মরণ খেলায় নামতে এবং সব ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠানে উদ্যত হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾

৫ রুকূ'

তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছেন এবং চিন্তা করার জন্য অন্তঃকরণ দিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কমই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকো।[৭৪] *তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা একত্র হবে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন, দিন রাতের আবর্তন তাঁরই শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।*[৭৫] *একথা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না?*[৭৬] *কিন্তু তারা সে একই কথা বলে যা তাদের পূর্বের লোকেরা বলেছিল। তারা বলে, "যখন আমরা মরে মাটি হয়ে যাবো এবং অস্থি পঞ্জরে পরিণত হবো তখন কি আমাদের পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে? আমরা এ প্রতিশ্রুতি অনেক শুনেছি এবং আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ–দাদারাও শুনে এসেছে। এগুলো নিছক পুরাতন কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।"*[৭৭]

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ঃ যদি তোমরা জানো তাহলে বলো এ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা বাস করে তারা কারা?

৭৪. এর অর্থ হচ্ছে, হতভাগারা। এ চোখ, কান, মন ও মস্তিষ্ক তোমাদের কি এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, পশুরা এদেরকে যেসব কাজে লাগায় তোমরাও এদেরকে সেসব কাজে লাগাবে। তোমরা কেবল পশুদের মতো দেহ ও প্রবৃত্তির দাবী পূরণ করার উপায় তালাশ করতে এবং সবসময় নিজের জীবনমান উন্নত করার কৌশল চিন্তা করতে থাকবে, এগুলোর উপযোগিতা কি শুধু এতটুকুই? তোমাদের মানুষ হিসেবে তৈরী করা

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۸۷﴾

তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহর। বলো, তাহলে তোমরা সচেতন হচ্ছো না কেন?[৭৮] তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ।[৭৯] বলো, তাহলে তোমরা ভয় করো না কেন?[৮০]

হয়েছিল কিন্তু তোমরা নিছক পশু হয়ে রইলে, এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা কি আর কিছু হতে পারে? যেসব চোখ দিয়ে সবকিছু দেখা যায় কিন্তু শুধুমাত্র সত্যের দিকে পথ নির্দেশক চিহ্নগুলো দেখা যায় না, যেসব কান দিয়ে সবকিছু শোনা যায় কিন্তু একটি শিক্ষণীয় কথাই শুধু শোনা যায় না, যে মন-মস্তিষ্ক দিয়ে সবকিছু চিন্তা করা যায় কিন্তু শুধু এটুকু চিন্তা করা যায় না যে, আমি এ অস্তিত্ব কেমন করে লাভ করলাম, কেন লাভ করলাম এবং আমার জীবনের লক্ষ কি, সেসব চোখ, কান ও মন-মগজ যদি একটি গরুর পরিবর্তে একটি মানুষের দেহ কাঠামোতে অবস্থান করে তাহলে অবশ্যই আফসোস করতে হয়।

৭৫. জ্ঞানের উপকরণগুলো (ইন্দ্রিয়সমূহ ও চিন্তাশক্তি) ও তাদের সঠিক প্রয়োগের ব্যাপারে মানুষের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পর এখন কতকগুলো নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এসব নিদর্শন খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হলে প্রত্যক্ষ করার পর সঠিকভাবে যুক্তি প্রদান করা হলে অথবা কান খোলা রেখে কোন ন্যায়সংগত যুক্তির কথা শোনা হলে মানুষ সত্যে পৌঁছে যেতে পারে। সে সাথে একথাও জানতে পারে যে, এ অস্তিত্ব জগতটি খোদা বিহীন অথবা বহু খোদার নির্মিত নয়। বরং এটি তাওহীদের তথা একক আল্লাহর সৃষ্টির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আর একথাও জানতে পারে যে, এটি উদ্দেশ্যহীন নয়, নিছক খেলা-তামাসা ও একটি অর্থহীন তেলেসমাতিও নয় বরং এ একটি বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় মানুষের মতো স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন জীবের পক্ষে নিজের যাবতীয় কর্মের জবাবদিহি না করে মরে যাওয়ার পর এমনি এমনিই মাটিতে মিশে গিয়ে শেষ হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

৭৬. মনে রাখতে হবে, এখানে তাওহীদ ও মৃত্যু পরের জীবন সম্পর্কে এক সাথে যুক্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং সামনের দিকে যেসব নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেগুলো থেকে শিরক ও আখেরাত অস্বীকৃতি বাতিল হওয়া সম্পর্কে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে।

৭৭. মনে রাখতে হবে, তাদের আখেরাতকে অসম্ভব মনে করা কেবলমাত্র আখেরাতেরই অস্বীকৃতি ছিল না, আল্লাহর শক্তি ও জ্ঞানেরও অস্বীকৃতি ছিল।

৭৮. অর্থাৎ তাহলে একথা বোঝ না কেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ বন্দেগী লাভের অধিকারী নয় এবং তাঁর পক্ষে পৃথিবীর এই জনবসতিকে পুনর্বার সৃষ্টি করাও কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٨٨ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ۝٨٩ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝٩٠ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝٩١ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٩٢

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জেনে থাকো, কার কর্তৃত্ব[৮১] চলছে প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর? আর কে তিনি যিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না? তারা নিশ্চয়ই বলবে, এ বিষয়টি তো আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। বলো, তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো কোথায় থেকে?[৮২] যা সত্য তা আমি তাদের সামনে এনেছি এবং এরা যে মিথ্যেবাদী এতে কোন সন্দেহ নেই।[৮৩] আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তানে পরিণত করেননি[৮৪] এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো। এবং তারপর তারা একজন অন্যজনের ওপর চড়াও হতো।[৮৫] এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক-পবিত্র। প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু তিনি জানেন।[৮৬] এরা যে শিরক নির্ধারণ করে তিনি তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

৭৯. মূলে لِلّٰهِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ "এসব জিনিসও আল্লাহর" তবে অনুবাদে নিছক আমাদের ভাষায় সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বাকরীতি অবলম্বন করা হয়েছে।

৮০. অর্থাৎ তাহলে কেন তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং তাঁর ছাড়া অন্যের বন্দেগী করতে ভয় করো না? কেন তোমরা এ ভয় করো না, আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ যদি কখনো আমাদের কাছ থেকে হিসেব নেন তাহলে আমরা তাঁর কাছে কি জবাব দেবো?

৮১. মূলে مَلَكُوْت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে مُلْك (বাদশাহী) ও مِلْك (মালিকানা) উভয়েরই অর্থ। আর এর সংগে রয়েছে চরম আতিশয্যের অর্থও। এ বিস্তারিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে আয়াতে পেশকৃত প্রশ্নের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ঃ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব কার এবং প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর পুরোপুরি মালিকানা ক্ষমতা আছে কার হাতে?"

৮২. মূলে আছে দু'টি শব্দ اَنَّى تُسْحَرُوْنَ-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "কোথায় থেকে তোমরা যাদুকৃক হচ্ছো ?" যাদু ও তেলেসমাতের স্বরূপ এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, একটি জিনিসকে তার আসল অর্থ, তাৎপর্য ও সঠিক চেহারার বিপরীতে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং দর্শকের মনে এরূপ ভুল ধারণা সৃষ্টি করে যে, যাদুকর কৃত্রিমভাবে যা পেশ করছে তা-ই হচ্ছে ঐ জিনিসের আসল স্বরূপ। কাজেই আয়াতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, কে তোমাদের ওপর এমন যাদু করে দিয়েছে যার ফলে এসব কথা জানা সত্ত্বেও প্রকৃত সত্য তোমরা বুঝতে পারছো না ? কার যাদু তোমাদেরকে এমন উদভ্রান্ত করে দিয়েছে, যার ফলে যে মালিক নয় তাকে তোমরা মালিক বা তার শরীক হিসেবে দেখছো এবং যারা কোনো কর্তৃত্বের অধিকারী নয় তাদেরকে তোমরা আসল কর্তৃত্বের অধিকারীর মতো বরং তাঁর চাইতেও বেশী বন্দেগীর হকদার মনে করছো ? কে তোমাদের চোখে আবরণ দিয়েছে, যার ফলে যে আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমরা একথা স্বীকার করো যে, তাঁর মোকাবিলায় কোনো আশ্রয়দাতা নেই তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো এবং যারা তাঁর হাত থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে না তাদের আশ্রয়ের ওপর ভরসা করছো ? কে তোমাদেরকে এ প্রতারণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে যে, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক তিনি তোমাদেরকে তাঁর জিনিসগুলো কিভাবে ব্যবহার করেছো সেকথা কখনো জিজ্ঞেস করবেন না এবং যিনি সারা বিশ্ব-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি কখনো তোমাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না যে, তাঁর রাজত্বের মধ্যে তোমরা নিজেদের রাজত্ব চালাবার অথবা অন্যদের রাজত্ব মেনে নেবার অধিকার কোথায় থেকে লাভ করলে ? কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যাদুর অভিযোগ এনেছিল এ বিষয়টি যদি সামনে থাকে তাহলে প্রশ্নের ধরন আরো বেশী অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে প্রশ্নের এ শব্দাবলীর মধ্যে এ বিষয়বস্তুটিও ফুটে উঠেছে যে, নির্বোধের দল! যিনি তোমাদেরকে আসল সত্যটি (তোমাদের স্বীকৃতি অনুযায়ী যার আসল সত্য হওয়া উচিত) বলেন, তিনি তো তোমাদের চোখে যাদুকর আর যারা রাতদিন তোমাদেরকে সত্য বিরোধী কথা বলে বেড়ায় এমনকি যারা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বিরোধী, তোমাদের নিজেদের স্বীকৃত সত্য বিরোধী প্রকাশ্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাসী করে দিয়েছে তারাই যে আসল যাদুকর তাদের সম্পর্কে তোমাদের মনে কখনো এ সন্দেহ জাগে না।

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সার্বভৌম ক্ষমতার (আল্লাহর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার অথবা সেগুলোর কোন অংশ) অধিকারী নিজেদের একথায় তারা মিথ্যেবাদী। আর মৃত্যুর পর পুর্নবার জীবন সম্ভব নয়, একথায়ও মিথ্যেবাদী। তাদের মিথ্যা তাদের নিজেদের স্বীকৃতিগুলো থেকে প্রমাণিত। একদিকে আল্লাহকে পৃথিবী ও আকাশের মালিক ও সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী বলে মেনে নেয়া এবং অন্যদিকে একথা বলা যে, তিনিই একমাত্র সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী নন বরং অন্যদেরও (যারা অনিবার্যভাবে তাঁর অধীনই হবে) তাতে কোন অংশ আছে, এ দু'টি কথা সুস্পষ্টভাবে পরস্পর বিরোধী। অনুরূপভাবে একদিকে আমাদেরকে ও এ বিশাল বিশ্ব-জাহানকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন বলে স্বীকার করা এবং অন্যদিকে আল্লাহ তাঁর নিজেরই তৈরী করা সৃষ্টিকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে পারেন না বলে দাবী করা একেবারেই বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী কথা। কাজেই তাদের মেনে নেয়া সত্য থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, শিরক করা ও আখেরাত অস্বীকার করা দু'টোই তাদের অবলম্বিত মিথ্যা বিশ্বাস।

৮৪. এখানে কেউ যেন এ ভুল ধারণা না করে বসেন যে, নিছক খৃষ্টবাদের প্রতিবাদে একথা বলা হয়েছে। না, আরবের মুশরিকরাও নিজেদের উপাস্যদেরকে আল্লাহর সন্তান গণ্য করতো। এ ভ্রষ্টতার ব্যাপারে দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিক ছিল তাদের সহযোগী। যেহেতু খৃষ্টানদের "খোদার পুত্র" আকীদাটির প্রচার বেশী হয়ে গেছে তাই কোন কোন শ্রেষ্ঠ মুফাস্সিরও এ ভুল ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, এ আয়াতটি তারই প্রতিবাদে নাযিল হয়েছে। অথচ শুরু থেকেই মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই থেকেছে সমগ্র ভাষণটির মূল লক্ষ। এ প্রেক্ষাপটে হঠাৎ বক্তব্য খৃষ্টানদের দিকে মোড় নেয়ার কোন অর্থই হয় না। তবে আনুসংগিকভাবে এর মধ্য দিয়ে খৃষ্টান–মুশরিক নির্বিশেষে যারাই আল্লাহর সাথে নিজেদের উপাস্য ও নেতাদের বংশধারা মিলিয়ে দেয় তাদের সবার আকীদা–বিশ্বাসের খণ্ডন হয়ে যায়।

৮৫. অর্থাৎ বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন শক্তির ও বিভিন্ন অংশের স্রষ্টা ও প্রভু হতো আলাদা আলাদা ইলাহ এবং এরপরও তাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বজায় থাকতো যেমন তোমরা এ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার অসংখ্য শক্তি ও বস্তু এবং অগণিত গ্রহ–নক্ষত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছো, এটা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। বিশ্ব–জাহানের নিয়ম শৃংখলা ও তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক একাত্মতা স্পষ্টতই প্রমাণ করছে যে, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একজন একক আল্লাহর হাতে কেন্দ্রীভূত। যদি কর্তৃত্ব বিভক্ত হতো তাহলে কর্তৃত্বশীলদের মধ্যে অনিবার্যভাবে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো। আর এ মতবিরোধ তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ পর্যন্ত না পৌঁছে ছাড়তো না। এ বক্তব্যই সূরা আম্বিয়ায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

"যদি পৃথিবী ও আকাশে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ থাকতো তাহলে এ উভয়ের ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো।" (২২ আয়াত)

সূরা বনী ইসরাঈলেও এ একই যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে ঃ

لَوْ كَانَ مَعَهٗ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لاَّبْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلاً

"যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও থাকতো, যেমন লোকেরা বলে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আরশের মালিকের স্থানে পৌঁছুবার চেষ্টা করতো।"

(ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন বনী ইসরাঈল, ৪৭ এবং আল আম্বিয়া, ২২ টীকা)।

৮৬. কোন কোন সমাজে একটা বিশেষ ধরনের শিরক দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রাথমিক রূপ হলো শাফায়াত বা সুপারিশ করে পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষমতা সংক্রান্ত মুশরিকী আকীদা। তারপর আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য কোন কোন সত্তার অদৃশ্য ও ভূত–ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে বলে ধারণা করা।

এখানে এ বিশেষ ধরনের শিরকের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে, আয়াতটি এ শিরকের উভয় দিককে খণ্ডন করে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, ত্বা–হা, ৮৫ ও ৮৬ এবং আল আম্বিয়া, ২৭ টীকা)।

قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

৬ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ (সা)! দোয়া করো, "হে আমার রব! এদেরকে যে আযাবের হুমকি দেয়া হচ্ছে, তুমি যদি আমার উপস্থিতিতে সে আযাব আনো তাহলে হে পরওয়ারদিগার! আমাকে এ জালেমদের অন্তরভুক্ত করো না।[৮৭] আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমার চোখের সামনে আমার সে জিনিস আনার পূর্ণ শক্তি আছে যার হুমকি আমি তাদেরকে দিচ্ছি।

হে মুহাম্মাদ (সা)! মন্দকে দূর করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তারা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বলে তা আমি খুব ভালো করেই জানি। আর দোয়া করো, হে আমার রব! আমি শয়তানদের উস্কানি থেকে তোমার আশ্রয় চাই। এমনকি হে ! পরওয়ারদিগার, সে আমার কাছে আসুক এ থেকেও তো আমি তোমার আশ্রয় চাই।[৮৮]

৮৭. এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ! নবী সাল্লাল্লাহু আইলাহি ওয়া সাল্লামের ওপরও সে আযাব আসার কোন আশংকা ছিল অথবা তিনি দোয়া না চাইলে তাঁর ওপর এ আযাব এসে যেতো। বরং এ ধরনের বর্ণনাভংগী অবলম্বন করা হয়েছে কেবল এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য যে, আল্লাহর আযাব অবশ্যি ভয় করার মতো জিনিস। এ আযাব দাবী করে চেয়ে নেবার মতো জিনিস নয় এবং যদি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ ও ধৈর্যশীলতার কারণে তা নিয়ে আসতে বিলম্ব করে থাকেন তাহলে নিশ্চিন্তে নাফরমানি ও শয়তানির কাজ করে যেতে থাকাও উচিত নয়। আসলে তা এমন ভয়াবহ জিনিস যে, কেবল গোনাহগারদেরই নয়, নেক্‌কারদেরও নিজেদের সমস্ত নেকী ও সৎকাজ সত্ত্বেও তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত। এছাড়াও এর মধ্যে আর একটি দিকও রয়েছে। অর্থাৎ সামষ্টিক গোনাহর ফলে যখন আযাবের গাড়ি চলতে থাকে তখন তার তলায় কেবল খারাপ লোকরাই পিষ্ট হয় না বরং তাদের সাথে সাথে অনেক সময় ভালো লোকও পিষ্ট হয়ে যায়। কাজেই একটি ভ্রষ্ট ও অসৎ সমাজে বাসকারী প্রত্যেক সৎব্যক্তিকে সবসময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে থাকা উচিত। কেউ জানে না কবে কোন্‌ পরিস্থিতিতে জালেমদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নাযিল হতে থাকবে এবং কে তার চাকার তলায় পিষ্ট হবে।

حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾

(এরা নিজেদের কৃতকর্ম থেকে বিরত হবে না) এমনকি যখন এদের কারোর মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন বলতে থাকবে, "হে আমার রব ! যে দুনিয়াটা আমি ছেড়ে চলে এসেছি সেখানেই আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও,[৮৯] আশা করি এখন আমি সৎকাজ করবো।[৯০] কখনোই নয়,[৯১] এটা তার প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।[৯২] এখন এ মৃতদের পেছনে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে একটি অন্তরবর্তীকালীন যুগ—বরযখ যা পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত থাকবে।[৯৩]

৮৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, ৭১ ও ৭২; আল আ'রাফ, ১৩৮ ও ১৫০ থেকে ১৫৩; ইউনুস, ৩৯; আল হিজর, ৪৮; আন নাহল, ১২২ থেকে ১২৪; বনী ইসরাঈল, ৫৮ থেকে ৬৩ এবং হা–মীম আস্ সাজ্‌দাহ, ৩৬ থেকে ৪১ টীকা।

৮৯. মূলে رَبِّ ارْجِعُوْنِ শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহকে সম্বোধন করে বহুবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে আবেদন করার একটি কারণ এ হতে পারে যে, এটি সম্মানার্থে করা হয়েছে যেমন বিভিন্ন ভাষায় এ পদ্ধতির প্রচলন আছে। দ্বিতীয় কারণ কেউ কেউ এও বর্ণনা করেছেন যে, আবেদনের শব্দ বারবার উচ্চারণ করার ধারণা দেবার জন্য এভাবে বলা হয়েছে। যেমন তা اِرْجِعْنِىْ اِرْجِعْنِىْ اِرْجِعْنِىْ (আমাকে ফেরত পাঠাও, আমাকে ফেরত পাঠাও, আমাকে ফেরত পাঠাও) এর অর্থ প্রকাশ করে। এ ছাড়া কোন কোন মুফাস্‌সির এ ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, رَبِّ সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহকে এবং اِرْجِعُوْنِ শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে এমন সব ফেরেশতাদেরকে যারা সংশ্লিষ্ট অপরাধী আত্মাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ কথাটি এভাবে বলা হয়, "হায়! আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠাও।"

৯০. কুরআন মজীদের বহু জায়গায় এ বক্তব্যটি উচ্চারিত হয়েছে। অপরাধীরা মৃত্যুর সীমানায় প্রবেশ করার সময় থেকে নিয়ে আখেরাতে প্রবেশ করে জাহান্নামে দাখিল হওয়া পর্যন্ত বরং তার পরও বারবার এ আবেদনই করতে থাকবে ঃ আমাদের আর একবার মাত্র দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হোক। এখন আমরা তাওবা করছি, আর কখনো নাফরমানি করবো না, এবার আমরা সোজা পথে চলবো। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সূরা আল আন'আম, ২৭ ও ২৮; আল আ'রাফ, ৫৩; ইবরাহীম, ৪৪ ও ৪৫; আল মু'মিনূন, ১০৫ থেকে ১১৫; আশ শু'আরা, ১০২; আস সাজ্‌দাহ, ১২ থেকে ১৪; ফাতের, ৩৭; আয্ যুমার, ৫৮ ও ৫৯; আল মু'মিন, ১০ থেকে ১২ ও আশ্ শূরা, ৪৪ আয়াত এবং এ সংগে টীকাগুলোও)।

৯১. অর্থাৎ ফেরত পাঠানো হবে না। নতুন করে কাজ শুরু করার জন্য তাকে আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, মানুষকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

তারপর যখনই শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেসও করবে না।[৯৪] সে সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে[৯৫] তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই হবে এমনসব লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।[৯৬] তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। আগুন তাদের মুখের চামড়া জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদের চোয়াল বাইরে বের হয়ে আসবে।[৯৭] —"তোমরা কি সেসব লোক নও যাদের কাছে আমার আয়াত শুনানো হলেই বলতে এটা মিথ্যা?"

করার জন্য পুনরায় যদি এ দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হয় তাহলে অনিবার্যভাবে দু'টি অবস্থার মধ্য থেকে একটি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। মৃত্যুর পর সে যা কিছু করেছে সেসব তার স্মৃতি ও চেতনায় সংরক্ষিত করে রাখতে হবে। অথবা এসব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে প্রথমবার যেমন স্মৃতির কোঠা শূন্য করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় আবার তাকে সৃষ্টি করা হবে। উল্লেখিত প্রথম অবস্থায় পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ এ দুনিয়ায় মানুষ সত্যকে প্রত্যক্ষ না করে নিজেই বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে সত্যকে জেনে তাকে মেনে নেয় কিনা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও এ দু'টি পথের মধ্য থেকে কোন্‌টি অবলম্বন করে—এরি ভিত্তিতেই হচ্ছে তার পরীক্ষা। এখন যদি তাকে সত্য দেখিয়েও দেয়া হয় এবং গোনাহের পরিণাম বাস্তবে দেখিয়ে দিয়ে গোনাহকে নির্বাচন করার পথই তার জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে এরপর তাকে পরীক্ষাগৃহে পাঠানোই অর্থহীন হয়ে যায়। এরপর কে ঈমান আনবে না এবং কে আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে? আর দ্বিতীয় অবস্থাটি সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি পরীক্ষিতকে আবার পরীক্ষা করার মতো অবস্থা। যে ব্যক্তি একবার এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তাকে আবার সে একই ধরনের আর একটি পরীক্ষায় পাঠানো নিরর্থক। কারণ সে আবার সেই আগের মতোই করবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, ২২৮; আল আন'আম, ৬, ১৩৯ ও ১৪০ এবং ইউনুস, ২৬ টীকা)।

৯২. এ অনুবাদও হতে পারে, "এ তো এখন সে বলবেই।" এর অর্থ হচ্ছে, তার এ কথা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। সর্বনাশ হবার পর এখন সে একথা বলবে না তো আর কি বলবে। এ নিছক কথার কথা। ফিরে আসবে যখন তখন আবার সেসব কিছু করবে যা আগে করে এসেছে। কাজেই তাকে প্রলাপ বকতে দাও ফেরার দরজা তার জন্য খোলা যেতে পারে না।

৯৩. "বরযখ" (بَرْزَخٌ) শব্দটি ফার্সী "পরদা" (پرده) শব্দটির আরবীকরণ। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এখন তাদের ও দুনিয়ার মধ্যে রয়েছে একটি প্রতিবন্ধক। এটি তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরে যেতে দেবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝখানের এ যবনিকার আড়ালে অবস্থান করবে।

৯৪. এর মানে এ নয় যে, বাপ আর বাপ থাকবে না এবং ছেলে ছেলে থাকবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে সময় বাপ ছেলের কোন কাজে লাগবে না এবং ছেলে বাপের কোন কাজে লাগবে না। প্রত্যেকে এমনভাবে নিজের অবস্থার শিকার হবে যে, একজন অন্যজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা তো দূরের কথা কারোর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার মতো চেতনাও থাকবে না। অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا "কোন অন্তরংগ বন্ধু নিজের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে না।" (আল মা'আরিজ, ১০ আয়াত)

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ ○ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُؤْوِيْهِ ○ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ –

"সেদিন অপরাধীর মন তার নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও নিজের সহায়তাকারী নিকটতম আত্মীয় এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে এবং নিজেকে আযাব থেকে মুক্ত করতে চাইবে।" (আল মা'আরিজ, ১১ থেকে ১৪ আয়াত)।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ ○ وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ○ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ ○

"সেদিন মানুষ নিজের ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অবস্থার মধ্যে এমনভাবে লিপ্ত থাকবে যে, তার কারোর কথা মনে থাকবে না।" (আবাসা, ৩৪ থেকে ৩৭)

৯৫. অর্থাৎ যাদের নেক কাজের পাল্লা অসৎকাজের পাল্লা থেকে বেশী ভারী হবে।

৯৬. সূরার শুরুতে এবং তারপর চতুর্থ রুকূ'তে সাফল্য ও ক্ষতির যে মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে তাকে আর একবার মনের মধ্যে চাংগা করে নিন।

৯৭. মূলে كَالِحُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। كَالِح আরবী ভাষায় এমন চেহারাকে বলা হয় যার চামড়া আলাদা হয়ে গেছে এবং দাঁত বাইরে বের হয়ে এসেছে। যেমন খাশির

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾

তারা বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর ছেয়ে গিয়েছিল, আমরা সত্যিই ছিলাম বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে পরওয়ারদিগার! এখন আমাদের এখান থেকে বের করে দাও, আমরা যদি আবার এ ধরনের অপরাধ করি তাহলে আমরা জালেম হবো।" আল্লাহ জবাব দেবেন, "দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, পড়ে থাকো ওরি মধ্যে এবং কথা বলো না আমার সাথে।[৯৮] তোমরা হচ্ছো তারাই, যখন আমার কিছু বান্দা বলতো, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি করুণা করো, তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল, তখন তোমরা তাদেরকে বিদ্রূপ করতে, এমনকি তাদের প্রতি জিদ তোমাদের আমার কথাও ভুলিয়ে দেয় এবং তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে থাকতে। আজ তাদের সে সবরের ফল আমি এই দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম।[৯৯] তারপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "বলো, পৃথিবীতে তোমরা কত বছর থাকলে?" তারা বলবে, "এক দিন বা দিনেরও কিছু অংশে আমরা সেখানে অবস্থান করেছিলাম,[১০০] গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিন।"

ভুনা মাথা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) এক ব্যক্তি "কালেহ"–এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : الم تر الى الراس المشيط ؟ অর্থাৎ "তুমি কি ভুনা খাশির কল্লা দেখোনি?"

৯৮. অর্থাৎ নিজের মুক্তির জন্য আবেদন নিবেদন করো না। নিজের ওজর পেশ করো না। চিরকালের জন্য একেবারেই নীরব হয়ে যাও, এ অর্থ নয়। হাদীসের বর্ণনায় বলা হয়েছে,

قٰلَ اِنۡ لَّبِثۡتُمۡ اِلَّا قَلِیۡلًا لَّوۡ اَنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۱۴﴾ اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰكُمۡ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمۡ اِلَیۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَی اللّٰهُ الۡمَلِكُ الۡحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡكَرِیۡمِ ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنۡ یَّدۡعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرۡهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنۡدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الۡكٰفِرُوۡنَ ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلۡ رَّبِّ اغۡفِرۡ وَ ارۡحَمۡ وَ اَنۡتَ خَیۡرُ الرّٰحِمِیۡنَ ﴿۱۱۸﴾

বলবেন, "অল্পক্ষণই অবস্থান করেছিলে, হায়! যদি তোমরা একথা সে সময় জানতে।[১০১] তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি[১০২] এবং তোমাদের কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?"

কাজেই প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ হচ্ছেন উচ্চতর ও উন্নততর,[১০৩] তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, সম্মানিত আরশের তিনিই মালিক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই,[১০৪] তার হিসেব রয়েছে তার রবের কাছে।[১০৫] এ ধরনের কাফের কখনো সফলকাম হতে পারে না।[১০৬]

হে মুহাম্মাদ (সা)! বলো, "হে আমার রব! ক্ষমা করো ও করুণা করো এবং তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল।"[১০৭]

এ হবে তাদের শেষ কথাবার্তা। এরপর তাদের কন্ঠ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু একথা বাহ্যত কুরআন বিরোধী। কারণ সামনের দিকে কুরআন নিজেই তাদের ও আল্লাহর মধ্যকার কথাবার্তা উদ্ধৃত করছে। কাজেই হয় হাদীসের এ বর্ণনা সঠিক নয় অথবা এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এরপর তারা মুক্তির জন্য কোন আবেদন নিবেদন করতে পারবে না।

৯৯. আবার একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ কে হবে সাফল্যের অধিকারী এবং কে ক্ষতির অধিকারী।

১০০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা, ৮০ টীকা।

১০১. অর্থাৎ দুনিয়ায় আমার নবী ক্রমাগতভাবে তোমাদের বলেছেন যে, দুনিয়ার জীবন নিছক হাতে গোনা কয়েকটি পরীক্ষার ঘন্টা মাত্র। একেই আসল জীবন এবং একমাত্র জীবন মনে করে বসো না। আসল জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন। সেখানে তোমাদের চিরকাল থাকতে হবে। এখানকার সাময়িক লাভ ও স্বাদ-আহলাদের লোভে এমন কাজ

করো না যা আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তোমাদের ভবিষ্যত ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু তখন তোমরা তাঁর কথায় কান দাওনি। তোমরা এ আখেরাতের জগত অস্বীকার করতে থেকেছো। তোমরা মৃত্যুপরের জীবনকে একটি মনগড়া কাহিনী মনে করেছো। তোমরা নিজেদের এ ধারণার ওপর জোর দিতে থেকেছো যে, জীবন–মৃত্যুর ব্যাপারটি নিছক এ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং এখানে চুটিয়ে মজা লুটে নিতে হবে। কাজেই এখন আর অনুশোচনা করে কী লাভ। তখনই ছিল সাবধান হবার সময় যখন তোমরা দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে এখানকার চিরন্তন জীবনের লাভ বিসর্জন দিচ্ছিলে।

১০২. মূলে عَبَثًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, "খেলাচ্ছলে" এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, "খেলার জন্য"। প্রথম অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, "তোমরা কি মনে করেছিলে, তোমাদেরকে এমনিই খেলাচ্ছলে আমোদ–আহলাদ করতে করতে তৈরী করা হয়েছে, তোমাদের সৃষ্টির কোন লক্ষ ও উদ্দেশ্য নেই, নিছক একটি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি হিসেবে তৈরী করে তোমাদের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন?" দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে, "তোমরা কি একথা মনে করতে যে, তোমাদেরকে নিছক খেলাধূলা, আমোদ– আহলাদ, ফূর্তি ও এমন সব আজেবাজে অর্থহীন কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যেগুলোর কোনদিন কোন ফল হবে না?"

১০৩. অর্থাৎ তিনি কোন বাজে কাজ করার উর্ধে অবস্থান করেন এবং তাঁর কোন বান্দা ও গোলাম তাঁর প্রভুত্বের কার্যক্রমে তাঁর সাথে শরীক হবে এরও অনেক উর্ধে তাঁর অবস্থান।

১০৪. এর দ্বিতীয় অনুবাদ এই হতে পারে : "যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে ডাকে তার জন্য তার নিজের এ কাজের সপক্ষে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই।

১০৫. অর্থাৎ সে জবাবদিহি ও হিসেব–নিকেশ থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

১০৬. আবার সে একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে অর্থাৎ আসলে কে সাফল্য লাভকারী এবং কে তা থেকে বঞ্চিত?

১০৭. এখানে এ দোয়ার সূক্ষ্ম ও গভীর অর্থ দৃষ্টিসমক্ষে থাকা উচিত। এখনই কয়েক ছত্র ওপরে বলা হয়েছে, আখেরাতে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের দুশমনদেরকে একথা বলে মাফ করে দিতে অস্বীকার করবেন যে, আমার যেসব বান্দা এ দোয়া করতো তোমরা তাদেরকে বিদ্রূপ করতে। এরপর এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (ও আনুসংগিকভাবে সাহাবায়ে কেরামকেও) এ হুকুম দেয়া হচ্ছে যে, ঠিক সে একই দোয়া করো যার কথা আমি এইমাত্র বলে এসেছি। আমার পরিষ্কার সতর্কবাণী সত্ত্বেও এখন যদি তারা তোমাকে বিদ্রূপ করতে থাকে তাহলে আখেরাতে যেন তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী মোকদ্দমা তৈরী করে দেবে।

আন্ নূর

২৪

নামকরণ

পঞ্চম রুকূ'র প্রথম আয়াত اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটি যে বনীল মুসৃতালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশার' (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে এটি নাযিল হয়। (দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে)। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী বনীল মুসৃতালিক যুদ্ধের সফরের মধ্যে এ ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এ যুদ্ধটি ৫ হিজরী সনে আহযাব যুদ্ধের আগে, না ৬ হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়। আসল ঘটনাটি কি? এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছে যে, পরদার বিধান কুরআন মজীদের দু'টি সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূরা হচ্ছে এটি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূরা আহযাব। আর আহযার যুদ্ধের সময় সূরা আহযাব নাযিল হয় এ ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। এখন যদি আহযাব যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, পরদার বিধানের সূচনা হয় সূরা আহযাবে নাযিলকৃত নির্দেশসমূহের মাধ্যমে এবং তাকে পূর্ণতা দান করে এ সূরায় বর্ণিত নির্দেশগুলো। আর যদি বনীল মুসৃতালিক যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে বিধানের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সূচনা সূরা নূর থেকে এবং তার পূর্ণতা সূরা আহযাবে বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে বলে মেনে নিতে হয়। এভাবে হিজাব বা পরদার বিধানে ইসলামী আইন ব্যবস্থার যে যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে নাযিলের সময়কালটি অনুসন্ধান করে বের করে নেয়া জরুরী মনে করি।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন বনীল মুসৃতালিক যুদ্ধ হিজরী ৫ সনের শাবান মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর ঐ বছরেরই যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয় আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধ। এর সমর্থনে সবচেয়ে বড় সাক্ষ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোন কোনটিতে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) ও হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের (রা) বিবাদের কথা পাওয়া যায়। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের ইন্তিকাল হয় বনী কুরাইযা যুদ্ধে। আহযাব যুদ্ধের পরপরই এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই ৬ হিজরীতে তাঁর উপস্থিত থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই।

অন্যদিকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আহযাব যুদ্ধ ৫ হিজরীর শওয়াল মাসের ঘটনা এবং বনীল মুস্তালিকের যুদ্ধ হয় ৬ হিজরীর শাবান মাসে। এ প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) ও অন্যান্য লোকদের থেকে যে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো এর সমর্থন করে। সেগুলো থেকে জানা যায়, মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে হিজাব বা পরদার বিধান নাযিল হয় আর এ বিধান পাওয়া যায় সূরা আহযাবে। এ থেকে জানা যায়, সে সময় হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং এ বিয়ে ৫ হিজরীর যিল্‌কদ মাসের ঘটনা। সূরা আহযাবে এ ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া এ হাদীসগুলো থেকে একথাও জানা যায় যে, হযরত যয়নবের (রা) বোন হাম্‌না বিনতে জাহ্‌শ হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানোয় শুধুমাত্র এ জন্য অংশ নিয়েছিলেন যে, হযরত আয়েশা তাঁর বোনের সতিন ছিলেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বোনের সতিনের বিরুদ্ধে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হবার জন্য সতিনী সম্পর্ক শুরু হবার পর কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব সাক্ষ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে শক্তিশালী করে দেয়।

মিথ্যাচারের ঘটনার সময় হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের (রা) উপস্থিতির বর্ণনা থাকাটাই এ বর্ণনাটি মেনে নেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের কথা বলা হয়েছে আবার কোনটিতে বলা হয়েছে তাঁর পরিবর্তে হযরত উসাইদ ইবনে হুদ্বাইরের (রা) কথা, এ জিনিসটিই এ সংকট দূর করে দেয়। আর এ দ্বিতীয় বর্ণনাটি এ প্রসংগে হযরত আয়েশা বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলীর সাথে পুরোপুরি খাপখেয়ে যায়। অন্যথায় নিছক সা'দ ইবনে মু'আযের জীবনকালের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য যদি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ ও মিথ্যাচারের কাহিনীকে আহ্‌যাব ও কুরাইযা যুদ্ধের আগের ঘটনা বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে তো হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়া ও যয়নবের (রা) বিয়ের ঘটনা তার পূর্বে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। এ অবস্থায় এ জটিলতার গ্রন্থী উন্মোচন করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। অথচ কুরআন ও অসংখ্য সহীহ হাদীস উভয়ই সাক্ষ দিচ্ছে যে, যয়নবের (রা) বিয়ে ও হিজাবের হুকুম আহ্‌যাব ও কুরাইযার পরবর্তী ঘটনা। এ কারণেই ইবনে হাযম ও ইবনে কাইয়েম এবং অন্য কতিপয় গবেষক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকেই সঠিক গণ্য করেছেন এবং আমরাও একে সঠিক মনে করি।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হবার পর যে, সূরা নূর ৬ হিজরীর শেষার্ধে সূরা আহ্‌যাবের কয়েক মাস পর নাযিল হয়, যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তার ওপর আমাদের একটু নজর বুলিয়ে নেয়া উচিত। বদর যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আরবে ইসলামী আন্দোলনের যে উত্থান শুরু হয় খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তা এত বেশী ব্যাপকতা লাভ করে যার ফলে মুশরিক, ইহুদী, মুনাফিক ও দোমনা সংশয়ী নির্বিশেষে সবাই একথা অনুভব করতে থাকে যে, এ নব উত্থিত শক্তিটিকে শুধুমাত্র অস্ত্র ও সমর শক্তির মাধ্যমে পরাস্ত করা যেতে পারে না। খন্দকের যুদ্ধে তারা এক জোট হয়ে দশ হাজার সেনা নিয়ে মদীনা আক্রমণ করেছিল। কিন্তু মদীনা উপকন্ঠে এক মাস ধরে মাথা

কুটবার পর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে দেন :

لَنْ تَغْزُوْكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ

"এ বছরের পর কুরাইশরা আর তোমাদের ওপর হামলা করবে না বরং তোমরা তাদের ওপর হামলা করবে।" (ইবনে হিশাম ২৬৬ পৃষ্ঠা)।

রসূল (সা)–এর এ উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে একথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির অগ্রগতির ক্ষমতা নিশেষ হয়ে গেছে, এবার থেকে ইসলাম আর আত্মরক্ষার নয় বরং অগ্রগতির লড়াই লড়বে এবং কুফরকে অগ্রগতির পরিবর্তে আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে হবে। এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক ও বাস্তব বিশ্লেষণ। প্রতিপক্ষও ভালোভাবে এটা অনুভব করছিল।

মুসলমানদের সংখ্যা ইসলামের এ উত্তরোত্তর উন্নতির আসল কারণ ছিল না। বদর থেকে খন্দক পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধে কাফেররা তাদের চাইতে বেশী শক্তির সমাবেশ ঘটায়। অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক দিয়েও সে সময় মুসলমানরা আরবে বড় জোর ছিল দশ ভাগের এক ভাগ। মুসলমানদের উন্নত মানের অস্ত্রসম্ভারও এ উন্নতির মূল কারণ ছিল না। সব ধরনের অস্ত্র–শস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জামে কাফেরদের পাল্লা ভারী ছিল। অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তাদের সাথে মুসলমানদের কোন তুলনাই ছিল না। কাফেরদের কাছে ছিল সমস্ত আরবের আর্থিক উপায় উপকরণ। অন্যদিকে মুসলমানরা অনাহারে মরছিল। কাফেরদের পেছনে ছিল সমগ্র আরবের মুশরিক সমাজ ও আহলি কিতাব গোত্রগুলো। অন্যদিকে মুসলমানরা একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পুরাতন ব্যবস্থার সকল সমর্থকের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এহেন অবস্থায় যে জিনিসটি মুসলমানদের ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটি ছিল আসলে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলামের সকল শত্রুদলই এটা অনুভব করছিল। একদিকে তারা দেখছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র। এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছে। অন্যদিকে তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিত্রতা মুসলমানদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য, শৃংখলা ও সংহতি সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং এর সামনে মুশরিকদের শিথিল সামাজিক ব্যবস্থাপনা যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায়ই পরাজয় বরণ করে চলছে।

নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকদের বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তাদের চোখে যখন অন্যের গুণাবলী ও নিজেদের দুর্বলতাগুলো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে এবং তারা এটাও যখন বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের সৎগুণাবলী তাকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের নিজেদের দোষ–ত্রুটিগুলো তাদেরকে নিম্নগামী করছে তখন তাদের মনে নিজেদের ত্রুটিগুলো দূর করে প্রতিপক্ষের গুণাবলীর আয়ত্ব করে নেবার চিন্তা জাগে না, বরং তারা চিন্তা করতে থাকে যেভাবেই হোক নিজেদের অনুরূপ দুর্বলতা তার মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালাতে হবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের যত গুণই থাক, সেই সাথে তাদের কিছু না কিছু দোষ–ত্রুটিও আছে। এ হীন

মানসিকতাই ইসলামের শত্রুদের কর্মতৎপরতার গতি সামরিক কার্যক্রমের দিক থেকে সরিয়ে নিকৃষ্ট ধরনের নাশকতা ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টির দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। আর যেহেতু এ কাজটি বাইরের শত্রুদের তুলনায় মুসলমানদের ভেতরের মুনাফিকরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারতো তাই পরিকল্পিতভাবে বা পরিকল্পনা ছাড়াই স্থিরিকৃত হয় যে, মদীনার মুনাফিকরা ভেতর থেকে গোলমাল পাকাবে এবং ইহুদী ও মুশরিকরা বাইর থেকে তার ফলে যত বেশী পারে লাভবান হবার চেষ্টা করবে।

৫ হিজরী যিলকদ মাসে ঘটে এ নতুন কৌশলটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব থেকে পালক পুত্র* সংক্রান্ত জাহেলী রীতি নির্মূল করার জন্য নিজেই নিজের পালক পুত্রের [যায়েদ (রা) ইবনে হারেসা] তালাক দেয়া স্ত্রীকে [যয়নব (রা) বিনতে জাহ্‌শ] বিয়ে করেন। এ সময় মদীনার মুনাফিকরা অপপ্রচারের এক বিরাট তাণ্ডব সৃষ্টি করে। বাইর থেকে ইহুদী ও মুশরিকরাও তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মিথ্যা অপবাদ রটাতে শুরু করে। তারা অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প তৈরী করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তার পালক পুত্রের স্ত্রীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যান (নাউযুবিল্লাহ)। কিভাবে পুত্র তাঁর প্রেমের খবর পেয়ে যায় এবং তার পর নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার ওপর থেকে নিজের অধিকার প্রত্যাহার করে; তারপর কিভাবে তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন। এ গল্পগুলো এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, মুসলমানরাও এগুলোর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। এ কারণে মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরদের একটি দল হযরত যয়নব ও যায়েদের সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে আজো ঐসব মনগড়া গল্পের অংশ পাওয়া যায়। পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা খুব ভালো করে লবণ মরিচ মাখিয়ে নিজেদের বইতে এসব পরিবেশন করেছেন। অথচ হযরত যয়নব (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন ফুফুর (উমাইমাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব) মেয়ে। তাঁর সমগ্র শৈশব থেকে যৌবনকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁকে ঘটনাক্রমে একদিন দেখে নেয়া এবং নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রেমে পড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। আবার এ ঘটনার মাত্র এক বছর আগে নবী (সা) নিজেই চাপ দিয়ে তাঁকে হযরত যায়েদকে (রা) বিয়ে করতে বাধ্য করেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ এ বিয়েতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত যয়নব (রা) নিজেও এতে রাজী ছিলেন না। কারণ কুরাইশদের এক শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারের মেয়ে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের পত্নী হওয়াকে স্বভাবতই মেনে নিতে পারতো না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সূচনা নিজের পরিবার থেকে শুরু করার জন্যই হযরত যয়নবকে (রা) এ বিয়েতে রাজী হতে বাধ্য করেন। এসব কথা বন্ধু ও শত্রু সবাই জানতো। আর এ কথাও সবাই জানতো, হযরত যয়নবের বংশীয় আভিজাত্যবোধই তাঁর ও যায়েদ ইবনে হারেসার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হতে দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তালাক হয়ে যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদকারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জঘন্য ধরনের নৈতিক দোষারোপ করে এবং এত ব্যাপক আকারে সেগুলো ছড়ায় যে, আজো পর্যন্ত তাদের এ মিথ্যা প্রচারণার প্রভাব দেখা যায়।

* অন্যের পুত্রকে নিজের পুত্র বানিয়ে নেয়া এবং পরিবারের মধ্যে তাকে পুরোপুরি ঔরশজাত সন্তানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

এরপর দ্বিতীয় হামলা করা হয় বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময়। প্রথম হামলার চাইতে এটি ছিল বেশী মারাত্মক। বনীল মুস্তালিক গোত্রটি বনী খুযা'আর একটি শাখা ছিল। তারা বাস করতো লোহিত সাগর উপকূলে জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে কুদাইদ এলাকায়। যে ঝরণাধারাটির আশপাশে এ উপজাতীয় লোকেরা বাস করতো তার নাম ছিল মুরাইসী। এ কারণে হাদীসে এ যুদ্ধটিকে মুরাইসী'র যুদ্ধও বলা হয়েছে। চিত্রের মাধ্যমে তাদের সঠিক অবস্থানস্থল জানা যেতে পারে।

৬ হিজরীর শাবান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পান, তারা মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং অন্যান্য উপাজাতিকেও একত্র করার চেষ্টা করছে। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ষড়যন্ত্রটিকে অংকুরেই গুঁড়িয়ে দেবার জন্য একটি সেনাদল নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হয়ে যান। এ অভিযানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও বিপুল সংখ্যক মুনাফিকদের নিয়ে তাঁর সহযোগী হয়। ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, এর আগে কোন যুদ্ধেই মুনাফিকরা এত বিপুল সংখ্যায় অংশ নেয়নি। মুরাইসী নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সা) হঠাৎ শত্রুদের মুখোমুখি হন। সামান্য সংঘর্ষের পর যাবতীয় সম্পদ–সরঞ্জাম সহকারে সমগ্র গোত্রটিকে গ্রেফতার করে নেন। এ অভিযান শেষ হবার পর তখনো মুরাইসীতেই ইসলামী সেনা দল অবস্থান করছিল এমন সময় একদিন হযরত উমরের (রা) একজন কর্মচারী (জাহ্জাহ ইবনে মাসউদ গিফারী) এবং খায্রাজ গোত্রের একজন সহযোগীর (সিনান ইবনে ওয়াবর জুহানী) মধ্যে পানি নিয়ে বিরোধ বাধে। একজন আনসারদেরকে ডাকে এবং অন্যজন মুহাজিরদেরকে ডাক দেয়। উভয় পক্ষ থেকে লোকেরা একত্র হয়ে যায় এবং ব্যাপারটি মিটমাট করে দেয়া হয়। কিন্তু আনসারদের খায্রাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তিলকে তাল করে দেয়। সে আনসারদেরকে একথা বলে উত্তেজিত করতে থাকে যে, "এ মুহাজিররা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এবং এ কুরাইশী কাঙালদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, কুকুরকে লালন পালন করে বড় করো যাতে সে তোমাকেই কামড়ায়। এসব কিছু তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে ডেকে এনে নিজেদের এলাকায় জায়গা দিয়েছো এবং নিজেদের ধন–সম্পত্তিতে তাদেরকে অংশীদার বানিয়েছো। আজ যদি তোমরা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে দেখবে তারা পগার পার হয়ে গেছে।" তারপর সে কসম খেয়ে বলে, "মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা সম্পন্ন তারা দীন–হীন–লাঞ্ছিতদেরকে বাইরে বের করে দেবে।"* তার এসব কথাবার্তার খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছুলে হযরত উমর (রা) তাঁকে পরামর্শ দেন, এ ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : فَكَيْفَ يَاعُمَرُ اِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ (হে উমর! দুনিয়ার লোকেরা কি বলবে? তারা বলবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজেরই সংগী–সাথীদেরকে হত্যা করছে।) তারপর তিনি তখনই সে স্থান থেকে রওয়ানা হবার হুকুম দেন এবং দ্বিতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত কোথাও থামেননি, যাতে লোকেরা খুব বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কারোর এক জায়গায় বসে গলগুজব করার এবং অন্যদের তা শোনার অবকাশ না থাকে। পথে উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর

* সূরা মুনাফিকুনে আল্লাহ নিজেই তার এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন।

বনিল মুস্তালিক যুদ্ধক্ষেত্রের নক্শা

(রা) বলেন, "হে আল্লাহর নবী! আজ আপনি নিজের স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে অসময়ে রওয়ানা হবার হুকুম দিয়েছেন?" তিনি জবাব দেন, "তুমি শোননি তোমাদের সাথী কিসব কথা বলেছে?" তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কোন্ সাথী?" জবাব দেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।" তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তির কথা বাদ দিন। আপনি যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমরা তাকে নিজেদের বাদশাহ বানাবার ফায়সালা করেই ফেলেছিলাম এবং তার জন্য মুকুট তৈরী হচ্ছিল। আপনার আগমনের ফলে তার বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। তারই ঝাল সে ঝাড়ছে।"

এ হীন কারসাজির রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি। এরি মধ্যে একই সফরে সে আর একটি ভয়াবহ অঘটন ঘটিয়ে বসে। এ এমন পর্যায়ের ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণ যদি পূর্ণ সংযম ধৈর্যশীলতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিতেন তাহলে মদীনার এ নবগঠিত মুসলিম সমাজটিতে ঘটে যেতো মারাত্মক ধরনের গৃহযুদ্ধ। এটি ছিল হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ফিত্‌না। এ ঘটনার বিবরণ হযরত আয়েশার মুখেই শুনুন। তাহলে যথার্থ অবস্থা জানা যাবে। মাঝখানে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে সেগুলো আমি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে ব্রাকেটের মধ্যে সন্নিবেশিত করে যেতে থাকবো। এর ফলে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে না। তিনি বলেন ঃ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, যখনই তিনি সফরে যেতেন তখনই স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে তাঁর সংগে যাবে তা ঠিক করার জন্য লটারী করতেন।• বনীল মুসতালিক যুদ্ধের সময় লটারীতে আমার নাম ওঠে। ফলে আমি তাঁর সাথী হই। ফেরার সময় আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি এসে গেছি তখন এক মনযিলে রত্রিকালে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেলার যাত্রা বিরতি করেন। এদিকে রাত পোহাবার তখনো কিছু সময় বাকি ছিল এমন সময় রওয়ানা দেবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আমি উঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য যাই। ফিরে আসার সময় অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে মনে হলো আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তার খোঁজে লেগে যাই। ইত্যবসরে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায়। নিয়ম ছিল, রওয়ানা হবার সময় আমি নিজের হাওদায় বসে যেতাম এবং চারজন লোক মিলে সেটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিতো। সে যুগে আমরা মেয়েরা কম খাবার কারণে বড়ই হালকা পাত্‌লা হতাম। আমার হাওদা উঠাবার সময় আমি যে তার মধ্যে নেই একথা লোকেরা অনুভবই করতে পারেনি। তারা না জেনে খালি হাওদাটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিয়ে রওয়ানা হয়ে

• এ লটারীর ধরনটি প্রচলিত লটারীর মতো ছিল না। আসলে সকল স্ত্রীর অধিকার সমান ছিল। তাঁদের একজনকে অন্য জনের ওপর প্রাধান্য দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। এখন যদি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কাউকে বেছে নিতেন তাহলে স্ত্রীরা মনে ব্যথা পেতেন এবং এতে পারস্পরিক রেষারেষি ও বিদ্বেষ সৃষ্টির আশংকা থাকতো। তাই তিনি লটারীর মাধ্যমে এর ফায়সালা করতেন। শরীয়াতে এমন সব অবস্থার জন্য লটারী করার সুযোগ রাখা হয়েছে। যখন কতিপয় লোকের বৈধ অধিকার হয় একেবারেই সমান সমান এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার দেবার কোন ন্যায়সংগত কারণ থাকে না অথচ অধিকার কেবলমাত্র একজনকেই দেয়া যেতে পারে।

যায়। আমি হার নিয়ে ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। কাজেই নিজের চাদর মুড়ি দিয়ে আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। মনে মনে ভাবি, সামনের দিকে গিয়ে আমাকে হাওদার মধ্যে না পেয়ে তারা নিজেরাই খুঁজতে খুঁজতে আবার এখানে চলে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সালামী আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখান দিয়ে যেতে থাকেন। তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেলেন। কারণ পরদার হুকুম নাযিল হবার পূর্বে তিনি আমাকে বহুবার দেখেন। (তিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। সকালে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা ছিল তাঁর অভ্যাস।* তাই তিনিও সেনা শিবিরের কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন ঘুম থেকে উঠে মদীনার দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন।) আমাকে দেখে তিনি উট থামিয়ে নেন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী এখানে রয়ে গেছেন?" তাঁর এ আওয়াজে আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি উঠে সংগে সংগেই আমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নিই। তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি, সোজা তাঁর উটটি এনে আমার কাছে বসিয়ে দেন এবং নিজে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাই এবং তিনি উটের রশি ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আমরা সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেই। সে সময় সেনাদল এক জায়গায় গিয়ে সবেমাত্র যাত্রা বিরতি শুরু করেছে। তখনো তারা টেরই পায়নি আমি পেছনে রয়ে গেছি। এ ঘটনায় কুচক্রীরা মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে এবং এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সবার আগে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কিসব কথাবার্তা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ।

[অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে সময় সফওয়ানের উটের পিঠে চড়ে হযরত আয়েশা (রা) সেনা শিবিরে এসে পৌছেন এবং তিনি এভাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে ওঠে, "আল্লাহর কসম, এ মহিলা নিষ্কলংক অবস্থায় আসেনি। নাও, দেখো তোমাদের নবীর স্ত্রী আর একজনের সাথে রাত কাটিয়েছে এবং সে এখন তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে চলে আসছে।"]

মদীনায় পৌছেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং প্রায় এক মাসকাল বিছানায় পড়ে থাকি। শহরে এ মিথ্যা অপবাদের খবর ছড়িয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেও কথা আসতে থাকে। কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। তবে যে জিনিসটি আমার মনে খচ্‌খচ করতে থাকে তা হচ্ছে এই যে, অসুস্থ অবস্থায় যে রকম দৃষ্টি দেয়া দরকার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আমার প্রতি তেমন ছিল না। তিনি ঘরে এলে ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করতেন كَيْفَ تِيكُمْ (ও কেমন আছে?)

* আবু দাউদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ আলোচনা এসেছে, তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে, তিনি কখনো ফজরের নামায যথা সময় পড়েন না। তিনি ওজর পেশ করেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা আমার পারিবারিক রোগ। সকালে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার এ দুর্বলতাটি আমি কিছুতেই দূর করতে পারি না। একথায় রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ঠিক আছে, যখনই ঘুম ভাংবে, সংগে সংগেই নামায পড়ে নেবে। কোন কোন মুহাদ্দিস তাঁর কাফেলার পেছনে থেকে যাওয়ার এ কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, রাতের অন্ধকারে রওয়ানা হবার কারণে যদি কারোর কোন জিনিস পেছনে থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সকালে তা খুঁজে নিয়ে আসার দায়িত্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন।

নিজে আমার সাথে কোন কথা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহ হতো, নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার ঘটেছে। শেষে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি নিজের মায়ের বাড়িতে চলে গেলাম, যাতে তিনি আমার সেবা শুশ্রূষা ভালোভাবে করতে পারেন।

এক রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমি মদীনার বাইরে যাই। সে সময় আমাদের বাড়িঘরে এ ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে আমরা পায়খানা করার জন্য বাইরে জংগলের দিকে যেতাম। আমার সাথে ছিলেন মিস্‌তাহ ইবনে উসাসার মা। তিনি ছিলেন আমার মায়ের খালাত বোন। [অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, তাদের সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণ হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) জিম্মায় ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মিস্‌তাহ এমন লোকদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন যারা হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছিল।] রাস্তায় তাঁর পায় ঠোকর লাগে এবং তিনি সংগে সংগে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন ঃ "ধ্বংস হোক মিস্‌তাহ।" আমি বললাম, "ভালই মা দেখছি আপনি, নিজের পেটের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছেন, আবার ছেলেও এমন যে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।" তিনি বলেন, "মা, তুমি কি তার কথা কিছুই জানো না?" তারপর তিনি গড়গড় করে সব কথা বলে যান। তিনি বলে যেতে থাকেন, মিথ্যা অপবাদদাতারা আমার বিরুদ্ধে কিসব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। [মুনাফিকরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্য থেকেও যারা এ ফিতনায় শামিল হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে মিস্‌তাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাস্‌সান ইবনে সাবেত ও হযরত যয়নবের (রা) বোন হাম্‌না বিন্‌তে জাহশের অংশ ছিল সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য।] এ কাহিনী শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। যে প্রয়োজন পূরণের জন্য আমি বের হয়েছিলাম তাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে এলাম। সারা রাত আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে যায়।"

সামনের দিকে এগিয়ে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ "আমি চলে আসার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা) ও উসামাহ ইবনে যায়েদকে (রা) ডাকেন। তাদের কাছে পরামর্শ চান। উসামাহ (রা) আমার পক্ষে ভালো কথাই বলে। সে বলে, 'হে আল্লাহর রসূল! ভালো জিনিস ছাড়া আপনার স্ত্রীর মধ্যে আমি আর কিছুই দেখিনি। যা কিছু রটানো হচ্ছে সবই মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর আলী (রা) বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মেয়ের অভাব নেই। আপনি তাঁর জায়গায় অন্য একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারেন। আর যদি অনুসন্ধান করতে চান তাহলে সেবিকা বাঁদীকে ডেকে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন।' কাজেই সেবিকাকে ডাকা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। সে বলে, 'সে আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে এমন কোন খারাপ জিনিস দেখিনি যার ওপর অংগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে এতটুকু দোষ তাঁর আছে যে, আমি আটা ছেনে রেখে কোন কাজে চলে যাই এবং বলে যাই, বিবি সাহেবা! একটু আটার দিকে খেয়াল রাখবেন, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং বকরি এসে আটা খেয়ে ফেলে।' সেদিনই রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় বলেন, 'হে মুসলমানগণ! এক ব্যক্তি আমার পরিবারের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে আমাকে অশেষ কষ্ট দিচ্ছে৷ তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, তার আক্রমণ থেকে আমার ইজ্জত বাঁচাতে পারে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রীর মধ্যেও কোন খারাপ জিনিস দেখিনি এবং সে ব্যক্তির মধ্যেও কোন খারাপ জিনিস দেখিনি যার সম্পর্কে অপবাদ দেয়া

হচ্ছে।' সে তো কখনো আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীতেও আসেনি।' একথায় উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী `দ ইবনে মু'আয*) উঠে বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি সে আমাদের গোত্রের লোক হয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করবো আর যদি আমাদের ভাই খায্‌রাজদের লোক হয় তাহলে আপনি হুকুম দিন আমরা হুকুম পালন করার জন্য প্রস্তুত।' একথা শুনতেই খায্‌রাজ প্রধান সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, 'মিথ্যা বলছো, তোমরা তাকে কখনোই হত্যা করতে পারো না। তোমরা তাকে হত্যা করার কথা শুধু এ জন্যই মুখে আনছো যে সে খায্‌রাজদের অন্তরভুক্ত। যদি সে তোমাদের গোত্রের লোক হতো তাহলে তোমরা কখনো একথা বলতে না, আমরা তাকে হত্যা করবো।'** উসাইদ ইবনে হুদাইর জবাব দেন, 'তুমি মুনাফিক, তাই মুনাফিকদের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছো।' একথায় মসজিদে নববীতে একটি হাংগামা শুরু হয়ে যায়। অথচ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে বসে ছিলেন। মসজিদের মধ্যেই আওস ও খায্‌রাজের লড়াই বেঁধে যাবার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শান্ত করেন এবং তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন।"

হযরত আয়েশার (রা) অবশিষ্ট কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ আমি এতদসংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করবো যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ত্রুটি মুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে আমি যা কিছু বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ অপবাদ রটিয়ে একই গুলীতে কয়েকটি পাখি শিকার করার প্রচেষ্টা চালায়। একদিকে সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ইজ্জতের ওপর

* সম্ভবত নামের ক্ষেত্রে এ বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা (রা) নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে আওস সরদার শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন। কোন বর্ণনাকারী এ থেকে সা'দ ইবনে মু'আয মনে করেছেন। কারণ নিজের জীবদ্দশায় তিনিই ছিলেন আওস গোত্রের সরদার এবং ইতিহাসে আওস সরদার হিসেবে তিনিই বেশী পরিচিত। অথচ আসলে এ ঘটনার সময় তাঁর চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে হুদাইর ছিলেন আওসের সরদার।

** হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ যদিও অত্যন্ত সৎ ও মুখ্‌লিস মুসলমান ছিলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন এবং মদীনায় যাদের সাহায্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে তিনিও একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তবুও এতসব সৎ গুণ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি ও জাতীয় স্বার্থবোধ (আর আরবে সে সময় জাতি বলতে গোত্রই বুঝাতো) ছিল অনেক বেশী। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যেহেতু সে ছিল তাঁর গোত্রের লোক। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর মুখ থেকে একথা বের হয়ে যায় : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمه (আজ হত্যা ও রক্ত প্রবাহের দিন। আজ এখানে হারামকে হালাল করা হবে।) এর ফলে ক্রোধ প্রকাশ করে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছ থেকে সেনাবাহিনীর ঝাণ্ডা ফিরিয়ে নেন। আবার এ কারণেই তিনি রসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর সাকীফায়ে বনি সায়েদায় খিলাফত আনসারদের হক বলে দাবী করেন। আর যখন তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে আনসার ও মুহাজির সবাই সম্মিলিতভাবে হযরত আবু বকরের (রা) হাতে বাই'আত করেন তখন তিনি একাই বাই'আত করতে অস্বীকার করেন। আমৃত্যু তিনি কুরাইশী খলীফার খিলাফত স্বীকার করেননি। (দেখুন আল ইসাবাহ লিইবনে হাজার এবং আল ইস্‌তিআব লিইব্‌নে আবদিল বার এবং সা'দ ইবনে উবাদাহ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০-১১)

হামলা চালায়। অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনের উন্নততর নৈতিক মর্যাদা ও চারিত্রিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত সে এর মাধ্যমে এমন একটি অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে যে, যদি ইসলাম তার অনুসারীদের জীবন ও চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে না ফেলে থাকতো তাহলে মুহাজির ও আনসার এবং স্বয়ং আনসারদেরই দু'টি গোত্র পরস্পর লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যেতো।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বিষয়

এ ছিল সে সময়কার পরিস্থিতি। এর মধ্যে প্রথম হামলার সময় সূরা আহযাবের শেষ ৬টি রুকূ' নাযিল হয় এবং দ্বিতীয় হামলার সময় নাযিল হয় সূরা নূর। এ পটভূমি সামনে রেখে এ দু'টি সূরা পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করলে এ বিধানগুলোর মধ্যে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে তা ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়।

মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে এমন এক ময়দানে পরাজিত করতে চাচ্ছিল যেটা ছিল তাদের প্রাধান্যের আসল ক্ষেত্র। আল্লাহ তাদের চরিত্র হননমূলক অপবাদ রটনার অভিযানের বিরুদ্ধে একটি ক্রুদ্ধ ভাষণ দেবার বা মুসলমানদেরকে পাল্টা আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার প্রতি তাঁর সার্বিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যে, তোমাদের নৈতিক অংগনে যেখানে যেখানে শূন্যতা রয়েছে সেগুলো পূর্ণ কর এবং এ অংগনকে আরো বেশী শক্তিশালী করো। একটু আগেই দেখা গেছে যয়নবের (রা) বিয়ের সময় মুনাফিক ও কাফেররা কী হাংগামাটাই না সৃষ্টি করেছিল। অথচ সূরা আহ্যাব বের করে পড়লে দেখা যাবে সেখানে ঠিক সে হাংগামার যুগেই সামাজিক সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশগুলো দেয়া হয় ঃ

এক ঃ নবী করীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া হয় ঃ নিজেদের গৃহমধ্যে মর্যাদা সহকারে বসে থাকো, সাজসজ্জা করে বাইরে বের হয়ো না এবং ভিন পুরুষদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে বিনম্র স্বরে কথা বলো না, যাতে কোন ব্যক্তি কোন অবাঞ্ছিত আশা পোষণ না করে বসে। (৩২ ও ৩৩ আয়াত)

দুই ঃ নবী করীমের (সা) গৃহে ভিন্ পুরুষদের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয়, তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইতে হলে পরদার আড়াল থেকে চাইতে হবে। (৫৩ আয়াত)

তিন ঃ গায়ের মাহ্রাম পুরুষ ও মাহ্রাম আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হুকুম দেয়া হয়েছে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের কেবলমাত্র মাহ্রাম আত্মীয়রাই স্বাধীনভাবে তাঁর গৃহে যাতায়াত করতে পারবেন। (৫৫ আয়াত)

চার ঃ মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হয়, নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মা এবং একজন মুসলমানের জন্য তাঁরা চিরতরে ঠিক তার আপন মায়ের মতই হারাম। তাই তাঁদের সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের নিয়ত একদম পাক পবিত্র থাকতে হবে। (৫৩ ও ৫৪ আয়াত)

পাঁচ ঃ মুসলমানদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নবীকে কষ্ট দেয়া দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর লানত ও লাঞ্ছনাকর আযাবের কারণ হবে এবং এভাবে

কোন মুসলমানের ইজ্জতের ওপর আক্রমণ করা এবং তার ভিত্তিতে তার ওপর অযথা দোষারোপ করাও কঠিন গোনাহের শামিল। (৫৭ ও ৫৮ আয়াত)

ছয় ঃ সকল মুসলমান মেয়েকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে, চাদর দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হতে হবে। (৫৯ আয়াত)

তারপর যখন হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় মদীনার সমাজে একটি হাংগামা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন নৈতিকতা, সামাজিকতা ও আইনের এমন সব বিধান ও নির্দেশসহকারে সূরা নূর নাযিল করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত মুসলিম সমাজকে অনাচারের উৎপাদন ও তার বিস্তার থেকে সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং যদি তা উৎপন্ন হয়েই যায় তাহলে তার যথাযথ প্রতিকার ও প্রতিরোধ এবং সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সূরায় এ বিধান ও নির্দেশগুলো যে ধারাবাহিকতা সহকারে নাযিল হয়েছে এখানে আমি সেভাবেই তাদের সংক্ষিপ্তসার সন্নিবেশ করছি। এ দ্বারা কুরআন যথার্থ মনস্তাত্বিক পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনের সংশোধন ও সংগঠনের জন্য কি ধরনের আইনগত, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ও কৌশল অবলম্বন করার বিধান দেয়, তা পাঠক অনুমান করতে পারবেন ঃ

(১) যিনা, ইতিপূর্বে যাকে সামাজিক অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল (সূরা নিসা ঃ ১৫ ও ১৬ আয়াত) এখন তাকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে তার শাস্তি হিসেবে একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

(২) ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার হুকুম দেয়া হয় এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়।

(৩) যে ব্যক্তি অন্যের ওপর যিনার অপবাদ দেয় এবং তারপর প্রমাণস্বরূপ সাক্ষী পেশ করতে পারে না তার শাস্তি হিসেবে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

(৪) স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় তাহলে তার জন্য "লি'আন"-এর রীতি প্রবর্তন করা হয়।

(৫) হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে কোন ভদ্র মহিলা বা ভদ্র লোকের বিরুদ্ধে যে কোন অপবাদ দেয়া হোক, তা চোখবুজে মেনে নিয়ো না এবং তা ছড়াতেও থেকো না। এ ধরনের গুজব যদি রটে যেতে থাকে তাহলে মুখে মুখে তাকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য না করে তাকে দাবিয়ে দেয়া এবং তার পথ রোধ করা উচিত। এ প্রসংগে নীতিগতভাবে একটি কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর সাথেই বিবাহিত হওয়া উচিত। নষ্টা ও ভ্রষ্টা নারীর আচার-আচরণের সাথে সে দু'দিনও খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর ব্যাপারেও একই কথা। তার আত্মা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পুরুষের সাথেই খাপ খাওয়াতে পারে, নষ্ট ও ভ্রষ্ট পুরুষের সাথে নয়। এখন যদি তোমরা রসূলকে (সা) একজন পবিত্র বরং পবিত্রতম ব্যক্তি বলে জেনে থাকো তাহলে কেমন করে একথা তোমাদের বোধগম্য হলো যে, একজন ভ্রষ্টা নারী তার প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী হতে পারতো? যে নারী কার্যত ব্যভিচারে পর্যন্ত লিপ্ত হয়ে যায় তার সাধারণ চালচলন কিভাবে

এমন পর্যায়ের হতে পারে যে, রসূলের মতো পবিত্র ব্যক্তিত্ব তার সাথে এভাবে সংসার জীবন যাপন করেন। কাজেই একজন নীচ ও স্বার্থান্ধ লোক একটি বাজে অপবাদ কারোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই তা গ্রহণযোগ্য তো হয়ই না, উপরন্তু তার প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং তাকে সম্ভব মনে করাও উচিত নয়। আগে চোখ মেলে দেখতে হবে। অপবাদ কে লাগাচ্ছে এবং কার প্রতি লাগাচ্ছে?

(৬) যারা আজেবাজে খবর ও খারাপ গুজব রটায় এবং মুসলিম সমাজে নৈতিকতা বিরোধী ও অশ্লীল কার্যকলাপের প্রচলন করার প্রচেষ্টা চালায় তাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, তাদেরকে উৎসাহিত করা যাবে না বরং তারা শাস্তি লাভের যোগ্য।

(৭) মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সুধারণার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্ গড়ে উঠতে হবে, এটিকে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না ততক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ ও নিরপরাধ মনে করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দোষ হবার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী মনে করতে হবে, এটা ঠিক নয়।

(৮) লোকদেরকে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যে, একজন অন্যজনের গৃহে নিসংকোচে প্রবেশ করো না বরং অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো।

(৯) নারী ও পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। পরস্পরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে ও উঁকিঝুঁকি মারতে এবং আড়চোখে দেখতে নিষেধ করা হয়।

(১০) মেয়েদের হুকুম দেয়া হয়, নিজেদের গৃহে মাথা ও বুক ঢেকে রাখো।

(১১) মেয়েদের নিজেদের মাহ্‌রাম আত্মীয় ও গৃহপরিচারকদের ছাড়া আর কারোর সামনে সাজগোজ করে না আসার হুকুম দেয়া হয়।

(১২) তাদেরকে এ হুকুমও দেয়া হয় যে, বাইরে বের হলে শুধু যে কেবল নিজেদের সাজসজ্জা লুকিয়ে বের হবে তাই না বরং এমন অলংকার পরিধান করেও বাইরে বের হওয়া যাবে না যেগুলো বাজতে থাকে।

(১৩) সমাজে মেয়েদের ও পুরুষদের বিয়ে না করে আইবুড়ো ও আইবুড়ী হয়ে বসে থাকাকে অপছন্দ করা হয়। হুকুম দেয়া হয়, অবিবাহিতদের বিয়ে দেয়া হোক। এমনকি বাঁদী ও গোলামদেরকেও অবিবাহিত রেখে দেয়া যাবে না। কারণ কৌমার্য ও কুমারিত্ব অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অনাচারের প্ররোচনাও দেয়, আবার মানুষকে অশ্লীলতার সহজ শিকারে পরিণত করে। অবিবাহিত ব্যক্তি আর কিছু না হলেও খারাপ খবর শোনার এবং তা ছড়াবার ব্যাপারে আগ্রহ নিতে থাকে।

(১৪) বাঁদী ও গোলাম স্বাধীন করার জন্য "মুকাতাব"–এর পথ বের করা হয়। (মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীন হওয়া) মালিকরা ছাড়া অন্যদেরকেও মুকাতাব বাঁদী ও গোলামদেরকে আর্থিক সাহায্য করার হুকুম দেয়া হয়।

(১৫) বাঁদীদেরকে অর্থোপার্জনের কাজে খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়। আরবে বাঁদীদের মাধ্যমেই এ পেশাটি জিইয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল। এ কারণে একে নিষিদ্ধ করার ফলে আসলে পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

(১৬) পারিবারিক জীবনে গৃহ পরিচারক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের জন্য নিয়ম করা হয় যে, তারা একান্ত ব্যক্তিগত সময়গুলোয় (অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও রাতে) গৃহের কোন পুরুষ ও মেয়ের কামরায় আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়তে পারবে না। নিজের সন্তানদের মধ্যেও অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

(১৭) বুড়ীদেরকে অনুমতি দেয়া হয়, তারা যদি স্বগৃহে মাথা থেকে ওড়না নামিয়ে রেখে দেয় তাহলে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু "তাবারুরুজ" (নিজেকে দেখাবার জন্য সাজসজ্জা করা) থেকে দূরে থাকার হুকুম দেয়া হয়। তাছাড়া তাদেরকে নসিহত করা হয়েছে, বার্ধক্যাবস্থায়ও তারা যদি মাথায় কাপড় দিয়ে থাকে তাহলে ভালো।

(১৮) অন্ধ, খঞ্জ, পংগু ও রুগ্নকে এ সুবিধা প্রদান করা হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে কোথাও থেকে কোন খাদ্যবস্তু খেয়ে নিলে তাকে চুরি ও আত্মসাতের আওতায় ফেলা হবে না। এ জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

(১৯) নিকট আত্মীয় ও অন্তরংগ বন্ধুদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে পরস্পরের বাড়িতে খেতে পারে এবং এটা এমন পর্যায়ের যেমন তারা নিজেদের বাড়িতে খেতে পারে। এভাবে সমাজের লোকদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকেও অচেনা ও সম্পর্কহীনতার বেড়া তুলে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে স্নেহ–ভালোবাসা–মায়া–মমতা বেড়ে যাবে এবং পারস্পরিক আন্তরিকতার সম্পর্ক এমন সব ছিদ্র বন্ধ করে দেবে যেগুলোর মাধ্যমে কোন কুচক্রী তাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারতো।

এসব নির্দেশের সাথে সাথে মুনাফিক ও মু'মিনদের এমনসব সুস্পষ্ট আলামত বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান সমাজে আন্তরিকতা সম্পন্ন মু'মিন কে এবং মুনাফিক কে তা জানতে পারে। অন্যদিকে মুসলমানদের দলগত শৃংখলা ও সংগঠনকে আরো শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আরো কতিপয় নিয়ম–কানুন তৈরী করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফের ও মুনাফিকরা যে শক্তির সাথে টক্কর দিতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিত্না–ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছিল তাকে আরো বেশী শক্তিশালী করা।

এ সমগ্র আলোচনায় একটি জিনিস পরিষ্কার দেখার মতো। অর্থাৎ বাজে ও লজ্জাকর হামলার জবাবে যে ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে সমগ্র সূরা নূরে তার ছিঁটেফোটাও নেই। একদিকে যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তা দেখুন এবং অন্যদিকে সূরার বিষয়বস্তু ও বাকরীতি দেখুন। এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কেমন ঠাণ্ডা মাথায় আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। সংস্কারমূলক বিধান দেয়া হচ্ছে। জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি শিক্ষা ও উপদেশ দানের হক আদায় করা হচ্ছে। এ থেকে শুধুমাত্র এ শিক্ষাই পাওয়া যায় না যে, ফিত্নার মোকাবিলায় কঠিন থেকে কঠিনতর উত্তেজক পরিস্থিতিতে আমাদের কেমন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা–ভাবনা করে উদার হৃদয়ে বুদ্ধিমত্তা সহকারে এগিয়ে যেতে হবে বরং এ থেকে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয়, এটা এমন এক সত্তার অবতীর্ণ বাণী যিনি অনেক উচ্চ স্থান থেকে মানুষের অবস্থা ও জীবনাচার প্রত্যক্ষ করছেন এবং নিজ সত্তায় এসব অবস্থা ও জীবনাচারের প্রভাবমুক্ত থেকে নির্জলা পথনির্দেশনা ও বিধান দানের

দায়িত্ব পালন করছেন। যদি এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বাণী হতো তাহলে তাঁর চরম উদার দৃষ্টি সত্ত্বেও নিজের ইজ্জত আবরুর ওপর জঘন্য আক্রমণের ধারা বিবরণী শুনে একজন সৎ ও ভদ্র লোকের আবেগ অনুভূতিতে অনিবার্যভাবে যে স্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যায় তার কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই এর মধ্যে পাওয়া যেতো।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ① اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ②

এটি একটি সূরা, আমি এটি নাযিল করেছি এবং একে ফরয করে দিয়েছি আর এর মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ নাযিল করেছি,[১] হয়তো তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত করো।[২] আর আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোন মমত্ববোধ ও করুণা যেন তোমাদের মধ্যে না জাগে যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনো।[৩] আর তাদেরকে শাস্তি দেবার সময় মু'মিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।[৪]

১. এসব বাক্যাংশের মধ্যে "আমি"র ওপর জোর দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আর কেউ এটি নাযিল করেনি বরং "আমিই" নাযিল করেছি। তাই কোন শক্তিহীন উপদেশকের বাণীর মতো একে হাল্‌কা জিনিস মনে করে বসো না। ভালো করে জেনে রাখো, এমন এক সত্তা এটি নাযিল করেছেন যার মুঠোর মধ্যে রয়েছে তোমাদের প্রাণ ও কিসমত এবং তোমরা মরেও যার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না।

দ্বিতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সূরায় যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো "সুপারিশ" পর্যায়ের জিনিস নয়। তোমার ইচ্ছা হলে মেনে নিলে অন্যথায় যা ইচ্ছা তাই করতে থাকলে, ব্যাপারটা তেমন নয়। বরং এটি হচ্ছে অকাট্য ও চূড়ান্ত বিধান। এ বিধান মেনে চলা অপরিহার্য। যদি তুমি মু'মিন ও মুসলিম হয়ে থাকো, তাহলে এ বিধান অনুযায়ী কাজ করা তোমার জন্য ফরয।

তৃতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সূরায় যেসব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট নির্দেশনামা। এগুলো সম্পর্কে তোমরা এ ওজর পেশ

করতে পারবে না যে, অমুক কথাটি বুঝতে পারিনি কাজেই সেটিকে কেমন করে কার্যকর করতাম?

যে মহান ঘোষণার পরে আইনগত বিধান শুরু হয়ে যায় এটি হচ্ছে তার ভূমিকা (Preamble) সূরা নূরের বিধানগুলো মহান আল্লাহ কত গুরুত্ব সহকারে পেশ করছেন এ ভূমিকার বর্ণনাভংগী নিজেই তা জানিয়ে দিচ্ছে আইন–বিধান সম্বলিত অন্য কোন সূরার ভূমিকা এত বেশী জোরদার নয়।

২. এ বিষয়টির অনেকগুলো আইনগত, নৈতিক ও ঐতিহাসিক দিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ রয়ে গেছে। সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া বর্তমান যুগে এক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর এ শরীয়াতী বিধান অনুধাবন করা কঠিন। তাই নিচে আমি এর বিভিন্ন দিকের ওপর ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করবো ঃ

এক ঃ যিনা বা ব্যভিচারের যে সাধারণ অর্থটি প্রত্যেক ব্যক্তি জানে সেটি হচ্ছে এই যে, "একটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোক নিজেদের মধ্যে কোন বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়াই পরস্পর যৌন মিলন করে।" এ কাজটির নৈতিকভাবে খারাপ হওয়া অথবা ধর্মীয় দিক দিয়ে পাপ হওয়া কিংবা সামাজিক দিক দিয়ে দূষণীয় ও আপত্তিকর হওয়া এমন একটি জিনিস যে ব্যাপারে প্রাচীনতম যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সকল মানব সমাজ ঐকমত্য পোষণ করে আসছে। কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কয়েকজন লোক যারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিজেদের প্রবৃত্তি তোষণ নীতির অধীন করে দিয়েছে অথবা যারা নিজেদের উন্মত্ত মস্তিষ্কের অভিনব খেয়ালকে দার্শনিক তত্ত্ব মনে করে নিয়েছে তারা ছাড়া আর কেউই আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করেনি। এ বিশ্বজনীন ঐকমত্যের কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের প্রকৃতি নিজেই যিনা হারাম হওয়ার দাবী জানায়। মানব জাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব এবং মানবিক সভ্যতা–সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা উভয়ই এ বিষয়টির ওপর নির্ভর করে যে, নারী ও পুরুষ শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগের জন্য মিলিত হবার এবং তারপর আলাদা হয়ে যাবার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হবে না বরং প্রত্যেকটি জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক এমন একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিশ্বস্ততার অংগীকার ও চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে যা সমাজের সবাই জানবে এবং সবার কাছে হবে পরিচিত এবং এ সংগে সমাজ তার নিশ্চয়তাও দেবে। এ অংগীকার ও চুক্তি ছাড়া মানুষের বংশধারা এক দিনের জন্যও চলতে পারে না। কারণ মানব শিশু নিজের জীবন ও নিজের বিকাশের জন্য বছরের পর বছরের সহানুভূতিশীল রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা–প্রশিক্ষণের মুখাপেক্ষী হয়। যে পুরুষটি এ শিশুর দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভের কারণ হয়েছে যতক্ষণ না সে নারীর সাথে সহযোগিতা করবে ততক্ষণ কোন নারী একাকী এ বোঝা বহন করার জন্য কখনো তৈরী হতে পারে না। অনুরূপভাবে এ চুক্তি ছাড়া মানুষের সভ্যতা–সংস্কৃতিও টিকে থাকতে পারে না। কারণ সভ্যতা–সংস্কৃতির জন্মই তো একটি পুরুষ ও একটি নারীর সহ অবস্থান করার, গৃহ ও পরিবারের অস্তিত্ব দান করার এবং তারপর পরিবারগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যদি নারী ও পুরুষ গৃহ ও পরিবার গঠন না করে নিছক আনন্দ উপভোগের জন্য স্বাধীনভাবে সহ অবস্থান করতে থাকে তাহলে সমস্ত মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। সমাজ জীবনের ভিত্তি চূর্ণ ও বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এ ইমারত যে ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে তার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এসব কারণে নারী

ও পুরুষের যে স্বাধীন সম্পর্ক কোন সুপরিচিত ও সর্বসম্মত বিশ্বস্ততার চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় তা মূলত মানবিক প্রকৃতির বিরোধী। এসব কারণেই প্রতি যুগে মানুষ একে মারাত্মক দোষ, বড় ধরনের অসদাচার ও ধর্মীয় পরিভাষায় একটি কঠিন গোনাহ মনে করে এসেছে এবং এসব কারণেই প্রতি যুগে মানব সমাজ বিয়ের প্রচলন ও প্রসারের সাথে সাথে যিনা ও ব্যভিচারের পথ বন্ধ করার জন্য কোন না কোনভাবে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে এ প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন–কানুন এবং নৈতিক, তামাদ্দুনিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। জাতি ও সমাজের জন্য যিনার ক্ষতিকর হবার চেতনা কোথাও কম এবং কোথাও বেশী, কোথাও সুস্পষ্ট আবার কোথাও অন্যান্য সমস্যার সাথে জড়িয়ে অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

দুই ঃ যিনার হারাম হবার ব্যাপারে একমত হবার পর যে বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে সেটি হচ্ছে, এর অপরাধ অর্থাৎ আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য হবার ব্যাপারটি। এখান থেকেই ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম ও আইনের বিরোধ শুরু হয়। যেসব সমাজ মানব প্রকৃতির কাছাকাছি থেকেছে তারা সবসময় যিনা অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে একটি অপরাধ হিসেবে দেখে এসেছে এবং এ জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ধারা যতই সমাজকে খারাপ করে চলেছে এ অপরাধ সম্পর্কে ততই মনোভাব কোমল হয়ে চলেছে।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয় এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করা হয় সেটি ছিল ঃ "নিছক যিনা" (Fornication) এবং "পর নারীর সাথে যিনা" (Adultery) এর মধ্যে পার্থক্য করে প্রথমটিকে সামান্য ভুল এবং কেবলমাত্র শেষোক্তটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়।

নিছক যিনার যে সংজ্ঞা বিভিন্ন আইনে পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, "কোন অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষ এমন কোন মেয়ের সাথে সংগম করে যে অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী নয়।" এ সংজ্ঞায় মূলত পুরুষের নয় বরং নারীর অবস্থার ওপর নির্ভর করা হয়েছে। নারী যদি স্বামীহীন হয় তাহলে তার সাথে সংগম নিছক যিনা হবে। এ ক্ষেত্রে সংগমকারী পুরুষের স্ত্রী থাক বা না থাক। তাতে কিছু আসে যায় না। প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলন, আসিরীয়া ও ভারতের আইনে এর শাস্তি ছিল খুবই হাল্‌কা পরিমাণের। গ্রীস ও রোমও এ পদ্ধতিই অবলম্বন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদীরাও এ থেকে প্রভাবিত হয়। বাইবেলে একে শুধুমাত্র এমন একটি অন্যায় বলা হয়েছে যার ফলে পুরুষকে কেবলমাত্র অর্থদণ্ডই দিতে হয়। যাত্রা পুস্তকে এ সম্পর্কে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তার শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ

> "আর কেহ যদি অবাগদত্তা কুমারীকে ভুলাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে সে অবশ্য কন্যাপণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। যদি সেই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রৌপ্য দিতে হইবে।" (২২ঃ১৬–১৭)

"দ্বিতীয় বিবরণে" এ হুকুমটি কিছুটা অন্য শব্দাবলীর সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারপর বলা হয়েছে, পুরুষের কাছ থেকে পঞ্চাশ শেকল (প্রায় ২০ তোলা) পরিমাণ রৌপ্য

কন্যার পিতাকে জরিমানা দেবে। (২২ঃ২৮–২৯) তবে কোন ব্যক্তি যদি পুরোহিতের মেয়ের সাথে যিনা করে তাহলে তার জন্য ইহুদী আইনে রয়েছে ফাঁসি এবং মেয়েকে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করার ব্যবস্থা। (Everyman's Talmud, p. 319-20)

এ চিন্তাটি হিন্দু চিন্তার সাথে কত বেশী সামঞ্জস্যশীল তা অনুমান করার জন্য মনু সংহিতার সাথে একবার মিলিয়ে দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"যে ব্যক্তি নিজের জাতের কুমারী মেয়ের সাথে তার সম্মতিক্রমে যিনা করে সে কোন শাস্তি লাভের যোগ্য নয়। মেয়ের বাপ রাজী থাকলে সে বিনিময় দিয়ে তাকে বিয়ে করে নেবে। তবে মেয়ে যদি উচ্চ বর্ণের হয় এবং পুরুষ হয় নিম্নবর্ণের, তাহলে মেয়েকে গৃহ থেকে বের করে দেয়া উচিত এবং পুরুষের অংগচ্ছেদের শাস্তি দিতে হবে।" (৮ ঃ ৩৬৫–৩৬৬) আর মেয়ে ব্রাহ্মণ হলে এ শাস্তি জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করার শাস্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। (৩৭৭ শ্লোক)।

আসলে এ সমস্ত আইনে পরস্ত্রীর সাথে যিনা করাই ছিল বড় অপরাধ। অর্থাৎ যখন কোন (বিবাহিত বা অবিবাহিত) ব্যক্তি এমন কোন মেয়ের সাথে সংগম করে যে অন্য কোন ব্যক্তির স্ত্রী। এ কর্মটির অপরাধ হবার ভিত্তি এ ছিল না যে, একটি পুরুষ ও একটি নারী যিনা করেছে। বরং তারা দু'জন মিলে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে এমন একটি শিশু লালন পালন করার বিপদে ফেলে দিয়েছে যেটি তার নয়, এটিই ছিল এর ভিত্তি। অর্থাৎ যিনা নয় বরং বংশধারা মিশ্রণের আশংকা এবং একের সন্তানকে অন্যের অর্থে প্রতিপালন করা ও তার উত্তরাধিকার হওয়াই ছিল অপরাধের মূল ভিত্তি। এ কারণে পুরুষ ও নারী উভয়েই অপরাধী সাব্যস্ত হতো। মিসরীয়দের সমাজে এর শাস্তি ছিল পুরুষটিকে লাঠি দিয়ে ভালোমতো পিটাতে হবে এবং মেয়েটির নাক কেটে দিতে হবে। প্রায় এ একই ধরনের শাস্তির প্রচলন ছিল ব্যাবিলন, আসিরীয়া ও প্রাচীন ইরানেও। হিন্দুদের মধ্যে নারীর শাস্তি ছিল, তার ওপর কুকুর লেলিয়ে দেয়া হতো এবং পুরুষের শাস্তি ছিল, তাকে উত্তপ্ত লোহার পালংকে শুইয়ে দিয়ে চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয়া হতো। গ্রীস ও রোমে প্রথম দিকে একজন পুরুষের অধিকার ছিল যদি সে নিজের স্ত্রীর সাথে কাউকে যিনা করতে দেখে তাহলে তাকে হত্যা করতে পারতো অথবা ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে অর্থদণ্ড নিতে পারতো। তার পর প্রথম খৃষ্টপূর্বাব্দে সীজার আগষ্টস এ আইন জারি করেন যে, পুরুষের সম্পত্তির অর্ধাংশ বাজেয়াপ্ত করে তাকে দেশান্তর করে দিতে হবে এবং নারীর অর্ধেক মোহরানা বাতিল এবং এক–তৃতীয়াংশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাকেও দেশের কোন দূরবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দিতে হবে। কনষ্টান্টিন এ আইনটি পরিবর্তিত করে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেন। লিও (Leo) ও মারসিয়ানের (Marcian) যুগে এ শাস্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর সীজার জাষ্টিনীন এ শাস্তিটি আরো হাল্কা করে এ নিয়ম জারি করেন যে, মেয়েটিকে বেত্রাঘাত করার পর কোন সন্যাসীর আশ্রমে দিয়ে আসতে হবে এবং তার স্বামীকে এ অধিকার দেয়া হয় যে, সে চাইলে দু'বছর পর তাকে সেখান থেকে বের করে আনতে পারে অন্যথায় সারা জীবন সেখানে ফেলে রাখতে পারে।

ইহুদী আইনে পরস্ত্রীর সাথে যিনা সম্পর্কে যে বিধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

"আর মূল্য দ্বারা কিম্বা অন্যরূপে মুক্তা হয় নাই, এমন যে বাগদত্তা দাসী, তাহার সহিত যদি কেহ সংগম করে, তবে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে; তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কেননা সে মুক্তা নহে।" (লেবীয় পুস্তক ১৯ ঃ ১৭)

"আর যে ব্যক্তি পরের ভার্যার সহিত ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর ভার্যার সহিত ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী, উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।" (লেবীয় পুস্তক ২০ ঃ ১০)

"কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়নকালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২২ ঃ ২২)

"যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগদত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে, সেই কন্যাকে বধ করিবে, কেননা, নগরের মধ্যে থাকিলেও সে চীৎকার করে নাই, এবং সেই পুরষকে বধ করিবে, কেননা, সে আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করিয়াছে ঃ এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে। কিন্তু যদি কোন পুরুষ বাগদত্তা কন্যাকে মাঠে পাইয়া বলপূর্বক তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ মাত্র হত হইবে, কিন্তু কন্যার প্রতি তুমি কিছুই করিবে না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২২ ঃ ২৩-২৬)

কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগের বহু পূর্বে ইহুদী উলামা, ফকীহ, শাসক ও জনতা সবাই এ আইন কার্যত রহিত করে দিয়েছিল। যদিও এ আইন বাইবেলে লিখিত ছিল এবং একেই আল্লাহর হুকুম মনে করা হতো কিন্তু কেউ এর কার্যত প্রচলনের পক্ষপাতি ছিল না। এমনকি এ হুকুমটি কখনো জারি করা হয়েছিল এমন কোন নজিরও ইহুদীদের ইতিহাসে পাওয়া যেতো না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন সত্যের দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হন এবং ইহুদী আলেমগণ দেখেন এ বন্যা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হচ্ছে না তখন তারা একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তারা এক ব্যভিচারিনীকে তাঁর কাছে ধরে আনেন এবং বলেন, এর ফায়সালা করে দিন। (যোহন ৮ঃ১-১১) এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল হযরত ঈসাকে কুয়া বা খাদ দু'টোর মধ্য থেকে কোন একটিতে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করা। যদি তিনি পাথর মেরে হত্যা (রজম) ছাড়া অন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করেন, তাহলে একথা বলে তাঁর দুর্নাম রটানো হবে যে, দেখো ইনি একজন অভিনব পয়গম্বর এসেছেন, দুনিয়ার ভয়ে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে ফেলেছেন। আর যদি 'রজম' করার হুকুম দেন, তাহলে একদিকে রোমীয় আইনের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়া হবে আর অন্যদিকে জাতিকে বলা হবে, এ পয়গম্বর সাহেবকে মেনে নাও, দেখে নাও একবার তাওরাতের পুরো শরীয়াত তোমাদের পিঠে ও জীবনের ওপর নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে তাদের কৌশল তাদের মাথার ওপর ছুঁড়ে মারেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে নিজে পাক-পবিত্র-ব্যভিচারমুক্ত সে এগিয়ে এসে এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করো। এ কথা শুনতেই ফকীহদের পুরো জমায়েত ফাঁকা হয়ে যায়। প্রত্যেকে মুখ লুকিয়ে কেটে পড়েন এবং আল্লাহর শরীয়াতের বাহকদের নৈতিক অবস্থা একেবারেই নগ্ন হয়ে ধরা পড়ে। তারপর যখন মেয়েটি একাকী দাঁড়িয়ে থাকে তখন তিনি তাকে নসীহত করেন

এবং তাওবা পড়িয়ে বিদায় করে দেন। কারণ তিনি বিচারক ছিলেন না। কাজেই তার মামলার ফায়সালা তিনি করতে পারতেন না। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষীও উপস্থাপিত হয়নি। সর্বোপরি আল্লাহর আইন জারি করার জন্য কোন ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

হযরত ঈসার এ ঘটনা এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তাঁর আরো কতিপয় বিক্ষিপ্ত বাণী থেকে ভুল যুক্তি সংগ্রহ করে ঈসায়ীরা যিনার অপরাধ সম্পর্কে অন্য একটি ধারণা তৈরী করে নিয়েছে। তাদের মতে অবিবাহিত পুরুষ যদি অবিবাহিত মেয়ের সাথে যিনা করে তাহলে এটা যিনা তো হবে ঠিকই কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না। আর যদি এ কর্মের পুরুষ বা নারী যে কোন এক পক্ষ বিবাহিত হয় অথবা উভয় পক্ষই হয় বিবাহিত, তাহলে এটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু একে অপরাধে পরিণত করে "চুক্তি ভংগ", নিছক যিনা নয়। তাদের মতে যে ব্যক্তিই বিবাহিত হবার পরও যিনা করে সে গীর্জায় পাদরীর সামনে নিজের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে যে বিশ্বস্ততার অংগীকার ও চুক্তি করেছিল তা ভংগ করে ফেলেছে তাই সে অপরাধী। কিন্তু এ অপরাধের এ ছাড়া আর কোন শাস্তি নেই যে, যিনাকারী পুরুষের স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার দাবী করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভ করতে পারবে এবং যিনাকারী স্ত্রীর স্বামী একদিকে নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার দাবী করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভ করতে পারবে এবং অন্যদিকে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খারাপ করেছে তার কাছ থেকে অর্থদণ্ড লাভ করার অধিকার রাখে। খৃষ্টীয় আইন বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে এ শাস্তিই দিয়ে থাকে। আর সর্বনাশের ব্যাপার হচ্ছে, এ শাস্তি দুধারি তলোয়ারের মতো। যদি কোন স্ত্রী তার বিশ্বাসঘাতক স্বামীর বিরুদ্ধে "অবিশ্বস্ততার" দাবী করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি হাসিল করে নেয়, তাহলে তো সে সেই বিশ্বাসঘাতক স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে কিন্তু খৃষ্টীয় আইন অনুযায়ী এরপর আর সে জীবনভর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। আর যে পুরুষটি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার দাবী এনে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছিল তার অবস্থাও তাই হবে। কারণ খৃষ্টীয় আইন তাকেও দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। এ যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে যে সারা জীবন যোগী হিসেবে থাকতে চাইবে নিজের জীবন সংগী বা সংগিনীর বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় আদালতে তার অবিশ্বস্ততার মামলা ঠুকে দিলেই চলবে।

বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য আইন-কানুন এসব বিচিত্র চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ মুসলিম দেশও আজ এসব আইনের ধারা অনুসরণ করে চলছে। এ পাশ্চাত্য আইনের দৃষ্টিতে যিনা করা একটি দোষ, নৈতিক চরিত্রহীনতা বা পাপ যাই কিছু হোক না কেন, মোটকথা এটা কোন অপরাধ নয়। একে যদি কোন জিনিস অপরাধে পরিণত করতে পারে তাহলে তা হচ্ছে এমন ধরনের বল প্রয়োগ যার সাহায্যে দ্বিতীয় পক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে যৌন ক্রিয়া করা হয়। আর কোন বিবাহিত পুরুষের যিনা করার ব্যাপারটি হচ্ছে, তা যদি অভিযোগের কারণ হয়ে থাকে তাহলে তা হয় তার স্ত্রীর জন্য। সে চাইলে তার প্রমাণ দিয়ে তালাক হাসিল করতে পারে। আর যিনার অপরাধী যদি হয় বিবাহিতা নারী, তাহলে তার স্বামীর কেবল তার বিরুদ্ধে নয় বরং যিনাকারী পুরুষের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দেখা দেয় এবং উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে সে স্ত্রী থেকে তালাক এবং যিনাকারী পুরুষ থেকে অর্থদণ্ড নিতে পারে।

তিন ঃ এসব চিন্তার বিপরীতে ইসলামী আইন স্বয়ং যিনাকেই একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করে এবং বিবাহিত হবার পরও যিনা করলে তার দৃষ্টিতে তা অপরাধের মাত্রা আরো বেশী বাড়িয়ে দেয়। এটা এ জন্য নয় যে, অপরাধী কারোর সাথে "চুক্তিভংগ" অথবা অন্য কারো বিছানায় হস্তক্ষেপ করেছে। বরং এ জন্য যে, তার নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূরণ করার জন্য একটি বৈধ মাধ্যম ছিল এবং এরপরও সে অবৈধ মাধ্যম অবলম্বন করেছে। ইসলামী আইন যিনাকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা হচ্ছে এই যে, এটি এমন একটি কর্ম যাকে স্বাধীনভাবে করার সুযোগ দেয়া হলে একদিকে মানব বংশধারা এবং অন্যদিকে তার সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে। বংশধারার স্থায়িত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা উভয়ের জন্য নারী ও পুরুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র আইন অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অপরিহার্য। আর তার সাথে সাথে যদি অবাধ যৌন সম্পর্কেরও খোলাখুলি অবকাশ থাকে তাহলে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। কারণ গৃহ ও পরিবারের দায়িত্বের বোঝা বহন করা ছাড়া যেখানে লোকদের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার সুযোগ থাকে সেখানে তাদের থেকে আশা করা যেতে পারে না যে, সেসব প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার জন্য তারা আবার এত বড় দায়িত্বের বোঝা বহন করতে উদ্যত হবে। এটা ঠিক বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের স্বাধীনতা থাকার পর রেল গাড়িতে বসার জন্য টিকিটের শর্ত অর্থহীন হয়ে যাওয়ার মতো। টিকিটের শর্ত যদি অপরিহার্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে কার্যকর করার জন্য বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। তারপর যদি কোন ব্যক্তি পয়সা না থাকার কারণে বিনা টিকিটে সফর করে তাহলে সে অপেক্ষাকৃত কম পর্যায়ের অপরাধী হবে এবং ধানাঢ্য হবার পরও এ অপরাধ করলে তার অপরাধ আরো কঠিন হয়ে যায়।

চার ঃ ইসলাম মানব সমাজকে যিনার আশংকা থেকে বাঁচাবার জন্য শুধুমাত্র দণ্ডবিধি আইনের অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে না বরং তার জন্য ব্যাপক আকারে সংস্কার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। আর এ দণ্ডবিধি আইনকে নির্ধারণ করেছে নিছক একটি শেষ উপায় হিসেবে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, লোকেরা এ অপরাধ করে যেতেই থাকুক এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করার জন্য দিনরাত তাদের ওপর নজর রাখা হোক। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা যেন এ অপরাধ না করে এবং কাউকে শাস্তি দেবার সুযোগই না পাওয়া যায়। সে সবার আগে মানুষের প্রবৃত্তির সংশোধন করে। তার মনের মধ্যে বসিয়ে দেয় অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ভয়। তার মধ্যে আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। মরেও মানুষ এ হাত থেকে বাঁচতে পারে না। তার মধ্যে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। এটি হচ্ছে ঈমানের অপরিহার্য দাবী। আর তারপর বারবার তাকে এ মর্মে সতর্ক করে যে, যিনা ও সতীত্বহীনতা এমন বড় বড় গোনাহর অন্তরভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সমগ্র কুরআনে বারবার এ বিষয়বস্তু সামনে আসতে থাকে। তারপর ইসলাম মানুষের জন্য বিয়ের যাবতীয় সম্ভাব্য সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এক স্ত্রীতে তৃপ্ত না হলে চারটি পর্যন্ত বৈধ স্ত্রী রাখার সুযোগ করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল না হলে স্বামীর জন্য তালাক ও স্ত্রীর "খুলা"র সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আর অমিলের সময় পারিবারিক সালিশ থেকে শুরু করে সরকারী আদালতে পর্যন্ত আপীল করার পথ খুলে দেয়, এর ফলে দু'জনের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে আর নয়তো স্বামী-স্ত্রী

পরস্পরের বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজেদের ইচ্ছা মতো অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারে। এসব বিষয় সূরা বাকারাহ, সূরা নিসা ও সূরা তালাকে দেখা যেতে পারে। আর এ সূরা নূরেও দেখা যাবে পুরুষ ও নারীকে বিয়ে না করে বসে থাকাকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং এ ধরনের লোকদের বিয়ে করিয়ে দেবার এমনকি গোলাম ও বাঁদীদেরকেও অবিবাহিত করে না রাখার জন্য পরিষ্কার হুকুম দেয়া হয়েছে।

তারপর ইসলাম সমাজ থেকে এমন সব কার্যকারণ নির্মূল করে দেয় যেগুলো যিনার আগ্রহ ও তার উদ্যোগ সৃষ্টি করে এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে পারে। যিনার শাস্তি বর্ণনা করার এক বছর আগে সূরা আহযাবে মেয়েদেরকে গৃহ থেকে বের হতে হলে চাদর মুড়ি দিয়ে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হুকুম দেয়া হয়েছিল। মুসলমান মেয়েদের জন্য যে নবীর গৃহ ছিল আদর্শ গৃহ সেখানে বসবাসকারী মহিলাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, নিজেদের গৃহ মধ্যে মর্যাদা ও প্রশান্তি সহকারে বসে থাকো, নিজেদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে বেড়িও না এবং বাইরের পুরুষরা তোমাদের থেকে কোন জিনিস নিলে যেন পরদার আড়াল থেকে নেয়। দেখতে দেখতে এ আদর্শ সমস্ত মু'মিন মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কাছে জাহেলী যুগের নির্লজ্জ মহিলারা নয় বরং নবীর (সা) স্ত্রী ও কন্যাগণই ছিলেন অনুসরণযোগ্য। অনুরূপভাবে ফৌজদারী আইনের শাস্তি নির্ধারণ করার আগে নারী ও পুরুষের অবাধ মিশ্রিত সামাজিকতা বন্ধ করা হয়, নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া বন্ধ করা হয় এবং যে সমস্ত কার্যকারণ ও উপায়–উপকরণ যিনার সুযোগ–সুবিধা তৈরী করে দেয় সেগুলোর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এসবের পরে যখন যিনার ফৌজদারী তথা অপরাধমূলক শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন দেখা যায় এর সাথে সাথে এ সূরা নূরেই অশ্লীলতার সম্প্রসারণেও বাধা দেয়া হচ্ছে। পতিতাবৃত্তিকে (Prostitution) আইনগতভাবে বন্ধ করা হচ্ছে। নারী ও পুরুষদের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া এবং তার আলোচনা করার জন্যও কঠোর শাস্তির বিধান দেয়া হচ্ছে। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার হুকুম দিয়ে চোখকে প্রহরাধীন রাখা হচ্ছে, যাতে দৃষ্টি বিনিময় সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কামচর্চায় পৌছুতে না পারে। এ সংগে নারীদেরকে নিজেদের ঘরে মাহ্‌রাম ও গায়ের মাহ্‌রাম আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য করার এবং গায়ের মাহ্‌রামদের সামনে সেজেগুজে না আসার হুকুম দেয়া হচ্ছে। এ থেকে যে সংস্কার পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে যিনার আইনগত শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তার সমগ্র অবয়বটি অনুধাবন করা যেতে পারে। ভিতর–বাইরের যাবতীয় সংশোধন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যেসব দুষ্ট প্রকৃতির লোক প্রকাশ্য বৈধ সুযোগ বাদ দিয়ে অবৈধ পথ অবলম্বন করে নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার ওপর জোর দেয় তাদেরকে চরম শাস্তি দেবার এবং একজন ব্যভিচারীকে শাস্তি দিয়ে সমাজের এ ধরনের প্রবৃত্তির অধিকারী বহু সংখ্যক লোকের মানসিক অপারেশন করার জন্যই এ শাস্তি। এ শাস্তি নিছক একজন অপরাধীর শাস্তি নয় বরং এটি একটি কার্যকর ঘোষণা যে, মুসলিম সমাজ ব্যভিচারীদের অবাধ বিচরণস্থল নয় এবং এটি স্বাদ আস্বাদনকারী পুরুষ ও নারীদের নৈতিক বাঁধন মুক্ত হয়ে যথেচ্ছা আমোদ ফূর্তি করার জায়গাও নয়। এ দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি ইসলামের এ সংস্কার পরিকল্পনা অনুধাবন করতে চাইলে সহজে অনুভব করেন যে, এ সমগ্র পরিকল্পনার একটি অংশকেও তার নিজের জায়গা থেকে সরানো যেতে পারে না এবং এর মধ্যে কোন কমবেশীও করা যেতে পারে

না। এর মধ্যে রদবদল করার চিন্তা করতে পারে এমন একজন অজ্ঞ–নাদান, যে একে অনুধাবন করার যোগ্যতা ছাড়াই এর সংশোধনকারী ও সংস্কারক হয়ে বসেছে অথবা মহাজ্ঞানী আল্লাহ যে উদ্দেশে এ পরিকল্পনাটি দিয়েছেন তা পরিবর্তন করাই যার আসল নিয়ত এমন একজন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীই এ চিন্তা করতে পারে।

পাঁচ ঃ তৃতীয় হিজরীতেই তো যিনাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এটি একটি আইনগত অপরাধ ছিল না। রাষ্ট্রীয় পুলিশ ও বিচার বিভাগ এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতো না। বরং তখন এটি ছিল একটি "সামাজিক" বা "পারিবারিক" অপরাধ। পরিবারের লোকদেরই এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ইখতিয়ার ছিল। হুকুম ছিল, যদি চার জন সাক্ষী এই মর্মে সাক্ষ দেয় যে, তারা একটি পুরুষ ও একটি মেয়েকে যিনা করতে দেখেছে তাহলে তাদের দু'জনকে মারধর করতে হবে এবং মেয়েটিকে গৃহবন্দী করতে হবে। এ সংগে এ ইশারাও করে দেয়া হয়েছিল যে, "পরবর্তী হুকুম" না দেয়া পর্যন্ত এ হুকুমটি জারি থাকবে। আসল আইন পরে আসছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসা, ১৫ ও ১৬ আয়াত এবং এ সংগে টীকাও) এর আড়াই তিন বছর পর সূরা নূরের এ আয়াত নাযিল হয়। কাজেই এটি আগের হুকুম রহিত করে যিনাকে একটি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যোগ্য (Cognizable Offence) আইনগত অপরাধ গণ্য করে।

ছয় ঃ এ আয়াতে যিনার যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তা আসলে "নিছক যিনা"র শাস্তি, বিবাহিতের যিনার শাস্তি নয়। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ বিবাহিতের যিনা কঠিনতর অপরাধ। একথা কুরআনের একটি ইশারা থেকে জানা যায় যে, সে এখানে এমন একটি যিনার শাস্তি বর্ণনা করছে যার উভয় পক্ষ অবিবাহিত। সূরা নিসায় ইতিপূর্বে বলা হয় ঃ

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ .... اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا٥

"তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচারের অপরাধ করবে তাদের ওপর তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চার জনের সাক্ষ নাও। আর যদি তারা সাক্ষ দিয়ে দেয় তাহলে এরপর তাদেরকে (অপরাধী নারীদেরকে) ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে দাও, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য বের করে দেন কোন পথ।" (১৫ আয়াত)

এরপর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বলা হয় ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ... ... فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিনদের মধ্য থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না, তারা তোমাদের মু'মিন বাঁদীদেরকে বিয়ে করবে। ....তারপর যদি (ঐ বাঁদীরা) বিবাহিত হয়ে যাবার পর ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি (এ ধরনের অপরাধে) স্বাধীন নারীদের তুলনায় অর্ধেক দিতে হবে। (২৫ আয়াত)

এর মধ্যে প্রথম আয়াতে আশা দেয়া হয়েছে যে, ব্যভিচারিনীদের জন্য, যাদেরকে আপাতত বন্দী করার হুকুম দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ পরে কোন পথ বের করে দেবেন। এ থেকে জানা যায়, সূরা নিসার ওপরে উল্লেখিত আয়াতে যে ওয়াদা করা হয়েছিল এ দ্বিতীয় হুকুমটির মাধ্যমে সে ওয়াদা পূরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে বিবাহিতা বাঁদীর যিনার শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একই আয়াতে এবং একই বর্ণনা ধারায় দু'বার "মুহ্সানাত" তথা স্বাধীন নারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর উভয় জায়গায়ই এর অর্থ একই, একথা অবশ্য মানতেই হবে। এবার শুরুর দিকের বাক্যাংশ দেখুন। সেখানে বলা হচ্ছে, যারা "মুহ্সানাতদের" বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না। অবশ্যই এখানে "মুহসানাত" মানে বিবাহিতা নারী হতে পারে না বরং এর মানে হতে পারে, একটি স্বাধীন পরিবারের অবিবাহিতা নারী। তারপর শেষের বাক্যাংশে বলা হচ্ছে, বাঁদী বিবাহিতা হবার পর যদি যিনা করে, তাহলে এ অপরাধে মুহসানাতের যে শাস্তি হওয়া উচিত তার শাস্তি হবে তার অর্ধেক। পরবর্তী আলোচনা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, প্রথম বাক্যাংশে "মুহ্সানাত" অর্থ যা ছিল এ বাক্যাংশেও তার অর্থ সে একই অর্থাৎ বিবাহিতা নারী নয় বরং স্বাধীন পরিবারে লালিতা পালিতা অবিবাহিতা নারী। এভাবে সূরা নিসার এ দু'টি আয়াত একত্র হয়ে এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে যে, সেখানে অবিবাহিতাদের যিনার শাস্তির কথা বর্ণনার যে ওয়াদা করা হয়েছিল সূরা নূরের এ হুকুমটি সে কথাই বর্ণনা করছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৪৬ টীকা)।

সাত ঃ বিবাহিতের যিনার শাস্তি কি, একথা কুরআন মজীদ থেকে নয় বরং হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল মুখেই এর শাস্তি রজম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু) বর্ণনা করেননি বরং কার্যত বহু সংখ্যক মোকদ্দমায় তিনি এ শাস্তি জারিও করেন। তাঁর পরে চার খোলাফায়ে রাশেদীনও নিজ নিজ যুগে এ শাস্তি জারি করেন এবং আইনগত শাস্তি হিসেবে বারবার এরি ঘোষণা দেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ছিলেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। কোন এক ব্যক্তিরও এমন একটি উক্তি পাওয়া যায় না যা থেকে একথা প্রমাণ হতে পারে যে, প্রথম যুগে এর প্রমাণিত শরয়ী' হুকুম হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল। তাঁদের পরে সকল যুগের ও দেশের ইসলামী ফকীহগণ এর একটি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত হবার ব্যাপারে একমত ছিলেন। কারণ এর নির্ভুলতার সপক্ষে এত বিপুল সংখ্যক ও শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে যার উপস্থিতিতে কোন তত্বজ্ঞানী একথা অস্বীকার করতে পারেন না। উম্মতে মুসলিমার সমগ্র ইতিহাসে খারেজী ও কোন কোন মুতাযিলা ছাড়া কেউই একথা অস্বীকার করেননি। খারেজী ও মুতাযিলাদের অস্বীকৃতির কারণ এটা নয় যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। বরং তারা একে কুরআন বিরোধী গণ্য করতেন। অথচ এটি ছিল তাঁদের নিজেদের কুরআন অনুধাবনের ত্রুটি। তাঁরা বলতেন, কুরআন الزانـى والزانـيـة এর একচ্ছত্র শর্তহীন শব্দ ব্যবহার করে এর শাস্তি বর্ণনা করে একশ' বেত্রাঘাত। কাজেই কুরআনের দৃষ্টিতে সকল প্রকার ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর শাস্তি এটিই এবং এ থেকে বিবাহিত ব্যভিচারীকে পৃথক করে তার জন্য কোন ভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা করা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাঁরা এ কথা চিন্তা করেননি যে, কুরআনের শব্দাবলীর যে আইনগত গুরুত্ব রয়েছে সে একই

গুরুত্বের অধিকারী হচ্ছে তাদের উদ্ধৃত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যাও। তবে এখানে শর্ত শুধু হচ্ছে এই যে, এ ব্যাখ্যা যে তাঁরই একথা প্রমাণিত হতে হবে। কুরআন এ ধরনেরই ব্যাপক ও একচ্ছত্র অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে السارق والسارقة তথা পুরুষ চোর ও মেয়ে চোরের শাস্তি হিসেবে হাত কাটার বিধান দিয়েছে। এ বিধানকেও যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রমাণিত ব্যাখ্যাসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন না করা হয় তাহলে এর শব্দাবলীর ব্যাপকতার দাবী হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি সামান্য একটি সুঁই বা কুল চুরি করলেও তাকে চোর আখ্যা দিয়ে তার হাতটি একেবারে কাঁধের কাছ থেকে কেটে দেয়া হবে। অন্যদিকে লাখ লাখ টাকা চুরি করার পরও যদি এক ব্যক্তি পাকড়াও হয়ে বলে, আমি নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছি এবং ভবিষ্যতে আমি আর চুরি করবো না, চুরি থেকে আমি তাওবা করে নিলাম তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যি ছেড়ে দিতে হবে। কারণ কুরআন বলছে ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি জুলুম করার পরে তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেন।" (মা-য়েদাহ, ৩৯)

এভাবে কুরআন শুধুমাত্র দুধ–মা ও দুধ বোনকে বিয়ে করা হারাম ঘোষণা করেছে, দুধ–কন্যাকে বিয়ে এ যুক্তির প্রেক্ষিতে কুরআন বিরোধী হওয়া উচিত। কুরআন কেবলমাত্র দুই বোনকে এক সংগে বিয়ে করা নিষেধ করেছে। খালা–ভাগনী এবং ফুফী–ভাইঝিকে একত্রে বিয়ে করাকে যে ব্যক্তি হারাম বলে তার বিরুদ্ধে কুরআন বিরোধী হুকুম দিচ্ছে বলে অভিযোগ আনতে হবে। কুরআন সৎ–মেয়েকে বিয়ে করা শুধুমাত্র তখনই হারাম করে যখন সে তার সৎ–পিতার ঘরে প্রতিপালিত হয়। শর্তহীন ও একচ্ছত্রভাবে এর হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআন বিরোধী গণ্য হওয়া উচিত। কুরআন শুধুমাত্র এমন অবস্থায় 'রেহেন' রাখার অনুমতি দেয় যখন মানুষ বিদেশে সফররত থাকে এবং ঋণ সংক্রান্ত দলিলপত্র লেখার লোক পাওয়া না যায়। দেশে অবস্থানকালে এবং দলিলপত্র লেখার লোক পাওয়া গেলে এ অবস্থায় রেহেন রাখার বৈধতা কুরআন বিরোধী হওয়া উচিত। কুরআন সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে হুকুম দেয় ঃ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে কেনাবেচা করার সময় সাক্ষী রাখো)।

এ প্রেক্ষিতে আমাদের হাটে–বাজারে–দোকানে দিনরাত বিনা সাক্ষী প্রমাণে যেসব কেনাবেচা হচ্ছে সেসবই অবৈধ হওয়া উচিত। এখানে গুটিকয় মাত্র দৃষ্টান্ত পেশ করলাম। এগুলোর ওপর চোখ বুলালে রজম তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডকে যারা কুরআন বিরোধী বলেন, তাদের যুক্তির গলদ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। শরীয়াতী ব্যবস্থায় নবীর দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি আমাদের কাছে আল্লাহর হুকুম পৌঁছিয়ে দেবার পর আমাদের জানাবেন তার অর্থ কি, তা কার্যকর করার পদ্ধতি কি, কোন্ কোন্ বিষয়ে তা প্রযোজ্য হবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রযোজ্য হবে না। ইসলামী শরীয়াতে নবীর এ মর্যাদা অনস্বীকার্য। নবীর এ মর্যাদা ও পদাধিকার অস্বীকার করা শুধুমাত্র দীনের মূলনীতিরই অস্বীকার নয় বরং এর ফলে অগণিত বাস্তব ত্রুটিও দেখা দেয়।

আট ঃ যিনার আইনগত সংজ্ঞা নির্দেশের ক্ষেত্রে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণ এর সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন, কোন পুরুষের এমন কোন নারীর সাথে সম্মুখ

দ্বার দিয়ে সংগম করা যে তার বিয়ে করা স্ত্রী বা মালিকানাধীন বাঁদী নয় এবং যাকে বিবাহিতা স্ত্রী বা মালিকানাধীন বাঁদী মনে করে সংগম করেছে বলে সন্দেহ পোষণ করার কোন যুক্তিসংগত কারণও যেখানে নেই।" এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে পশ্চাদ্বারে সংগম, লূতের সম্প্রদায়ের কর্ম, পশুর সাথে সংগম ইত্যাদির ওপর যিনার অর্থ প্রযোজ্য হয় না। শুধুমাত্র যখন শরীয়াতে সুস্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট অধিকার ছাড়া নারীর সাথে সম্মুখদ্বার দিয়ে সংগম করা হয় তখনই তা যিনা হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিপরীত পক্ষে শাফেঈগণ এর সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেন, "লজ্জাস্থানকে এমন লজ্জাস্থানে প্রবেশ করানো যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে যেদিকে আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে।" আর মালেকীদের মতে এর সংজ্ঞা হচ্ছে, "শরীয়াত নির্ধারিত সুস্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট অধিকার ছাড়া সম্মুখদ্বার বা পশ্চাদ্বার দিয়ে পুরুষ বা নারীর সাথে সংগম করা" এ দু'টি সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে লূতের জাতির কর্মও যিনার অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, এ দু'টি সংজ্ঞাই যিনা শব্দের পরিচিত ব্যাখ্যার বাইরে পড়ে। কুরআন সবসময় শব্দকে তার পরিচিত ও সাধারণের জন্য সহজবোধ্য অর্থে ব্যবহার করে থাকে। তবে কখনো আবার সে কোন শব্দকে তার বিশেষ পরিভাষায় পরিণত করে এবং এ অবস্থায় সে নিজেই তার বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এখানে যিনা শব্দটিকে কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করার কোন লক্ষণ নেই। কাজেই একে পরিচিত অর্থেই গ্রহণ করা হবে। আর এ অর্থটি নারীর সাথে স্বাভাবিক কিন্তু অবৈধ সম্পর্ক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যৌন কামনা চরিতার্থ করার অন্যান্য উপায় ও অবস্থা পর্যন্ত এটি বিস্তৃত নয়। এ ছাড়া একথাও সবার জানা যে, লূতের জাতির কুকর্ম তথা সমকামের শাস্তির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। এ কর্মটিকেও যদি ইসলামী পরিভাষার দৃষ্টিতে যিনার মধ্যে শামিল করা হতো তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে, এ ক্ষেত্রে মতবিরোধের কোন অবকাশই থাকতো না।

নয় ঃ আইনগতভাবে একটি যিনা কর্মকে শাস্তিযোগ্য গণ্য করার জন্যে কেবলমাত্র পুরুষাংগের অগ্রভাগ প্রবেশ করানোটাই যথেষ্ট, সম্পূর্ণ প্রবেশ বা ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া এ জন্য জরুরী নয়। পক্ষান্তরে যদি পুরুষাংগ প্রবেশ না করে, তাহলে নিছক এক বিছানায় দু'জনকে পাওয়া অথবা জড়াজড়ি করতে দেখা কিংবা উলংগ অবস্থায় পাওয়া কাউকে যিনাকারী গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়। আবার কোন দু'জন নারী পুরুষকে এ অবস্থায় পেলে তাদের ডাক্তারী পরীক্ষা করার মাধ্যমে যিনার প্রমাণ পেশ করে তাদের বিরুদ্ধে যিনার শাস্তি প্রয়োগ করার কথাও ইসলামী শরীয়াত বলে না। যাদেরকে এ ধরনের অশ্লীল কাজে লিপ্ত পাওয়া যাবে তাদেরকে নিছক এমন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার ফায়সালা করবেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের বিচারপতি নিজেই অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা তাদের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করবেন। এ শাস্তি বেত্রাঘাতের আকারে হলে তা দশ ঘা'র বেশী হবে না। কারণ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে ঃ

لا يجلد فوق عشر جلدات الا فى حد من حدود الله

"আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি ছাড়া অন্য যে কোন অপরাধে দশ বেত্রাঘাতের বেশী শাস্তি দিয়ো না।" (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

আর যদি কোন ব্যক্তি পাকড়াও হয়নি বরং নিজেই লজ্জিত হয়ে এ ধরনের কোন অপরাধের কথা স্বীকার করে, তাহলে তার জন্য শুধুমাত্র তাওবা করার নির্দেশ দেয়াই

যথেষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বললেন ঃ "নগরের বাইরে আমি একটি নারীর সাথে সংগম ছাড়া সবকিছু করে ফেলেছি। এখন জনাব আপনি আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দিন।" হযরত উমর (রা) বললেন ঃ "আল্লাহ যখন গোপন করে দিয়েছিলেন তখন তুমিও গোপন থাকতে দিতে।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু শোনার পর নীরব থাকলেন এবং সে ব্যক্তি চলে গেলেন। তারপর তিনি তাকে ফিরিয়ে আনলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন ঃ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

"নামায কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে এবং কিছু রাত অতিক্রান্ত হবার পর। অবশ্যই সৎকাজ অসৎকাজগুলোকে দূর করে দেয়।" (হূদ, ১১৪)

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি শুধু তারই জন্য" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "না, সবার জন্য।" (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী) শুধু এতটুকুই নয়, কোন ব্যক্তি অপরাধের বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে না দিয়ে যদি নিজের অপরাধী হবার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে এ অবস্থায় অনুসন্ধান চালিয়ে সে কি অপরাধ করেছে তা জানতে চাওয়াটাও শরীয়াত বৈধ করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি দণ্ডলাভের অধিকারী হয়ে গেছি, আমাকে শাস্তি দিন।" কিন্তু তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন না, তুমি কোন্ দণ্ডলাভের অধিকারী হয়েছো? তারপর নামায শেষ হবার পর ঐ ব্যক্তি আবার উঠে বললেন, "আমি অপরাধী, আমাকে শাস্তি দিন।" রসূলল্লুাহ (সা) বললেন, "তুমি কি এখনি আমাদের সাথে নামায পড়নি?" জবাব দিলেন, "জি হাঁ"। বললেন, "ব্যস, তাহলে আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ)

দশ ঃ কোন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য কেবলমাত্র সে যিনা করেছে এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং এ জন্য অপরাধীর মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে। নিছক যিনার ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো এক ধরনের এবং বিবাহিতের যিনার ক্ষেত্রে এগুলো আবার ভিন্ন ধরনের।

নিছক যিনার ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো হচ্ছে, অপরাধী হবে জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক। যদি কোন বুদ্ধিভ্রষ্ট পাগল বা শিশু এ কর্ম করে তাহলে তার ওপর যিনার শাস্তি প্রযুক্ত হবে না।

বিবাহিতের যিনার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন হবার সাথে সাথে আরো কয়েকটি শর্তও রয়েছে। নিচে আমি এগুলো বর্ণনা করছি ঃ

প্রথম শর্ত হচ্ছে, অপরাধীকে স্বাধীন হতে হবে। এ শর্তটির ব্যাপারে সবাই একমত। কারণ কুরআন নিজেই ইংগিত করছে, গোলামকে রজমের শাস্তি দেয়া যাবে না। একটু আগেই একথা আলোচনা হয়েছে যে, বাঁদী যদি বিয়ের পর যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে অবিবাহিতা স্বাধীন নারীর তুলনায় অর্ধেক শাস্তি দেয়া উচিত। ফকীহগণ স্বীকার করেছেন কুরআনের এ বিধানটিই গোলামের ওপরও প্রযুক্ত হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, অপরাধীকে যথারীতি বিবাহিত হতে হবে। এ শর্তটির ব্যাপারেও সবাই একমত। আর এ শর্তটির প্রেক্ষিতে যে ব্যক্তি নিজের বাঁদীর সাথে যৌন সম্পর্ক

করেছে অথবা যার বিয়ে হয়েছে কোন গর্হিত পদ্ধতিতে, তাকে বিবাহিত গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ সে যদি যিনা করে তাহলে তাকে রজম নয় বরং বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে।

তৃতীয় শর্তটি হচ্ছে, তার নিছক বিয়েই যথেষ্ট নয় বরং বিয়ের পর সঠিক অর্থে স্বামী–স্ত্রীর নিভৃত মিলনও হতে হবে। নিছক বিবাহ অনুষ্ঠান কোন পুরুষকে বিবাহিত এবং কোন নারীকে বিবাহিতা করে না যার ফলে যিনা করার কারণে তাদেরকে রজম করা যেতে পারে। এ শর্তটির ব্যাপরেও অধিকাংশ ফকীহ একমত। তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর মধ্যে আরো এতটুকু সংযোজন করেন যে, একজন পুরুষ ও নারীকে কেবলমাত্র তখনই বিবাহিত গণ্য করা হবে যখন বিয়ে ও নিভৃত মিলনের সময় স্বামী স্ত্রী উভয়ই স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হবে। এ অতিরিক্ত শর্তের ফলে যেটুকু পার্থক্য দেখা দেয় তা হচ্ছে এই যে, যদি একটি পুরুষের বিয়ে একটি বাঁদী, উন্মাদ বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সাথে হয় তাহলে এ অবস্থায় সে নিজের স্ত্রীর সাথে নিভৃত মিলনের স্বাদ গ্রহণ করলেও এরপর যদি সে যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে রজমের শাস্তিলাভের অধিকারী হবে না। নারীর ব্যাপারেও এই একই কথা। সে তার গোলাম, উন্মাদ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্বামীর সাথে যৌন মিলনের স্বাদ গ্রহণ করলেও এর পরে যদি সে যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে রজমের শাস্তি লাভের অধিকারী হবে না। ভেবে দেখলে বুঝা যাবে, এই দু'জন বিচক্ষণ প্রতিভাবান ইমামের এই বর্ধিত শর্তটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত।

চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে, অপরাধীকে মুসলমান হতে হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আহমাদ এ শর্তটি মানেন না। তাঁদের মতে অমুসলিমও যদি বিয়ে করার পর যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে রজম করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক এ বিষয়ে একমত যে, একমাত্র মুসলমানকেই বিয়ে করার পর যিনায় লিপ্ত হলে রজমের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এর যেসব যুক্তি তাঁরা দেখিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে সংগত ও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হচ্ছে, এক ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে এই যে, সে পূর্ণ "বিবাহিত" অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও যিনা থেকে বিরত হয় না। বিবাহিত মানে হচ্ছে "নৈতিক দূর্গ পরিবেষ্টিত।" আর তিনটি প্রাচীর এ পরিবেষ্টনকে পূর্ণতা দান করে। প্রথম প্রাচীর হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। আখেরাতের জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং আল্লাহর শরীয়াতকে স্বীকার করতে হবে। দ্বিতীয় প্রাচীর হচ্ছে, তাকে সমাজের স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। সে কারোর গোলাম হবে না। কারণ মালিকের বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে নিজের কামনা পূর্ণ করতে গিয়ে তাকে বৈধ উপায় অবলম্বনে বাধা পেতে হয় এবং এর ফলে অক্ষমতা তাকে গোনাহে লিপ্ত করতে পারে। কোন পরিবারও তার চরিত্র ও মান–সম্মান রক্ষায় সাহায্যকারী হয় না। আর তৃতীয় প্রাচীর হচ্ছে তার বিয়ে হয়ে গেছে এবং নিজের কামনা পূর্ণ করার বৈধ উপায় তার করায়ত্ত আছে। এ তিনটি প্রাচীরের অস্তিত্ব যখন বিদ্যমান থাকে তখনই "দূর্গ পরিবেষ্টন" পূর্ণতা লাভ করে এবং তখনই যে ব্যক্তি অবৈধ যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের তিন তিনটি প্রাচীর ভেংগে ফেলে সে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু বরণের যোগ্য গণ্য হতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রথম ও সবচেয়ে বড় প্রাচীর অর্থাৎ আল্লাহ, পরকাল ও আল্লাহর আইনের প্রতি বিশ্বাসই উপস্থিত নেই সেখানে নিশ্চিতভাবেই দূর্গ পরিবেষ্টন পূর্ণতা লাভ করেনি এবং এ কারণে

চরিত্রহীনতার অপরাধ এমন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায়নি যা তাকে চরম শাস্তির অধিকারী করে। ইসহাক ইবনে রাহাওয়াহ তাঁর মুসনাদে এবং দারুকুত্নী তাঁর সুনান গ্রন্থে ইবনে উমরের (রা) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি এ যুক্তিকে সমর্থন করে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে من اشرك بالله فليس بمحصن "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করেছে সে 'মুহসিন' নয়।" যদিও এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন, না নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে মত বিরোধ আছে কিন্তু এ দুর্বলতা সত্ত্বেও মূল অর্থের দিক দিয়ে এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত শক্তিশালী। এর জবাবে যদি ইহুদীদের একটি মোকদ্দমা থেকে যুক্তি পেশ করা হয় যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজম করার বিধান প্রয়োগ করেছিলেন, তাহলে আমি বলবো, এ যুক্তি সঠিক নয়। কারণ ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কিত সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস একত্র করলে পরিষ্কার জানা যায় যে, সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর ইসলামের প্রচলিত আইন (Law of the Land) নয়, তাদের নিজেদের ধর্মীয় আইন (Personal law) প্রয়োগ করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম একযোগে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন এ মোকদ্দমা রসূলের কাছে আনা হলো তখন তিনি ইহুদীদের জিজ্ঞেস করলেন : ما تجدون فى التوراة فى شان الرجم يا ما تجدون فى كتابكم অর্থাৎ "তোমাদের নিজেদের কিতাব তাওরাতে এর কি বিধান প্রদত্ত হয়েছে?" তারপর যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তাদের সমাজে রজমের বিধান আছে তখন তিনি বললেন : فانى احكم بما فى التوراة "আমি সেই ফায়সালা দিচ্ছি যা তাওরাতে আছে।" অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এ মোকদ্দমার ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেন : اللهم انى اول من احيا امرك اذا ماتوه "হে আল্লাহ! আমি প্রথম ব্যক্তি যে তোমার হুকুমকে জীবিত করেছে যখন তারা তাকে মেরে ফেলেছিল।" (মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ)

এগার : 'যিনাকারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য তার নিজের ইচ্ছায় কাজটি করাও জরুরী। জোর জবরদস্তি যদি কাউকে এ কাজ করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধীও নয় এবং শাস্তিরও যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে কেবল শরীয়াতের এ সাধারণ নিয়মই প্রযোজ্য হয় না যে, "বলপূর্বক কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানো হলে তার যাবতীয় দায়–দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত থাকে" বরং এ সূরায়ই সামনের দিকে গিয়ে কুরআন এমন মেয়েদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করছে যাদেরকে যিনা করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বলপূর্বক যিনা করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে বল প্রয়োগ করে যিনা করেছে তাকেই শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং যার ওপর বল প্রয়োগ করা হয়েছিল তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিরমিযী ও আবু দাউদের বর্ণনা হচ্ছে, জনৈকা মহিলা অন্ধকারের মধ্যে নামাযের জন্য বের হন। পথে এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে বলপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করে। তার চিৎকারে লোকেরা দৌড়ে এসে যিনাকারীকে ধরে ফেলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রজম করান এবং মহিলাটিকে মুক্তি দেন। বুখারীর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত উমরের (রা) খিলাফতকালে এক ব্যক্তি একটি মেয়ের সাথে জোরপূর্বক যিনা করে। তিনি লোকটিকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন এবং মেয়েটিকে ছেড়ে দেন। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে নারীদের ব্যাপারে আইনের

ক্ষেত্রে ঐকমত্য রয়েছে কিন্তু মতবিরোধ দেখা দিয়েছে পুরুষের ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম হাসান ইবনে সালেহ বলেন, পুরুষকেও যদি যিনা করতে বাধ্য করা হয় তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। ইমাম যুফার বলেন, তাকে মাফ করা হবে না। কারণ সে অংগ সঞ্চালন না করলে এ কর্মটি সংঘটিত হওয়াই সম্ভব নয় এবং তার অংগ সঞ্চালনই একথা প্রমাণ করে যে, তার নিজের যৌন কামনা এ কর্মের উদ্যোক্তা হয়েছিল। ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি সরকার বা তার কোন প্রশাসক কোন ব্যক্তিকে যিনা করতে বাধ্য করে থাকে তাহলে যিনাকারীকে শাস্তি দেয়া হবে না। কারণ যখন সরকারই অপরাধ করতে বাধ্য করছে তখন তার শাস্তি দেবার অধিকার থাকে না। কিন্তু যদি সরকার ছাড়া অন্য কেউ বাধ্য করে থাকে তাহলে যিনাকারীকে শাস্তি দেয়া হবে। কারণ নিজের যৌন কামনা ছাড়া অবশ্যই সে যিনা করতে পারে না এবং যৌন কামনা জোরপূর্বক সৃষ্টি করা যেতে পারে না। এ তিনটি বক্তব্যের মধ্যে প্রথম বক্তব্যটিই সবচেয়ে বেশী সঠিক। এর যুক্তি হচ্ছে, অংগ সঞ্চালন যৌন কামনার প্রমাণ হতে পারে কিন্তু সম্মতি ও মানসিক আকাংখার অপরিহার্য প্রমাণ নয়। মনে করুন, কোন জালেম এক শরীফ ব্যক্তিকে জোর পূর্বক গ্রেফতার করে বন্দী করে এবং তার সাথে একটি সুন্দরী মেয়েকেও উলংগ করে একই কামরায় আটকে রাখে। ঐ মেয়ের সাথে যিনায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে তাকে মুক্তি দেয় না। এ অবস্থায় যদি তারা দু'জন যিনায় লিপ্ত হয়ে যায় এবং ঐ জালেম ঘটনার চার জন সাক্ষীসহ তাদেরকে আদালতে হাযির করে, তাহলে তাদের বাস্তব অবস্থা উপেক্ষা করে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দান অথবা বেত্রাঘাত করার শাস্তি কি ন্যায়সংগত হবে? এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া যুক্তি ও বাস্তবতা–উভয়ের নিরিখেই সম্ভব যাতে যৌন কামনার উদ্রেক ঘটতে পারে কিন্তু মানুষের নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ তার সহযোগী হয় না। যদি কোন ব্যক্তিকে বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ রেখে তাকে পান করার জন্য শরাব ছাড়া আর কিছুই দেয়া না হয় এবং এ অবস্থায় সে শরাব পান করে, তাহলে নিছক এ যুক্তিতে কি তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে যে, তার জন্য তো অবশ্যই বাধ্যবাধকতার অবস্থা ছিল ঠিকই কিন্তু নিজের ইচ্ছা ছাড়া তো গলার মধ্য দিয়ে শরাবের তরল পদার্থ সে নীচের দিকে নামাতে পারতো না? অপরাধ ঘটার জন্য কেবলমাত্র ইচ্ছা থাকা যথেষ্ট নয় বরং এ জন্য স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োজন। যে ব্যক্তিকে জবরদস্তি এমন এক অবস্থার মুখোমুখি করানো হয় যার ফলে সে অপরাধ করার সংকল্প করতে বাধ্য হয়, সে কোন কোন অবস্থায় তো একেবারেই অপরাধী হয় না এবং কোন কোন অবস্থায় তার অপরাধ অতি সামান্যই হয়ে থাকে।

বারো ঃ ইসলামী আইন সরকার ছাড়া আর কাউকেই যিনাকারী ও যিনাকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয় না। সে আদালত ছাড়া আর কাউকেই তাদেরকে শাস্তি দেবার অধিকার দেয় না। আলোচ্য আয়াতে "তাদেরকে বেত্রাঘাত করো" শব্দাবলীর মাধ্যমে জনগণকে নয় বরং রাষ্ট্রীয় শাসকবৃন্দ ও বিচারপতিগণকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে উম্মতের সকল ফকীহ একমত। তবে গোলামদের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। তার প্রভু এ ব্যাপারে তাকে শাস্তি দিতে পারে কিনা এ প্রশ্নে সবাই একমত নয়। হানাফী মাযহাবের সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রভু গোলামকে শাস্তি দিতে পারে না। শাফেঈ ইমামগণ বলেন, তাদের সে ক্ষমতা আছে। আর মালেকীগণ বলেন, চুরির অপরাধে

প্রভু গোলামের হাত কাটার অধিকার রাখে না কিন্তু যিনা, সতীসাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও শরাব পানের শাস্তি দিতে পারে।

তেরো : ইসলামী আইন যিনার শাস্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ গণ্য করে। তাই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ওপর এ আইন জারি হবে। এ ব্যাপারে একমাত্র ইমাম মালেক ছাড়া সম্ভবত ইমামদের মধ্য থেকে আর কেউ দ্বিমত প্রকাশ করেননি। রজমের শাস্তি অমুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করার প্রশ্নে ইমাম আবু হানীফার যে মতবিরোধ তার ভিত্তি এ নয় যে, এটি রাষ্ট্রীয় আইন নয়। বরং এ মত বিরোধের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, তাঁর মতে রজমের শর্তাবলীর মধ্যে যিনাকারীর "পূর্ণ বিবাহিত" হওয়া হচ্ছে অন্যতম শর্ত। আর পূর্ণ বিবাহিত হওয়া ইসলাম ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তিনি অমুসলিম যিনাকারীকে রজমের শাস্তির আওতা বহির্ভূত গণ্য করেন, বিপরীত পক্ষে ইমাম মালেকের মতে এ হুকুমটি মুসলমানদের জন্য প্রদান করা হয়েছে, কাফেরদের জন্য নয়। তাই তিনি যিনার দণ্ডবিধিকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনের (Personal Law) একটি অংশ গণ্য করেন। আর অন্য দেশ থেকে দারুল ইসলামে অনুমতি নিয়ে আশ্রয় গ্রহণকারীর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেঈ বলেন, সে যদি দারুল ইসলামে যিনায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার ওপর যিনার দণ্ডবিধি জারি করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, আমরা তার ওপর যিনার দণ্ডবিধি জারি করতে পারি না।

চৌদ্দ : কোন ব্যক্তি নিজের অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করবে অথবা কারোর যিনার কথা যারা জানতে পারে তারা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে শাসকের কাছে অবশ্যই তা পৌঁছাবে, ইসলামী আইন এটা অপরিহার্য গণ্য করে না। তবে শাসকরা যখন এ অপরাধের কথা জানতে পারেন তখন আর সেখানে ক্ষমার কোন অবকাশ থাকে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ اَتَى شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ فَاِنْ اَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ اَقِمْنَا عَلَيْهِ كِتَابَ اللّٰهِ (احكام القران - للجصاص)

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এসব নোংরা অপরাধগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে যায়, সে যেন আল্লাহর পরদার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সে যদি আমাদের সামনে পরদা উঠায়, তাহলে আমরা তার ওপর আল্লাহর কিতাবের আইন প্রয়োগ করেই ছাড়বো।" (আহকামুল কুরআন–জাস্‌সাস)

আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, মাঈয ইবনে মালেক আস্‌লামী অপরাধে জড়িত হয়ে পড়লে হায্‌যাল ইবনে নু'আইম তাঁকে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করো। তাই তিনি গিয়ে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিজের অপরাধ বর্ণনা করেন। এর ফলে তিনি একদিকে তাকে রজমের শাস্তি দেন এবং অন্য দিকে হায্‌যালকে বলেন, لو سترته بثوبك كان خيرا لك "যদি তুমি তার ওপর পরদা ফেলে দিতে, তাহলে তোমার জন্য বেশী ভালো হতো।" আবু দাউদ ও নাসায়ীতে অন্য একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

تَعَافُوا الْحُدُوْدَفِى مَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدٍ فَقَدْ وَجَبَ

"শাস্তিযোগ্য অপরাধকে নিজেদের মধ্যে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু যে অপরাধের ব্যাপারটি আমার কাছে পৌঁছে যাবে তার শাস্তি বিধান করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

পনের ঃ ইসলামী আইনে এ অপরাধটি পারস্পরিক আপোসের মাধ্যমে ফায়সালা করে নেবার ব্যাপারও নয়। হাদীসের প্রায় সবক'টি কিতাবে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, একটি ছেলে এক ব্যক্তির কাছে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতো। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে বসে। ছেলেটির বাপ একশ ছাগল ও একটি বাঁদি দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে রাজি করিয়ে নেয়। কিন্তু এ মামলাটি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে তখন তিনি বলেন, اما غنمك وجاريتك فرد عليك "তোমার ছাগল ও তোমার বাঁদি তুমিই ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" তারপর তিনি যিনাকারী ও যিনাকারিনী উভয়ের ওপর শরীয়াতের দণ্ডবিধি জারি করেন। এ থেকে কেবল এতটুকুই জানা যায় না যে, এ অপরাধে আপোসে রাজি করিয়ে নেবার কোন অবকাশ নেই। বরং একথাও জানা যায় যে, ইসলামী আইনে অর্থদণ্ডের আকারে সতীত্বের বিনিময় দান করা যেতে পারে না। ইজ্জতের মূল্য প্রদান করার এ ধরনের জঘন্য ভাবধারা পাশ্চাত্য আইনেরই বৈশিষ্ট।

ষোল ঃ কোন ব্যক্তির যিনা করার কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে ইসলামী রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে না। অপরাধের প্রমাণ ছাড়া কারোর ব্যভিচার সংক্রান্ত খবর একাধিক উপায়ে শাসকদের কাছে এসে পৌঁছলেও তারা কোনক্রমেই তার ওপর শরীয়াতের দণ্ডবিধি জারি করতে পারেন না। মদীনায় একটি মেয়ে ছিল। তার সম্পর্কে বলা হতো, সে ছিল প্রকাশ্য চরিত্রহীনা। বুখারীর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ كانت تظهر فى الاسلام السوء "সে ইসলামে অসতীপনার প্রকাশ ঘটাচ্ছিল।" অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ كانت قد اعلنت فى الاسلام "সে ইসলামে প্রকাশ্য অসদাচার করছিল।" আবার ইবনে মাজার একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيْبَةُ فِىْ مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا

"মেয়েটির কথায় ও স্বভাব চরিত্রে এবং তার কাছে যারা যাওয়া আসা করতো তাদের থেকে সুস্পষ্ট সন্দেহ জেগে উঠেছিল।"

কিন্তু যেহেতু তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের প্রমাণ ছিল না তাই তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। অথচ তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকেও এ কথা বের হয়ে গিয়েছিল যে, لوكنت راجما احدا بغير بينة لرجمتها "যদি আমি কাউকে প্রমাণ ছাড়া রজম করতাম তাহলে ঐ মেয়েটিকে নিশ্চয়ই রজম করতাম।"

সতের ঃ যিনার অপরাধের প্রথম সম্ভাব্য প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(ক) কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, যিনার জন্য কমপক্ষে চারজন চাক্ষুষ সাক্ষীর প্রয়োজন। সূরা নিসার ১৫ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। সামনের দিকে এ সূরা নূরেই দু'জায়গায় একথা আসছে। সাক্ষী ছাড়া কাযী স্বচক্ষে এ অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলেও কেবলমাত্র নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে এ ফায়সালা দিতে পারেন না।

(খ) সাক্ষী হতে হবে এমন সব লোক ইসলামের সাক্ষ আইনের দৃষ্টিতে যারা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যেমন, ইতিপূর্বে কোন মামলায় তারা মিথ্যা সাক্ষদানকারী প্রমাণিত হয়নি। তারা খেয়ানতকারী নয়। ইতিপূর্বে তারা কখনো শাস্তি পায়নি। অপরাধীর সাথে যাদের কোন শত্রুতা প্রমাণিত হয়নি ইত্যাদি। মোটকথা অনির্ভরযোগ্য সাক্ষের ভিত্তিতে কাউকে রজম করা বা কারোর পিঠে বেত্রাঘাত করা যেতে পারে না।

(গ) সাক্ষীদের একথার সাক্ষ দিতে হবে যে, তারা অভিযুক্ত নারী ও পুরুষকে সংগমরত অবস্থায় চাক্ষুষ দেখেছে অর্থাৎ كالميل فى المكحلة والرشاء فى البئر (এমনভাবে যেমন সুর্মাদানীর মধ্যে সুর্মা তোলার শলাকা এবং কুয়ার মধ্যে রশি)।

(ঘ) সাক্ষীদের কবে, কখন, কোথায়, কাকে, কার সাথে যিনা করতে দেখেছে এ ব্যাপারে একমত হতে হবে। এ মৌলিক বিষয়গুলোতে মতবিরোধ ঘটলে তাদের সাক্ষ বাতিল হয়ে যাবে।

সাক্ষ সম্পর্কিত এ শর্তগুলো স্বতই একথা প্রকাশ করছে যে, গোয়েন্দাবৃত্তি করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খবর বের করা এবং প্রতিদিন লোকদের পিঠে বেত্রাঘাত করা ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য নয়। বরং সে এমন অবস্থায় এ ধরনের কঠিন শাস্তি দেয় যখন সব ধরনের সংশোধন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও ইসলামী সমাজে কোন নারী ও পুরুষ এমন নির্লজ্জ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে, চার চারজন লোক তাদের অপরাধমূলক তৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়।

আঠার ঃ স্ত্রীলোকের যখন কোন জানা ও পরিচিত স্বামী বা বাঁদীর অনুরূপ কোন মনিব থাকে না তখন নিছক তার গর্ভবতী হওয়াটাই তার বিরুদ্ধে যিনা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট পারিপার্শ্বিক সাক্ষ কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। হযরত উমরের (রা) মতে এ সাক্ষ যথেষ্ট। মালেকীগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে, নিছক গর্ভধারণ এতটা মজবুত পারিপার্শ্বিক সাক্ষ নয় যার ভিত্তিতে কাউকে রজম বা কারোর পিঠে একশ বেত্রাঘাত করা যেতে পারে। এত বড় শাস্তির জন্য সাক্ষীর উপস্থিতি অথবা অপরাধের স্বীকৃতি অপরিহার্য। ইসলামী আইনের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, সন্দেহ শাস্তির নয় বরং ক্ষমার উদ্দীপক হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا "শাস্তিসমূহ এড়িয়ে চলো যতদূর সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকে।" (ইবনে মাজাহ) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَدْرِؤُا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنْ كَانَ لَهُ مُخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ ، فَاِنَّ الْاِمَامَ اَنْ يُّخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُّخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ

"মুসলমানদের থেকে যতদূর সম্ভব শাস্তি দূরে রাখো। যদি কোন অপরাধীকে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবার কোন পথ পাওয়া যায় তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। কারণ শাসকের ক্ষমা করে দেবার ব্যাপারে ভুল করা তার শাস্তি দেবার ব্যাপারে ভুল করার চেয়ে ভালো।" (তিরমিযী)।

এ নিয়ম অনুযায়ী গর্ভবতী হওয়া সন্দেহের জন্য যতই শক্তিশালী ভিত্তি হোক না কেন তা কোনক্রমেই যিনার নিশ্চিত প্রমাণ নয়। কারণ কোন পুরুষের সাথে সংগম ছাড়াও কোন মেয়ের গর্ভাশয়ে কোন পুরুষের শুক্রের কোন অংশ পৌঁছে যাওয়ার এক লাখ ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনাও আছে এবং এর ফলে সে গর্ভবতীও হয়ে যেতে পারে। এতটুকু হাল্‌কা সন্দেহও অপরাধিনীকে ভয়াবহ শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যথেষ্ট হতে হবে।

উনিশ ঃ যিনার সাক্ষীদের মধ্যে যদি পার্থক্য দেখা দেয় অথবা অন্য কোন কারণে তাদের সাক্ষের মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত না হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণে সাক্ষীরা কি শাস্তি পাবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ফকীহদের একটি দল বলেন, এ অবস্থায় তারা মিথ্যা অপবাদ দানকারী গণ্য হবে এবং তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। অন্য দলটি বলেন, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। কারণ তারা সাক্ষী হিসেবে এসেছে, বাদী হিসেবে আসেনি। যদি এভাবে সাক্ষীদেরকে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে যিনার সাক্ষ দেবার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। চারজন সাক্ষীর মধ্য থেকে কেউ বিগড়ে যাবে কিনা এ ব্যাপারে যখন কেউই নিশ্চিত নয় তখন শাস্তির ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সাক্ষ দেবার জন্য এগিয়ে আসবে, কে এমন দায়ে ঠেকেছে? আমার মতে এ দ্বিতীয় মতটিই যুক্তিসংগত। কারণ সন্দেহের ফলে অপরাধীর মতো সাক্ষীদেরও লাভবান হওয়া উচিত। যদি তাদের সাক্ষের দুর্বলতা বিবাদীকে যিনার ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্য যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তা হলে তার সাক্ষীদেরকে মিথ্যা অপবাদের ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্যও যথেষ্ট না হওয়া উচিত। তবে যদি তাদের মিথ্যুক হওয়া দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তারা এ শাস্তি পাবে। প্রথম মতের সমর্থনে দু'টি বড় বড় যুক্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে, কুরআন যিনার মিথ্যা অপবাদকে শাস্তিযোগ্য গণ্য করে। কিন্তু এ যুক্তিটি সঠিক নয়। কারণ কুরআন নিজেই মিথ্যা অপবাদদানকারী (قاذف) ও সাক্ষীর (شاهد) মধ্যে পার্থক্য করে। আর আদালত সাক্ষীর সাক্ষকে অপরাধ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট মনে করেনি, শুধুমাত্র এ কারণেই সাক্ষী মিথ্যা অপবাদদাতা গণ্য হতে পারে না। দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে, মুগীরাহ ইবনে শু'বার (রা) মোকদ্দমায় হযরত উমর (রা) আবু বাক্‌রাহ ও তাঁর দু' সহযোগী সাক্ষীদেরকে মিথ্যা অপবাদ দানের শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু এ মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ দেখলে বুঝা যায়, যেসব মোকদ্দমায় অপরাধ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ অকিঞ্চিত প্রামাণিত হয় সে ধরনের প্রত্যেকটি মোকদ্দমার ওপর এ নজিরটি প্রযোজ্য নয়। মোকদ্দমাটির বিবরণ হচ্ছে ঃ বসরার গবর্নর মুগীরাহ ইবনে শু'বার সাথে আবু বাক্‌রাহর সম্পর্ক আগে থেকেই খারাপ ছিল। উভয়ের গৃহের অবস্থান ছিল একই পথের পাশে মুখোমুখি। একদিন হঠাৎ দম্‌কা বাতাসের ঝটকায় উভয়ের গৃহের জানালা খুলে যায়। আবু বাক্‌রাহ নিজের জানালা বন্ধ করতে ওঠেন। তাঁর দৃষ্টি পড়ে সামনের কামরায়। তিনি হযরত মুগীরাহকে সংগমরত দেখেন। আবু বাক্‌রাহর কাছে বসেছিলেন তার তিন বন্ধু (নাফে' ইবনে কুলাদাহ, যিয়াদ ও শিব্‌ল ইবনে মা'বাদ)। তিনি বলেন, এসো, দেখো এবং মুগীরাহ কি করছে তার সাক্ষী থাকো। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেন, এ মেয়েটি কে? আবু বাক্‌রাহ বলেন, উম্মে জামীল। পরদিন এ সম্পর্কে হযরত উমরের (রা) কাছে অভিযোগনামা পাঠানো হয়। তিনি সংগে সংগেই হযরত মুগীরাহকে সাসপেণ্ড করে হযরত আবু মূসা আশ্‌'আরীকে বসরার গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন এবং অভিযুক্তকে

সাক্ষীসহ মদীনায় ডেকে আনেন। খলীফার সামনে পেশ হবার পর আবু বাক্‌রাহ ও দু'জন সাক্ষী বলেন, আমরা মুগীরাহকে উম্মে জামীলের সাথে সংগমরত অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু যিয়াদ বলেন, মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যায়নি এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না সে উম্মে জামীল ছিল। মুগীরাহ ইবনে শু'বা জেরার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেন, যেদিক থেকে তারা তাঁদেরকে দেখছিলেন সেদিক থেকে তাদের পক্ষে মেয়েটিকে ভালো করে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি এটাও প্রমাণ করে দেন যে, তাঁর স্ত্রীর ও উম্মে জামীলের মধ্যে চেহারাগত সাদৃশ্য রয়েছে। ঘটনার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় যে, হযরত উমরের (রা) শাসনামলে একটি প্রদেশের গবর্নরের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না যে, তিনি যে সরকারী গৃহে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন, সেখানে অন্য একটি মেয়েকে ডেকে এনে যিনা করবেন। এ কারণে মুগীরাহ তার নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর পরিবর্তে উম্মে জামীলের সাথে সহবাস করছে, আবু বাক্‌রাহ ও তার সাথীদের এ কথা মনে করা একটি নিতান্ত অবাস্তব কু-ধারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এ কারণেই হযরত উমর (রা) কেবলমাত্র অভিযুক্তকেই অভিযোগমুক্ত করে ক্ষান্ত হননি বরং আবু বাক্‌রাহ, নাফে ও শিব্‌লকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তিও প্রদান করেন। এ মামলাটির বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এ ফায়সালা করা হয়েছিল। এ থেকে এরূপ বিধি প্রণয়ন করা যায় না যে, যখনই সাক্ষের মাধ্যমে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হবে না তখনই সাক্ষীদেরকে অবশ্যি মারধর করতে হবে। (মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী, ২য় খণ্ড, ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)।

বিশ : সাক্ষ ছাড়া আর যে জিনিসটির মাধ্যমে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হতে পারে সেটি হচ্ছে অপরাধীর নিজের স্বীকারোক্তি। যিনার কাজ করা হয়েছে বলে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ স্বীকারোক্তির শব্দাবলী উচ্চারিত হতে হবে। অর্থাৎ তাকে স্বীকার করতে হবে যে, তার জন্য হারাম ছিল এমন একটি নারীর সাথে সে كالميل في المكحلة (সুর্মাদানীর মধ্যে সুর্মা শলাকার মতো) যিনার কাজ করেছে। আদালতেরও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, অপরাধী কোন প্রকার বাইরের চাপ ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সজ্ঞানে ও সচেতন অবস্থায় এ স্বীকৃতি দিচ্ছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, একটি স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয় বরং অপরাধীর চার বার আলাদা আলাদাভাবে স্বীকারোক্তি দেয়া উচিত। (এটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী লাইলা, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ্ ও হাসান ইবনে সালেহর অভিমত) আবার কেউ কেউ বলেন, একটি স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। (এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, উসমানুল বাত্তা ও হাসান বাসরী প্রমুখ ফকীহগণের অভিমত) তারপর এমন অবস্থায়ও যখন অন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই কেবলমাত্র অপরাধীর নিজেরই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয়েছে তখন যদি ঠিক শাস্তির মাঝামাঝি সময়েও অপরাধী নিজের স্বীকারোক্তি থেকে সরে আসে তাহলেও তার শাস্তি মুলতবী করে দেয়া উচিত। এমনকি যদি বুঝা যায় যে, মারের কষ্ট সইতে না পেরে সে নিজের স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসছে, তা হলেও তার শাস্তি মুলতবী হওয়া উচিত। হাদীসে যিনার মামলা সংক্রান্ত যেসব নজির পাওয়া যায় সেগুলোই এ সমস্ত আইনের উৎস। সবচেয়ে বড় মামলাটি হচ্ছে মা'ঈয ইবনে মালিক আসলামীর। বিভিন্ন সাহাবী থেকে অসংখ্য বর্ণনাকারী এটি উদ্ধৃত করেছেন। প্রায় সবক'টি হাদীসের কিতাবে এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। মা'ঈয ছিল আসলাম গোত্রের একটি এতিম

ছেলে। সে হযরত হায্‌যাল ইবনে নু'আইমের গৃহে লালিত পালিত হয়। সেখানে এক মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদির সাথে যিনা করে বসে। হযরত হায্‌যাল তাকে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে নিজের এ গোনাহের কথা বলো। হয়তো তিনি তোমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে দেবেন। মা'ঈয মসজিদে নববীতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন, আমি যিনা করেছি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তারপর বলেন, ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه "আরে, চলে যাও, আর আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্‌তিগফার করো।" কিন্তু ছেলেটি আবার সামনে এসে একই কথা বলে এবং এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। ছেলেটি আবার সে কথাই বলে এবং তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নেন। এ অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা) তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, দেখো, যদি তুমি চতুর্থবার স্বীকারোক্তি করো তাহলে রসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে রজম করে দেবেন। কিন্তু সে মানেনি এবং আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করে। এবার নবী (সা) তার দিকে ফেরেন এবং তাকে বলেন, لعلك قبلت او غمزت او نظرت "সম্ভবত তুমি চুমো খেয়েছো বা জড়াজড়ি করেছো অথবা কু–নজর দিয়েছো।" (এবং তুমি মনে করেছো এতেই বুঝি যিনা করা হয়ে গেছে) সে বলে, না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তার সাথে এক বিছানায় শুয়েছো?" জবাব দেয়, হাঁ। জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছো?" জবাব দেয়, হাঁ। জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তার সাথে সংগম করছো?" জবাব দেয় হাঁ। তারপর তিনি এমন শব্দ উচ্চারণ করেন যা আরবী ভাষায় সংগম করার সুস্পষ্ট প্রতিশব্দ হিসেবে বলা হয়ে থাকে এবং তাকে অশ্লীল মনে করা হয়ে থাকে। এ ধরনের শব্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে এর আগে কেউ শোনেনি এবং পরেও আর কখনো শোনা যায়নি। যদি এক ব্যক্তির প্রাণনাশের প্রশ্ন না হতো তাহলে তাঁর মুবারক কণ্ঠে কখনো এ ধরনের শব্দ উচ্চারিত হতে পারতো না। কিন্তু এর জবাবেও সে হাঁ বলে দেয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, حتى غاب ذالك منك فى ذالك منها (এমন কি তোমার সেই অংগ তার সেই অংগের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল?) সে বলে, হাঁ। আবার জিজ্ঞেস করেন,

كَمَا يَغِيْبُ الْمِيْلُ فِى الْمَكْحِلَةِ وَالرِّشَاءُ فِى الْبِئْرِ ؟

(সেটা কি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল যেমন সুর্মাদানীতে সুর্মাশলাকা এবং কুয়ার মধ্যে রশি?) সে বলে, হাঁ। জিজ্ঞেস করেন, "যিনা কাকে বলে তুমি কি জানো?" সে বলে, "জি হাঁ।" আমি তার সাথে হারাম পদ্ধতিতে এমন কাজ করেছি যা স্বামী হালাল পদ্ধতিতে নিজের স্ত্রীর সাথে করে থাকে।" তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কি বিয়ে হয়েছে?" জবাব দেয়, "জি হাঁ"। জিজ্ঞেস করেন, "তুমি তো মদ পান করনি?" জবাব দেয়, না। এক ব্যক্তি উঠে তার মুখ শুঁকে দেখেন এবং তার কথা সত্যতার সাক্ষ দেন। তারপর তিনি তার মহল্লার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এ ছেলেটি পাগল নয় তো? মহল্লার লোকেরা বলে, আমরা তার বুদ্ধির মধ্যে কোন বিকৃতি দেখিনি। তিনি হায্‌যালকে বলেন, لوسترته بثوبك كان خيرا لك "যদি তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে তাহলে তোমার জন্য ভালো হতো।" তারপর তিনি মা'ঈযকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তাকে নগরীর বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলা হয়। যখন পাথর পড়তে শুরু হয় তখন মা'ঈয দৌড়ে পালাতে থাকে এবং বলতে থাকে "লোকেরা! আমাকে রসূলুল্লাহর (সা)

কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। তারা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে তারা বলেছিল, রসূলুল্লাহ (সা) আমাকে হত্যা করবেন না।" কিন্তু যারা পাথর মারছিল তারা তাকে মেরেই ফেলে। পরে যখন নবীকে (সা) এ খবর জানানো হয় তখন তিনি লোকদের বলেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? তাকে আমার কাছে আনতে। হয়তো সে তাওবা করতো এবং আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নিতেন।"

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে গামেদীয়ার। গামেদীয়া ছিল গামেদ গোত্রের (জুহাইনীয়া গোত্রের একটি শাখা) একটি মেয়ে। সে এসেও চারবার স্বীকারোক্তি করে যে, সে যিনা করেছে এবং অবৈধ গর্ভধারণ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও প্রথম স্বীকারোক্তির সময় বলেন ঃ وَيْحَكِ ارجعى فاستغفرى الى اللّٰه وتوبى اليه (আরে চলে যাও, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা করো।) কিন্তু সে বলে, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে মা'ঈযের মতো এড়িয়ে যেতে চান? আমি যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছি।" এখানে যেহেতু স্বীকারোক্তির সাথে গর্ভধারণের ব্যাপারটিও ছিল, তাই তিনি তাকে মা'ঈযের মতো বিস্তারিত জেরার সম্মুখীন করেননি। তিনি বলেন, "ঠিক আছে, যদি একান্তই না শুনতে চাও, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে এসো।" সন্তান জন্মের পর সে শিশুটিকে কোলে নিয়ে এসে বলে, এবার আমাকে পবিত্র করে দিন। তিনি বলেন, "যাও, একে দুধ পান করাও এবং শিশু দুধ ছাড়ার পরে এসো।" তারপর সে শিশুর দুধ ছাড়ার পরে আসে এবং সাথে এক টুকরা রুটিও নিয়ে আসে। শিশুকে রুটির টুকরা খাইয়ে রসূলুল্লাহকে (সা) দেখান এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এখন তো এ দুধ ছেড়ে দিয়েছে এবং দেখুন রুটিও খেতে শুরু করেছে। তখন তিনি শিশুটিকে লালন পালন করার জন্য এক ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করেন এবং তাকে রজম করার হুকুম দেন।

এ দু'টি ঘটনায় সুস্পষ্টভাবে চারটি স্বীকারোক্তির কথা বলা হয়েছে। আর আবু দাউদে হযরত বুরাইদার বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামগণ সাধারণভাবে মনে করতেন যদি মা'ঈয ও গামেদীয়া চারবার করে স্বীকারোক্তি না করতো তাহলে তাদেরকে রজম করা হতো না। তবে তৃতীয় ঘটনাটিতে (যার উল্লেখ আমি ওপরে পনের নম্বরে করেছি) শুধুমাত্র এ শব্দগুলো পাওয়া যায় যে, "যাও তার স্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। যদি সে স্বীকার করে তাহলে একে রজম করো।" এখানে চারবার স্বীকারোক্তির কথা বলা হয়নি। এ থেকেই ফকীহগণের একটি দল একটি স্বীকারোক্তি যথেষ্ট বলে মত প্রকাশ করেছেন।

একুশ ঃ ওপরে আমি যে তিনটি মামলার নজির পেশ করেছি তা থেকে প্রমাণ হয় যে, স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী অপরাধীকে সে কার সাথে যিনা করেছে সে কথা জিজ্ঞেস করা হবে না। কারণ এভাবে এক জনের পরিবর্তে দু'জনকে শাস্তি দিতে হবে। আর শরীয়াত লোকদেরকে শাস্তি দেবার জন্য উদগ্রীব নয়। তবে অপরাধী নিজেই যদি বলে যে, এ কর্মের অপর পক্ষ অমুক জন, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সে ও স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকেও শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু যদি সে অস্বীকার করে তাহলে কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিকারী অপরাধীই শরীয়াতের শাস্তির যোগ্য হবে। এ দ্বিতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় পক্ষ তার সাথে যিনা করার কথা স্বীকার করে না) তাকে যিনার না মিথ্যা অপবাদের (قذف) শাস্তি দেয়া হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ

রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে তার জন্য যিনার শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ সে এ অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওযা'ঈর মতে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। কারণ দ্বিতীয় পক্ষের অস্বীকৃতি তার যিনার অপরাধকে সন্দেহযুক্ত করে দিয়েছে। তবে তার মিথ্যা অপবাদের অপরাধ অবশ্যই প্রমাণিত হয়ে গেছে। অন্য দিকে ইমাম মুহাম্মাদের ফত্ওয়া (ইমাম শাফে'ঈর একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়) হচ্ছে এই যে, তাকে যিনার শাস্তিও দিতে হবে এবং মিথ্যা অপবাদের শাস্তিও। কারণ নিজের যিনার অপরাধের স্বীকারোক্তি সে নিজেই করেছে এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগ সে প্রমাণ করতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে এ ধরনের একটি মামলা এসেছিল। তার একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমাদ ও আবু দাউদে সাহ্ল ইবনে সা'দ থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলী সহকারে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ "এক ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে স্বীকারোক্তি করে, সে অমুক মেয়ের সাথে যিনা করেছে। তিনি মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন। সে অস্বীকার করে। তিনি লোকটিকে শাস্তি দেন এবং মেয়েটিকে মুক্তি দিয়ে দেন।" এ হাদীসে তিনি কোন্ শাস্তিটি দেন তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি আবু দাউদ ও নাসাই ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, প্রথমে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তিনি তাকে যিনার শাস্তি দেন। তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করে এবং এর ফলে লোকটিকে আবার মিথ্যা অপবাদের জন্য বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। কারণ এর একজন বর্ণনাকারী কাসেম ইবনে ফাইয়াযকে বহু মুহাদ্দিস অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করেছেন। আবার এ হাদীসটি যুক্তিরও বিরোধী। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আশা করা যেতে পারে না যে, তিনি যিনার জন্য বেত্রাঘাত করার পর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবেন। বুদ্ধিবৃত্তি ও ইনসাফের যে সুস্পষ্ট দাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপেক্ষা করতে পারেন না তা ছিল এই যে, লোকটি যখন মেয়েটির নাম নিয়েছিল তখন তিনি মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেস না করে মামলার ফায়সালা করতে পারতেন না। সাহ্ল ইবনে সা'দ বর্ণিত রেওয়ায়াতটি কিন্তু একথাই সমর্থন করছে। কাজেই দ্বিতীয় বর্ণনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বাইশ ঃ অপরাধ প্রমাণ হবার পর যিনাকারী ও যিনাকারিনীকে কি শাস্তি দেয়া হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন ফকীহর মতামত নিচে পেশ করছি ঃ

বিবাহিত পুরুষ ও নারীর যিনার শাস্তি ঃ ইমাম আহমাদ, দাউদ যাহেরী ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহের মতে এর শাস্তি হচ্ছে একশ বেত্রাঘাত এবং তারপর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু।

অন্য সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কেবলমাত্র প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুই তাদের শাস্তি। বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুকে একত্র করা যাবে না।

অবিবাহিতদের শাস্তি ঃ ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, ইসহাক, দাউদ যাহেরী, সুফিয়ান সওরী, ইবনে আবী লাইলা ও হাসান ইবনে সালেহের মতে, নারী ও পুরুষ উভয়ের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্তর।

ইমাম মালেক ও ইমাম আওযা'ঈর মতে, পুরুষের জন্য একশ বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশান্তর এবং নারীর জন্য শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। (তাঁদের সবার মতে দেশান্তর অর্থ হচ্ছে, একটি লোকালয় থেকে বের করে কমপক্ষে এমন এক দূরত্বে পৌছে দেয়া যেখানে নামাযে কসর করা ওয়াজিব হয়। কিন্তু যায়েদ ইবনে আলী ও ইমাম জা'ফর সাদেকের মতে কারাগারে বন্দী করলেও দেশান্তরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়)।

ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, এ অবস্থায় পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য যিনার শাস্তি হচ্ছে শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। এর ওপর কারাদণ্ড বা দেশান্তরের বাড়তি শাস্তি বা অন্য কোন শাস্তি আসলে 'হদ' বা শরিয়াতী দণ্ড নয় বরং 'তাযীর' বা শাসনমূলক দণ্ড। কাযী যদি দেখেন অপরাধীর চালচলন খারাপ অথবা অপরাধী ও অপরাধিনীর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর তাহলে প্রয়োজন মাফিক তিনি তাদেরকে দেশত্যাগী করতে অথবা কারাদণ্ড দিতে পারেন।

(হদ ও তা'যীরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, হদ একটি নির্ধারিত শাস্তি। অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলী পূর্ণ হবার পর অনিবার্যভাবে এ শাস্তি দেয়া হবে। আর তা'যীর এমন শাস্তিকে বলা হয় যা পরিমাণ ও ধরনের দিক দিয়ে আইনের মধ্যে মোটেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি। বরং আদালত মামলার অবস্থার প্রেক্ষিতে তার মধ্যে কম–বেশী করতে পারে।)

এসব মতাবলম্বীরা তাঁদের মতামত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসের সহায়তা নিয়েছেন। নীচে আমি সেগুলো উদ্ধৃত করছি ঃ

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেতের রেওয়ায়াত। মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী ও ইমাম আহমাদ এটি উদ্ধৃত করেছেন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ ، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً ، اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِاَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِاَةٍ وَالرَّجْمُ (اورمى بالحجارة او رجم بالحجارة)

"আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও, আল্লাহ যিনাকারিনীদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষের অবিবাহিতা মেয়ের সাথে ব্যভিচারের জন্য একশ বেত্রাগাত ও এক বছর দেশান্তর। আর বিবাহিত পুরুষের বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারের জন্য একশ বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু।"

(এ হাদীসটি যদিও বর্ণনা পরম্পরার দিক দিয়ে সহীহ কিন্তু বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীস আমাদের একথা জানাচ্ছে যে, একে নবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কখনো কার্যকর করা হয়নি এবং ফকীহদের একজনও হুবহু এর বক্তব্য অনুযায়ী ফত্ওয়াও দেননি। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের এ সংক্রান্ত যে বিষয়ে সবাই একমত সেটি হচ্ছে এই যে, যিনাকারী ও যিনাকারিনীর বিবাহিত ও অবিবাহিত হবার ব্যাপারটির ওপর আলাদা আলাদাভাবে দৃষ্টি দেয়া হবে। অবিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যে কোন নারীর

সাথে যিনা করুক না কেন উভয় অবস্থায়ই তার শাস্তি একই হবে। আর বিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা বা বিবাহিতা যে কোন নারীর সাথে যিনা করুকনা কেন উভয় অবস্থায়ই একই শাস্তি হবে। নারীর ব্যাপারেও এ একই কথা। সে বিবাহিতা হলে তার সাথে অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষ যেই যিনা করুক না কেন উভয় অবস্থায়ই একই শাস্তি হবে। আর সে অবিবাহিতা হলে তার সাথে বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন পুরুষ যিনা করলেও উভয় অবস্থায়ই তার একই শাস্তি হবে।)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও হযরত খালেদ জুহানীর (রা) হাদীস। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ এটি উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ দু'জন গ্রামীন আরব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি মামলা নিয়ে আসে। একজন বলে, আমার ছেলে এ ব্যক্তির বাড়িতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতো। সে এর স্ত্রীর সাথে জড়িয়ে পড়ে। আমি একে একশ ছাগল ও একটি বাঁদি দিয়ে রাজি করিয়ে নিয়েছি। কিন্তু আলেমগণ বলছেন, এ মীমাংসা আল্লাহর কিতাব বিরোধী। আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন। অন্যজনও বলে, আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ীই ফায়সালা করবো। ছাগল ও বাঁদি তুমি ফেরত নিয়ে যাও। তোমার ছেলের শাস্তি হচ্ছে, একশ বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশান্তর। তারপর তিনি আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে বলেন, হে উনাইস! তুমি গিয়ে এর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো। যদি সে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করে দাও। দেখা গেলো তার স্ত্রী স্বীকারোক্তি করেছে। ফলে তাকে রজম করা হলো। (এখানে রজম করার আগে বেত্রাঘাতের কোন কথা নেই। আর অবিবাহিত পুরুষকে বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করার ফলে বেত্রাঘাত ও দেশান্তরের শাস্তি দেয়া হয়।)

মা'ঈয ও গামেদীয়ার মামলার যতগুলো বিবরণী হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে তার কোনটিতেও একথা পাওয়া যায় না যে, রসূলুল্লাহ (সা) রজম করার আগে তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত করার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

কোন হাদীসে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যা থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মামলায় রজমের সাথে বেত্রাঘাতের শাস্তিও দেন। বিবাহিতের যিনার শাস্তিতে তিনি শুধুমাত্র রজমের শাস্তিই দেন।

হযরত উমর (রা) তাঁর বহুল প্রচারিত ভাষণে বিবাহিতের যিনার শাস্তি রজম বর্ণনা করেছেন। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাই বিভিন্ন বর্ণনা পরম্পরায় এটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আহমাদও এ থেকে বিভিন্ন বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এর কোন একটি বর্ণনায়ও রজমের সাথে বেত্রাঘাতের উল্লেখ নেই।

খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে একমাত্র হযরত আলী (রা) বেত্রাঘাত ও রজমকে একই শাস্তির আওতায় একত্র করেছেন। ইমাম আহমাদ ও বুখারী আমের শা'বী থেকে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, শুরাহাহ নামক এক মহিলা অবৈধ গর্ভের স্বীকারোক্তি করে। হযরত আলী (রা) বৃহস্পতিবার দিন তাকে বেত্রাঘাত করান এবং শুক্রবার রজমের শাস্তি দেন আর তারপর বলেন, আমি আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী তাকে বেত্রাঘাতের এবং

রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী রজমের শাস্তি দিয়েছি। এ একটি ঘটনা ছাড়া খেলাফতে রাশেদার সমগ্র আমলে রজমের সাথে বেত্রাঘাতের শাস্তির পক্ষে দ্বিতীয় কোন ঘটনা পাওয়া যায় না।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) একটি রেওয়ায়াত। আবু দাউদ ও নাসাই এটি উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি যিনা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কেবল বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন। তারপর জানা যায়, সে বিবাহিত ছিল। তখন তিনি তাকে রজমের শাস্তি দেন। এ ছাড়াও ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করেছি। সেগুলো থেকে জানা যায়, অবিবাহিত যিনাকারীদেরকে তিনি কেবল বেত্রাঘাতের শাস্তিই দেন। যেন যে ব্যক্তি মসজিদে গমনকারী এক মহিলার সাথে বলপূর্বক যিনা করেছিল এবং যে ব্যক্তি যিনার স্বীকারোক্তি করেছিল এবং মেয়েটি করেছিল অস্বীকার।

হযরত উমর (রা) বারী'আহ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে খাল্ফকে মদ পানের অপরাধে দেশান্তর করেন এবং সে পালিয়ে গিয়ে রোমানদের সাথে যোগ দেয়। এর ফলে হযরত উমর (রা) বলেন, ভবিষ্যতে আমি আর কাউকে দেশান্তরের শাস্তি দেবো না। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা) অবিবাহিত পুরুষ ও নারীকে যিনার অপরাধে দেশান্তর করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, এর ফলে ফিত্নার আশংকা আছে। (আহকামুল কুরআন–জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

এ সমস্ত হাদীসের প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহযোগীদের অভিমতই সঠিক। অর্থাৎ বিবাহিতের যিনার শাস্তি শুধুমাত্র রজম এবং অবিবাহিতের যিনার শাস্তি শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। বেত্রাঘাত ও রজমকে একসাথে নবীর (সা) আমল থেকে হযরত উসমানের (রা) আমল পর্যন্ত কখনো কার্যকর করা হয়নি। আর বেত্রাঘাত ও দেশান্তরের শাস্তিকে কখনো একত্র করা হয়েছে আবার কখনো একত্র করা হয়নি। এ থেকে হানাফী অভিমতের নির্ভুলতা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়।

তেইশ ঃ বেত্রাঘাতের ধরন সম্পর্কে প্রথম ইংগিত কুরআনের শব্দ فَاجْلِدُوا এর মধ্যে পাওয়া যায়। جَلْد (জাল্দ) শব্দটি جِلْد (জিল্দ অর্থাৎ চামড়া) থেকে গৃহীত। এ থেকে সকল অভিধান বিশারদ ও কুরআন ব্যাখ্যাতা এ অর্থই নিয়েছেন যে, আঘাত এমন হতে হবে যার প্রভাব চামড়ার ওপর থাকে, গোশ্তের মধ্যে না পৌঁছে। এমন ধরনের বেত্রাঘাত যার ফলে গোশ্তের টুকরা উড়ে যেতে থাকে অথবা চামড়া ফেটে আঘাত ভেতরে পৌঁছে যায়, তা কুরআন বিরোধী।

আঘাত করার জন্য কোড়া বা বেত যাই ব্যবহার করা হোক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই তা মাঝারি পর্যায়ের হতে হবে। বেশী মোটা ও বেশী তীক্ষ্ণ অথবা বেশী পাত্লা ও বেশী নরম হতে পারবে না। মুআত্তা গ্রন্থে ইমাম মালেক রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেত্রাঘাতের জন্য কোড়া আনতে বলেন। সেটি বেশী ব্যবহার করার কারণে অনেক বেশী হাল্কা পাত্লা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, فَوْقَ هٰذَا (এর চাইতে বেশী তীক্ষ্ণ দেখে আনো)। তখন একটি নতুন কোড়া আনা হয়। সেটি তখনো কোন প্রকার ব্যবহারের ফলে নরম হয়ে যায়নি। তিনি বলেন, এ দু'য়ের মাঝামাঝি। তারপর এমন কোড়া আনা হয় যা সওয়ারীর পিঠে ব্যবহার করা হয়েছিল। তা দিয়ে তিনি আঘাত করান। প্রায় একই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি বর্ণনা আবু উসমান আন্নাহদী হযরত উমর (রা)

সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি প্রায় মাঝারি ধরনের কোড়া ব্যবহার করতেন। (আহকামুল কুরআন–জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা) গাঁট বাঁধানো কোড়া অথবা দু'চামড়া–তিন চামড়া বা দু'রশি–তিন রশি বাঁধানো কোড়া ব্যবহার করা নিষেধ।

আঘাতও হতে হবে মাঝারি পর্যায়ের। হযরত উমর (রা) আঘাতকারীকে নির্দেশ দিতেন لاترفع (يالاتخرج) ابطك অর্থাৎ "এমনভাবে মারো যেন তোমার বগল খুলে না যায়।" অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিতে হাত উঁচিয়ে মেরো না। (আহকামুল কুরআন–ইবনে আরাবী, ২য় খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, আহকামুল কুরআন–জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)। সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত যে, এ ধরনের আঘাত হবে না যার ফলে ঘা হয়ে যায়। একই জায়গায় মারা যাবে না বরং সারা শরীরে মার ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধুমাত্র চেহারা ও লজ্জাস্থান এবং (হানাফীদের মতে মাথাও) অক্ষত রাখতে হবে। বাদবাকি সমস্ত অংগে কিছু না কিছু মার পড়তে হবে। এক ব্যক্তিকে যখন কোড়া মারা হচ্ছিল তখন হযরত আলী (রা) বলেন, "শরীরের প্রত্যেক অংগকে তার প্রাপ্য দাও এবং শুধুমাত্র মুখ ও লজ্জাস্থানকে নিষ্কৃতি দাও।" (আহকামুল কুরআন–জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ اذا ضرب احدكم فليتق الوجه "তোমাদের কেউ যখন আঘাত করবে তখন মুখে আঘাত করবে না।" (আবু দাউদ)

পুরুষকে দাঁড় করিয়ে ও স্ত্রী লোককে বসিয়ে মারা উচিত। ইমাম আবু হানীফার সময় কূফার কাযী ইবনে আবী লাইলা একটি মেয়েকে দাঁড় করিয়ে মারার ব্যবস্থা করেন। ইমাম আবু হানীফা এর কঠোর সমালোচনা করেন এবং প্রকাশ্যে তার এ কার্যক্রমকে ভুল বলে চিহ্নিত করেন। (এ থেকে আদালতের অমর্যাদা সংক্রান্ত ইমাম আবু হানীফার মতবাদের ওপরও আলোকপাত হয়)। কোড়া মারার সময় স্ত্রীলোক তার পূর্ণ পোশাক পরে থাকবে। বরং তার শরীরের কোন অংশ যাতে বের হয়ে না যায় এ জন্য কাপড় তার সারা শরীরে ভালোভাবে বেঁধে দেয়া হবে। শুধু মোটা কাপড় খুলে নিতে হবে। পুরুষের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, পুরুষ কেবল পাজামা পরে থাকবে। আবার অন্যেরা বলেন, জামাও খোলা যাবে না। হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) এক যিনাকারীকে কোড়া মারার হুকুম দেন। সে বলে, "এই শরীরটার ভালোভাবে মার খাওয়া উচিত।" একথা বলে সে জামা খুলতে শুরু করে। হযরত আবু উবাইদাহ বলেন, "তাকে জামা খুলতে দিয়ো না।" (আহকামুল কুরআন–জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)। হযরত আলীর আমলে এক ব্যক্তি নিজের গায়ে চাদর জড়িয়ে ছিল এ অবস্থায় তাকে কোড়া মারা হয়।

প্রচণ্ড শীত ও প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মারা নিষিদ্ধ। শীতকালে গরম সময়ে এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডার মধ্যে মারতে হবে।

বেঁধে মারারও অনুমতি নেই। তবে অপরাধী যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তাহলে বেঁধে মারা যেতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, لا يحل في هذه الامة تجريد ولا مد "এই উম্মতের মধ্যে উলংগ করে এবং খুঁটির সংগে বেঁধে মারা জায়েয নয়।"

ফকীহগণ প্রতিদিন অন্ততপক্ষে বিশ ঘা কোড়া মারা বৈধ বলেছেন। কিন্তু একই সংগে সম্পূর্ণ শাস্তি দিয়ে দেয়া উত্তম।

মূর্খ ও হিংস্র ধরনের জল্লাদের সাহায্যে মারার কাজ সম্পন্ন করা উচিত নয়। বরং শিক্ষিত ও মার্জিত জ্ঞানবান লোকদের সাহায্যে এ কাজ সম্পন্ন করা উচিত। যারা জানে শরীয়াতের দাবী পূর্ণ করার জন্য কিভাবে মারা উচিত তারাই এ কাজ করবে। ইবনে কাইয়েম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় হযরত আলী (রা), হযরত যুবাইর (রা), হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রা), হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাস্লামাহ (রা), হযরত আসেম ইবনে সাবেত ও দাহ্হাক ইবনে সুফিয়ানের ন্যায় সজ্জন ও মর্যাদাশালী লোকেরা জল্লাদের দায়িত্ব পালন করতেন। (১ম খণ্ড, ৪৪–৪৫ পৃষ্ঠা)।

যদি অপরাধী রুগ্ন হয় অথবা তার আরোগ্য লাভ করার কোন আশা না থাকে কিংবা একেবারে বৃদ্ধ হয় তাহলে একশ শাখাওয়ালা একটি ডাল বা শতকাঠিওয়ালা একটি ঝাড়ু দিয়ে তাকে কেবলমাত্র একবার মেরে দেয়াই উচিত, যাতে আইনের দাবী পূর্ণ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় এক বৃদ্ধ রোগী যিনার অপরাধে পাকড়াও হয়। তিনি তার জন্য এ শাস্তিই নির্ধারণ করেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) গর্ভবতী নারীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে হলে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর নিফাসের সময় পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর তাকে রজম করতে হলে যতক্ষণ তার সন্তান দুধ পান করা পরিত্যাগ না করে ততক্ষণ তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারবে না।

যদি সাক্ষের মাধ্যমে যিনা প্রমাণ হয় তাহলে সাক্ষী মারের সূচনা করবে আর যদি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে কাযী নিজেই সূচনা করবেন, যাতে সাক্ষী নিজের সাক্ষকে এবং বিচারক নিজের বিচারকে খেল–তামাশা মনে না করেন। শুরাহাহর মামলায় যখন হযরত আলী (রা) রজমের ফায়সালা দেন তখন বলেন, "যদি তার অপরাধের কোন সাক্ষী থাকতো তাহলে তাকেই মার শুরু করতে হতো। কিন্তু তাকে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কাজেই আমি নিজেই শুরু করবো।" হানাফীয়াদের মতে এমনটি করা ওয়াজিব। শাফেঈরা একে ওয়াজিব মনে করেন না। কিন্তু সবাই একে উত্তম মনে করেন।

বেত্রাঘাতের শাস্তির এ বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন তারপর যারা এ শাস্তিকে বর্বরোচিত বলে থাকে তাদের ধৃষ্টতার কথা ভাবুন। আজকাল কারাগারে কয়েদীদেরকে যে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা তাদের কাছে বড়ই ভদ্রোচিত। বর্তমান আইনের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র আদালতই নয়, জেলখানার একজন মামুলি সুপারিনটেন্‌ডেন্টও একজন কয়েদীকে হুকুম অমান্য বা গোস্তাখী করার অপরাধে ৩০ ঘা পর্যন্ত বেত্রাঘাতের শাস্তি দেবার অধিকার রাখে। এ বেত্রাঘাত করার জন্য একজন লোককে বিশেষভাবে তৈরী করা হয় এবং সে সবসময় এটা মশ্‌ক করতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে বেতও বিশেষভাবে ভিজিয়ে ভিজিয়ে তৈরী করা হয়, যাতে করে শরীরের ওপর তা ছুরির মতো কেটে বসে যেতে পারে। অপরাধীকে নাংগা করে খুঁটির সাথে বেঁধে দেয়া হয়, যাতে সে একটু নড়াচড়াও করতে না পারে। কেবলমাত্র তার লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য এক টুকরা পাতলা কাপড় তার পাছার সাথে জড়িয়ে দেয়া হয় এবং সেটিকেও টিংচার আইওডিন দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হয়। জল্লাদ দূর থেকে দৌড়ে আসে এবং পূর্ণ শক্তিতে তার ওপর আঘাত করে। শরীরের একটি বিশেষ অংশে (অর্থাৎ পাছায়) বরাবর আঘাত করা হতে থাকে। ফলে সেখান থেকে

গোশ্‌ত কিমা হয়ে উড়ে যেতে থাকে এবং অনেক সময় ভেতর থেকে হাড় দেখা যেতে থাকে। অধিকাংশ সময় এমন হয়, অত্যন্ত বলশালী ও শক্তিধর ব্যক্তিও ৩০ ঘা বেত সম্পূর্ণ হবার আগেই বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। এ অবস্থায় তার শরীর ভরাট হতে দীর্ঘ সময় লাগে। তথাকথিত এ ভদ্রজনোচিত শাস্তিকে যারা আজ কারাগারে নিজেরাই প্রবর্তিত করে চলেছে তারা কোন্ মুখে ইসলাম প্রবর্তিত বেত্রাঘাতের শাস্তিকে "বর্বরোচিত" বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে! তারপর তাদের পুলিশ বাহিনী যেসব অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তাদেরকে নয় বরং নিছক সন্দেহভাজন লোকদেরকে ধরে এনে অনুসন্ধান চালাবার উদ্দেশ্যে (বিশেষ করে রাজনৈতিক অপরাধ সন্দেহে) যেভাবে শাস্তি দিয়ে থাকে তা আজ আর কারোর দৃষ্টির অগোচরে নেই।

চব্বিশ ঃ রজমের শাস্তির ফলে অপরাধী মারা যাবার পর তার সাথে পুরোপুরি মুসলমানের মতো ব্যবহার করা হবে। তার লাশকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হবে। তার জানাযার নামায পড়া হবে। তাকে মর্যাদা সহকারে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে। তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে। দুর্নাম সহকারে তার কথা আলোচনা করা কারোর জন্য বৈধ হবে না। বুখারীতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "রজমের ফলে মা'ঈয ইবনে মালেকের মৃত্যু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনামের সাথে তাকে স্মরণ করতে থাকেন এবং নিজে তার জানাযার নামায পড়ান।" মুসলিমে হযরত বুরাইদার রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ اُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ

"মা'ঈয ইবনে মালেকের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো। সে এমন তাওবা করেছে যে, যদি তা সমগ্র উম্মতের ওপর বন্টন করে দেয়া হয়, তাহলে সবার জন্য যথেষ্ট হবে।"

এ হাদীসে একথাও বলা হয়েছে, গামেদীয়া যখন রজম করার ফলে মারা যান তখন নবী করীম (সা) নিজেই তার জানাযার নামায পড়ান। আর হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা) যখন দুর্নাম সহকারে তার কথা বলতে থাকেন তখন তিনি বলেন ঃ

مَهْلاً يَا خَالِدُ ! فَوَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْتَا بَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَلَهُ -

"হে খালেদ! চুপ করো। সেই সত্তার কসম, যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, সে এমন তাওবা করেছিল যে, যদি নিপীড়নমূলক কর আদায়কারীও তেমন তাওবা করতো তাহলে তাকেও মাফ করে দেয়া হতো।"

আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মা'ঈযের ঘটনার পর একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দু'জন লোককে মা'ঈযের দুর্নাম করতে শুনলেন। কয়েক পা এগিয়ে গেলে একটি গাধার লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। রসূলুল্লাহ (সা) থেমে গেলেন এবং ঐ

দু'জন লোকের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা দু'জন এটা থেকে কিছু খাও।" তারা বললেন, "হে আল্লাহর নবী! ওটা কে খেতে পারে।" তিনি বললেন, "এখনই তো তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ইজ্জত–আবরু খাচ্ছিলে। ওটা এর চেয়ে অনেক খারাপ জিনিস ছিল।" মুসলিমে ঈমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত উমর (রা) গামেদীয়ার জানাযার নামাযের সময় বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! এখন কি এই যিনাকারিনীর জানাযার নামায পড়া হবে? তিনি জবাব দেন ঃ

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

"সে এমন তাওবা করেছে, যা সমগ্র মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হলেও তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে।"

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তিকে মদপানের অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তা দেখে একজনের মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন।" একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এভাবে বলো না। এর বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।" আবু দাউদে এর ওপর আরো এতটুকু সংযোজন আছে যে, নবী (সা) বলেন, বরং এভাবে বলো ঃ اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه "হে আল্লাহ তাকে মাফ করো, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করো।" এ হচ্ছে ইসলামে শাস্তির তাৎপর্য। ইসলাম কোন বৃহত্তম অপরাধীকেও শত্রুতার মনোভাব নিয়ে শাস্তি দেয় না। বরং কল্যাণাকাংখার মনোভাব নিয়েই শাস্তি দেয়। আর শাস্তি শেষ হবার পর তার প্রতি স্নেহ ও মমতার দৃষ্টিতে দেখে। আধুনিক সভ্যতাই বর্তমানে এমন এক সংকীর্ণমনতার জন্ম দিয়েছে যার ফলে সরকারী সৈন্য বা পুলিশ যাকে হত্যা করে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের ফলে যাকে হত্যা করা বৈধ গণ্য করা হয় তার লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়া বা কারোর মুখে তার প্রশংসা কীর্তিত হওয়াকে কোনক্রমেই পছন্দ করা হয় না। এরপর দুনিয়াবাসীকে সহিষ্ণুতা ও উদারতার নসিহত করে নিজের নৈতিক সাহসের (এটা আধুনিক সভ্যতায় ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার মার্জিত নাম) পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়।

পঁচিশ ঃ মুহাররম নারীদের সাথে যিনার শাস্তি সম্পর্কিত শরীয়াতের আইন তাফহীমুল কুরআনের সূরা নিসার ৩৪ টীকায় এবং লূতের জাতির কর্ম (সমকাম) সংক্রান্ত শরিয়াতী ফায়সালা তাফহীমুল কুরআনের সূরা আ'রাফের ৬৪ থেকে ৬৮ টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর পশুর সাথে ব্যভিচার করাকেও কোন কোন ফকীহ যিনার অন্তরভুক্ত করেছেন এবং সে যিনার শাস্তি লাভের যোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র), ইমাম যুফার (র), ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেঈ (র) একে যিনা বলেন না এবং তাঁরা এ ধরনের কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর "হদ" বা "তা'যীর" কোনটি জারি করার পক্ষপাতি নন। তা'যীর সম্পর্কে আমি আগেই বলে এসেছি যে, এর ফায়সালা করবেন কাযী নিজেই অথবা রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা প্রয়োজন বোধ করলে এ জন্য কোন উপযোগী ব্যবস্থা নিজেই প্রবর্তন করতে পারবে।

৩. এ আয়াতে প্রথম উল্লেখযোগ্য জিনিসটি হচ্ছে, এখানে ফৌজদারী আইনকে "আল্লাহর দীন" বলা হচ্ছে। এ থেকে জানা যায়, শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতই

দীন নয় বরং দেশের আইনও দীন। দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায প্রতিষ্ঠা নয় বরং আল্লাহর আইন ও শরীয়াত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও। যেখানে এসব প্রতিষ্ঠিত হয় না সেখানে নামায প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও যেন অসম্পূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে। যেখানে একে বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অবলম্বন করা হয় সেখানে অন্য কিছু নয় বরং আল্লাহর দীনকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এখানে দ্বিতীয় যে জিনিসটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে, আল্লাহর এ সতর্কবাণী : যিনাকারী ও যিনাকারিনীর ওপর আমার নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগকালে অপরাধীর জন্য দয়া ও মমতার প্রেরণা যেন তোমাদের হাত টেনে না ধরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটি আরো স্পষ্টভাবে নিম্নোক্ত হাদীসটিতে বলেন :

يُؤْتَى بِوَالٍ نَقَصَ مِنَ الْحَدِّ سَوْطًا فَيُقَالُ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَاكَ ؟ فَيَقُوْلُ رَحْمَةً لِعِبَادِكَ فَيُقَالُ لَهُ اَنْتَ اَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّىْ ؟ فَيُؤْمَرُبِهِ اِلَى النَّارِ - وَيُؤْتَى بِمَنْ زَادَ سَوْطًا فَيُقَالُ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَاكَ ؟ فَيَقُوْلُ لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيْكَ فَيَقُوْلُ اَنْتَ اَحْكَمُ بِهِمْ مِنِّىْ ؟ فَيُؤْمَرُ بِهِ اِلَى النَّارِ-

" কিয়ামতের দিন একজন শাসককে আনা হবে। সে হদের মধ্যে বেত্রাঘাতের সংখ্যা এক ঘা কমিয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হবে, এ কাজ তুমি কেন করেছিলে? জবাব দেবে, আপনার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে। আল্লাহ বলবেন : আচ্ছা, তাহলে তাদের ব্যাপারে তুমি আমার চেয়ে বেশী অনুগ্রহশীল ছিলে? তারপর হুকুম হবে, নিয়ে যাও একে দোজখে। আর একজন শাসককে আনা হবে। সে বেত্রাঘাতের সংখ্যা ১টি বাড়িয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এ কাজ করেছিলে কেন? সে জবাব দেবে, যাতে লোকেরা আপনার নাফরমানি করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলবেন : আচ্ছা, তাদের ব্যাপারে তুমি তাহলে আমার চেয়ে বেশী বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিলে? তারপর হুকুম হবে, নিয়ে যাও একে দোজখে। (তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

দয়া বা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হদের মধ্যে কম-বেশী করার কাজ চললে এ অবস্থা হবে। কিন্তু কোথাও যদি অপরাধীদের মর্যাদার ভিত্তিতে বিধানের মধ্যে বৈষম্য করা হতে থাকে তাহলে সেটা হবে জঘন্য ধরনের অপরাধ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ভাষণে বলেন : "হে লোকেরা! তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এ জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কোন মর্যাদাশালী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো।" অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "একটি হদ্ জারি করা দুনিয়াবাসীর জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টি হবার চাইতেও বেশী কল্যাণকর।" (নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)।

কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, অপরাধ প্রমাণ হবার পর অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া যাবে না এবং তার শাস্তিও কম করা যাবে না বরং তাকে পুরো একশ কোড়া মারতে হবে। আবার কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন যে, অপরাধী

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٣

ব্যভিচারী যেন ব্যভিচারিনী বা মুশরিক নারী ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে এবং ব্যভিচারিনীকে যেন ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া আর কেউ বিয়ে না করে। আর এটা হারাম করে দেয়া হয়েছে মু'মিনদের জন্য।[৫]

যে মারের কোন কষ্ট অনুভব করতে না পারে এমন ধরনের কোন হাল্‌কা মার মারা যাবে না। আয়াতের শব্দাবলী উভয় ধরনের অর্থ সম্বলিত। বরং উভয় অর্থই প্রযোজ্য মনে হয়। বরঞ্চ সে সাথে এ অর্থও হয় যে, যিনাকারীকে সে শাস্তি দিতে হবে যা আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাকে অন্য কোন শাস্তিতে পরিবর্তিত করা যাবে না। কোড়া মারার পরিবর্তে যদি অন্য কোন শাস্তি দয়া ও মমতার ভিত্তিতে দেয়া হয়, তাহলে তা হবে গোনাহ। আর যদি কোড়া মারাকে একটি বর্বরোচিত শাস্তি মনে করে অন্য শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে তা হবে নির্জলা কুফরী, যা এক মুহূর্তকালের জন্যও ঈমানের সাথে একই বক্ষে একত্র হতে পারে না। আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নেয়া আবার (নাউযুবিল্লাহ) তাকে বর্বরও বলা কেবলমাত্র এমন ধরনের লোকের পক্ষে সম্ভব যে জঘন্য পর্যায়ের মুনাফিক।

৪. অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে সাধারণ লোকের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এর ফলে একদিকে অপরাধী অপদস্ত হবে এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। এ থেকে ইসলামের শাস্তি তত্বের ওপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। সূরা আল মা–য়েদায় চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছিল ঃ جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ ٱللَّهِ "তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরাধ প্রতিরোধক শাস্তি।" (৩৮ আয়াত) আর এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যিনাকারীকে প্রকাশ্য লোকদের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এ থেকে জানা যায়, ইসলামী আইনে শাস্তির তিনটি উদ্দেশ্য। এক, অপরাধী থেকে তার জুলুম ও বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিতে হবে এবং সে অন্য ব্যক্তি বা সমাজের প্রতি যে অন্যায় করেছিল তার কিছুটা স্বাদ তাকে আস্বাদন করিয়ে দিতে হবে। দুই, তাকে পুনর্বার অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তিন, তার শাস্তিকে শিক্ষণীয় করতে হবে, যাতে সমাজের খারাপ প্রবণতার অধিকারী অন্য লোকদের মগজ ধোলাই হয়ে যায় এবং তারা যেন এ ধরনের কোন অপরাধ করার সাহসই না করতে পারে। এ ছাড়াও প্রকাশ্যে শাস্তি দেবার আর একটি লাভ হচ্ছে এই যে, এ অবস্থায় শাসকরা শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে অহেতুক সুবিধা দান বা অহেতুক কঠোরতা প্রদর্শন করার সাহস না দেখাতে পারে।

৫. অর্থাৎ অ–তাওবাকারী ব্যভিচারীর জন্য ব্যভিচারিনীই উপযোগী অথবা মুশরিক নারী। কোন সৎ মু'মিন নারীর জন্য সে মোটেই উপযোগী পুরুষ নয়। আর মু'মিনদের জন্য জেনে বুঝে নিজেদের মেয়েদেরকে এ ধরনের অসচ্চরিত্র লোকদের হাতে সোপর্দ করা হারাম। এভাবে যিনাকারিনী (অ–তাওবাকারী) মেয়েদের জন্য তাদেরই মতো যিনাকারীরা

অথবা মুশরিকরাই উপযোগী। সৎ মু'মিনদের জন্য তারা মোটেই উপযোগী নয়। যেসব নারীর চরিত্রহীনতার কথা মু'মিনরা জানে তাদেরকে বিয়ে করা তাদের জন্য হারাম। যে সমস্ত পুরুষ ও নারী তাদের চরিত্রহীনতার পথে গা ভাসিয়ে দিয়েছে একমাত্র তাদের জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য। তবে যারা তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। কারণ তাওবা ও সংশোধনের পর "যিনাকারী" হবার দোষ আর তাদের জন্য প্রযুক্ত হয় না।

যিনাকারীর সাথে বিয়ে হারাম হবার অর্থ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এ নিয়েছেন যে, আদতে তার সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিতই হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, এর অর্থ নিছক নিষেধাজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে যদি কেউ বিয়ে করে তাহলে আইনগতভাবে তা বিয়েই হবে না এবং এ বিয়ে সত্ত্বেও উভয় পক্ষকে যিনাকারী গণ্য করতে হবে একথা ঠিক নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে বলেন ঃ الحرام لا يحرم الحلال "হারাম হালালকে হারাম করে দেয় না।" (তাবারানী ও দারুকুত্নী) অর্থাৎ একটি বেআইনী কাজ অন্য একটি আইনসংগত কাজকে বেআইনী করে দেয় না। কাজেই কোন ব্যক্তির যিনা করার কারণে সে যদি বিয়েও করে তাহলে তা তাকে যিনায় পরিণত করে দিতে পারে না এবং বিবাহ চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষ যে ব্যভিচারী নয় সেও ব্যভিচারী গণ্য হবে না। নীতিগতভাবে বিদ্রোহ ছাড়া কোন অপরাধ এমন নেই, যা অপরাধ সম্পাদনকারীকে নিষিদ্ধ ব্যক্তিতে (Outlaw) পরিণত করে। যার পরে তার আর কোন কাজই আইনসংগত হতে পারে না। এ বিষয়টি সামনে রেখে যদি আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যায়, তাহলে আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে এই মনে হয় যে, যাদের ব্যভিচারী চরিত্র জনসমক্ষে পরিচিত তাদেরকে বিয়ে করার জন্য নির্বাচিত করা একটি গোনাহর কাজ। মু'মিনদের এ গোনাহ থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে ব্যভিচারীদের হিম্মত বাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ শরীয়াত তাদেরকে সমাজের অবাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য জীব গণ্য করতে চায়।

অনুরূপভাবে এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তও টানা যায় না যে, যিনাকারী মুসলিম পুরুষের বিয়ে মুশরিক নারীর সাথে এবং যিনাকারিনী মুসলিম নারীর বিয়ে মুশরিক পুরুষের সাথে সঠিক হবে। আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, যিনা একটি চরম নিকৃষ্ট কুকর্ম। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও এ কাজ করে সে মুসলিম সমাজের সৎ ও পাক-পবিত্র লোকদের সাথে আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার নিজের মতো যিনাকারীদের সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত অথবা মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, যারা আদৌ আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাসই রাখে না।

এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলোই আসলে আয়াতের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে। মুসনাদে আহমাদ ও নাসাঈতে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, উম্মে মাহ্যাওল নামে একটি মেয়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেছিল। এক মুসলমান তাকে বিয়ে করতে চায় এবং এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চায়। তিনি নিষেধ করে এ আয়াতটি পড়েন। তিরমিযী ও আবু দাউদে বলা হয়েছে, মারসাদ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ④ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤

আর যারা সতী–সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ লাগায়, তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ কখনো গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক। তবে যারা এরপর তাওবা করে এবং শুধরে যায়, অবশ্যই আল্লাহ (তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[৬]

ইবনে আবি মারসাদ একজন সাহাবী ছিলেন। জাহেলী যুগে মক্কার ঈনাক নামক এক ব্যভিচারিনীর সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন এবং রসূলুল্লাহর (সা) কাছে অনুমতি চান। দু'বার জিজ্ঞেস করার পরও তিনি নীরব থাকেন। আবার তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করেন, এবার তিনি জবাব দেন ঃ

يامرثد الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة فلا تنكحها

"হে মারসাদ! ব্যভিচারী এক ব্যভিচারিনী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না!, কাজেই তাকে বিয়ে করো না।"

এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকেও বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন দাইয়ুস (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানে তার স্ত্রী ব্যভিচারিনী এবং এরপরও সে তার স্বামী থাকে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।" (আহমাদ, নাসাঈ, আবু দাউদ) প্রথম দুই খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) উভয়েই এ ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা ছিল এই যে, তাঁদের আমলে যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনা অভিযোগে গ্রেফতার হতো তাদেরকে তাঁরা প্রথমে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতেন তারপর তাদেরকেই পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদিন এক ব্যক্তি বড়ই পেরেশান অবস্থায় হযরত আবু বকরের (রা) কাছে আসে। সে এমনভাবে কথা বলতে থাকে যেন তার মুখে কথা ভালভাবে ফুটছিল না। হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমরকে (রা) বলেন, ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করুন ব্যাপারখানা কি? হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করতে সে বলে, তাদের বাড়িতে মেহমান হিসেবে এক ব্যক্তি এসেছিল। সে তার মেয়ের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসেছে। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ قبحك الله ، الاسترت على ابنتك "তোমার মন্দ হোক, তুমি নিজের মেয়ের আবরণ ঢেকে দিলে না?" শেষ পর্যন্ত পুরুষটি ও মেয়েটির বিরুদ্ধে

মামলা চলে। উভয়কে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়। তারপর উভয়কে পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে হযরত আবু বকর (রা) এক বছরের জন্য তাদেরকে দেশান্তর করেন। এ ধরনেরই আরো কয়েকটি ঘটনা কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (পৃষ্ঠা ৮৬, ২য় খণ্ড)।

৬. এ হুকুমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজে লোকদের গোপন প্রণয় ও অবৈধ সম্পর্কের আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া। কারণ এর মাধ্যমে অসংখ্য অসৎকাজ, অসৎবৃত্তি ও অসৎ প্রবণতার প্রসার ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অসৎবৃত্তিটি হলো, এভাবে সবার অলক্ষে একটি ব্যভিচারমূলক পরিবেশ তৈরী হয়ে যেতে থাকে। একজন নিছক কৌতুকের বশে কারোর সত্য বা মিথ্যা কুৎসিত ঘটনাবলী অন্যের সামনে বর্ণণা করে বেড়ায়। অন্যেরা তাতে লবণ মরিচ মাখিয়ে লোকদের সামনে পরিবেশন করতে থাকে এবং এ সংগে আরো কিছু লোকের ব্যাপারেও নিজেদের বক্তব্য বা কুধারণা বর্ণনা করে। এভাবে কেবলমাত্র যৌন কামনা–বাসনার একটি ব্যাপক ধারাই প্রবাহিত হয় না বরং খারাপ প্রবণতার অধিকারী নারী–পুরুষরা জানতে পারে যে, সমাজের কোথায় কোথায় অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারবে। শরীয়াত প্রথম পদক্ষেপেই এ জিনিসটির পথ রোধ করতে চায়। একদিকে সে হুকুম দেয়, যদি কেউ যিনা করে এবং সাক্ষী–সাবুদের মাধ্যমে তার যিনা প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে এমন চরম শাস্তি দাও যা অন্য কোন অপরাধে দেয়া হয় না। আবার অন্যদিকে সে ফায়সালা করে, যে ব্যক্তি অন্যের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে সে সাক্ষ–প্রমাণের মাধ্যমে নিজের অভিযোগ প্রমাণ করবে আর যদি প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো, যাতে ভবিষ্যতে আর সে কখনো এ ধরনের কোন কথা বিনা প্রমাণে নিজের মুখ থেকে বের করার সাহস না করে। ধরে নেয়া যাক যদি অভিযোগকারী কাউকে নিজের চোখে ব্যভিচার করতে দেখে তাহলেও তার নীরব থাকা উচিত এবং অন্যদের কাছে একথা না বলা উচিত ফলে ময়লা যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকবে এবং আশেপাশে ছড়িয়ে যেতে পারবে না। তবে যদি তার কাছে সাক্ষী থাকে তাহলে সমাজে আজেবাজে কথা ছড়াবার পরিবর্তে বিষয়টি শাসকদের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং আদালতে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ করে তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ আইনটি পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য এর বিস্তারিত বিষয়াবলী দৃষ্টি সমক্ষে থাকা উচিত। তাই আমি নীচে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি ঃ

এক ঃ আয়াতে وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হয় "যেসব লোক অপবাদ দেয়।" কিন্তু পূর্বাপর আলোচনা বলে, এখানে অপবাদ মানে সব ধরনের অপবাদ নয় বরং বিশেষভাবে যিনার অপবাদ। প্রথমে যিনার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং সামনের দিকে আসছে "লি'আন"–এর বিধান। এ দু'য়ের মাঝখানে এ বিধানটির আসা পরিষ্কার ইংগিত দিচ্ছে এখানে অপবাদ বলতে কোন্ ধরনের অপবাদ বুঝানো হয়েছে। তারপর يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ (অপবাদ দেয় সতী মেয়েদেরকে) থেকেও এ মর্মে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এখানে এমন অপবাদের কথা বলা হয়েছে যা সতীত্ব বিরোধী। তাছাড়া অপবাদদাতাদের কাছে তাদের অপবাদের প্রমাণস্বরূপ চারজন সাক্ষী আনার দাবী করা হয়েছে। সমগ্র ইসলামী আইন ব্যবস্থায় একমাত্র যিনার সাক্ষদাতাদের জন্য চারজনের

সংখ্যা রাখা হয়েছে। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে সমগ্র উম্মতের আলেম সমাজের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ আয়াতে শুধুমাত্র যিনার অপবাদের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য উলামায়ে কেরাম স্বতন্ত্র পারিভাষিক শব্দ "কাযাফ" নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে অন্যান্য অপবাদসমূহ (যেমন কাউকে চোর, শরাবী, সূদখোর বা কাফের বলা) এ বিধানের আওতায় এসে না পড়ে। "কাযাফ" ছাড়া অন্য অপবাদসমূহের শাস্তি কাযী নিজেই নির্ধারণ করতে পারেন অথবা দেশের মজলিসে শূরা প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের জন্য অপমান বা মানহানির কোন সাধারণ আইন তৈরী করতে পারেন।

দুই : আয়াতে يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ (সতী নারীদেরকে অপবাদ দেয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শুধুমাত্র নারীদেরকে অপবাদ দেয়া পর্যন্ত এ বিধানটি সীমাবদ্ধ নয় বরং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষদেরকে অপবাদ দিলেও এ একই বিধান কার্যকর হবে। এভাবে যদিও অপবাদদাতাদের জন্য اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ (যারা অপবাদ দেয়) পুরুষ নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তবুও এর মাধ্যমে শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই নির্দেশ করা হয়নি বরং মেয়েরাও যদি "কাযাফ"–এর অপরাধ করে তাহলে তারাও এ একই বিধানের আওতায় শাস্তি পাবে। কারণ অপরাধের ব্যাপারে অপবাদদাতা ও যাকে অপবাদ দেয়া হয় তাদের পুরুষ বা নারী হলে কোন পার্থক্য দেখা দেয় না। কাজেই আইনের আকৃতি হবে এ রকম—যে কোন পুরুষ ও নারী কোন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষ ও নারীর ওপর যিনার অপবাদ চাপিয়ে দেবে তার জন্য হবে এ আইন (উল্লেখ্য, এখানে "মুহসিন" ও "মুহসিনা" মানে বিবাহিত পুরুষ ও নারী নয় বরং নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পন্ন পুরুষ ও নারী)।

তিন : অপবাদদাতা যখন কোন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে এ অপবাদ দেবে একমাত্র তখনই এ আইন প্রযোজ্য হবে। কোন কলংকযুক্ত ও দাগী চরিত্র সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে এটি প্রযুক্ত হতে পারে না। দুশ্চরিত্র বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে "অপবাদ" দেবার প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু যদি সে এমন না হয়, তাহলে তার ওপর প্রমাণ ছাড়াই অপবাদদাতার জন্য কাযী নিজেই শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন অথবা এ ধরনের অবস্থার জন্য মজলিসে শূরা প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে পারে।

চার : কোন মিথ্যা অপবাদ (কাযাফ) দেয়ার কাজটি শাস্তিযোগ্য হবার জন্য শুধুমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, একজন অন্য জনের ওপর কোন প্রমাণ ছাড়াই ব্যভিচার করার অপবাদ দিয়েছে। বরং এ জন্য কিছু শর্ত অপবাদদাতার মধ্যে, কিছু শর্ত যাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে এবং কিছু শর্ত স্বয়ং অপবাদ কর্মের মধ্যে থাকা অপরিহার্য।

অপবাদদাতার মধ্যে যে শর্তগুলো থাকতে হবে সেগুলো হচ্ছে : প্রথমত তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। শিশু যদি অপবাদ দেবার অপরাধ করে তাহলে তাকে আইন–শৃংখলা বিধানমূলক (তা'যীর) শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তার ওপর শরিয়াতী শাস্তি (হদ্) জারি হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তাকে মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। পাগলের ওপর "কাযাফের" শাস্তি জারি হতে পারে না। অনুরূপভাবে হারাম নেশা ছাড়া অন্য কোন ধরনের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেমন ক্লোরোফরমের প্রভাবাধীন অপবাদদাতাকেও অপরাধী গণ্য করা যেতে পারে না। তৃতীয়ত সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় (ফকীহগণের পরিভাষায় 'তায়েআন') এ কাজ

করবে। কারোর বল প্রয়োগে অপবাদদানকারীকে অপরাধী গণ্য করা যেতে পারে না। চতুর্থত সে যাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার নিজের বাপ বা দাদা নয়। কারণ তাদের ওপর অপবাদের হদ জারি হতে পারে না। এগুলো ছাড়া হানাফীদের মতে পঞ্চম আর একটি শর্তও আছে। সেটি হচ্ছে, সে বাকশক্তি সম্পন্ন হবে, বোবা হবে না। বোবা যদি ইশারা ইংগিতে অপবাদ দেয় তাহলে তার ফলে অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে না। ইমাম শাফেঈ এ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যদি বোবার ইশারা একেবারেই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হয় এবং তা দেখে সে কি বলতে চায় তা লোকেরা বুঝতে পারে, তাহলে তো সে অপবাদদাতা। কারণ তার ইশারা এক ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও বদনাম করে দেবার ক্ষেত্রে কথার মাধ্যমে প্রকাশ করার তুলনায় কোন অংশে কম নয়। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে নিছক ইশারার মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ এত বেশী শক্তিশালী নয় যার ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে ৮০ ঘা বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তারা তাকে শুধুমাত্র দমনমূলক (তা'যীর) শাস্তি দেবার পক্ষপাতি।

যাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয় তার মধ্যেও নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে। প্রথমত তাকে বুদ্ধি সচেতন হতে হবে। অর্থাৎ তার ওপর এমন অবস্থায় যিনা করার অপবাদ দেয়া হয় যখন সে বুদ্ধি সচেতন ছিল। পাগলের প্রতি (পরে সে বুদ্ধি সচেতন হয়ে গিয়ে থাক বা না থাক) যিনা করার অপবাদ দানকারী 'কাযাফ"–এর শাস্তিলাভের উপযুক্ত নয়। কারণ পাগল তার নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে পারে না। আর তার বিরুদ্ধে যিনা করার সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও সে যিনার শাস্তির উপযুক্ত হয় না এবং তার মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয় না। কাজেই তার প্রতি অপবাদ দানকারীরও কাযাফের শাস্তিলাভের যোগ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম লাইস ইবনে সা'দ বলেন, পাগলের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদদানকারী কাযাফের শাস্তিলাভের যোগ্য। কারণ সে একটি প্রমাণ বিহীন অপবাদ দিচ্ছে, এতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় তার ওপর যিনা করার অপবাদ দেয়া হয়। শিশুর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া অথবা যুবকের বিরুদ্ধে এ মর্মে অপবাদ দেয়া যে, সে শৈশবে এ কাজ করেছিল, এ ধরনের অপবাদের ফলে 'কাযাফ'–এর শাস্তি ওয়াজিব হয় না। কারণ পাগলের মত শিশুও নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে না। ফলে কাযাফ–এর শাস্তি তার ওপর ওয়াজিব হয় না এবং তার মান–সম্মানও নষ্ট হয় না। কিন্তু ইমাম মালেক বলেন, যে ছেলে প্রাপ্ত বয়স্কের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তার বিরুদ্ধে যদি যিনা করার অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তো অপবাদদানকারীর ওপর কাযাফ–এর শাস্তি ওয়াজিব হবে না কিন্তু যদি একই বয়সের মেয়ের ওপর যিনা করাবার অভিযোগ আনা হয় যার সাথে সহবাস করা সম্ভব, তাহলে তার প্রতি অপবাদদানকারী কাযাফ–এর শাস্তিলাভের যোগ্য। কারণ এর ফলে কেবলমাত্র মেয়েরেই নয় বরং তার পরিবারেরও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয় এবং মেয়ের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যায়। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলমান হতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে যিনা করার অপবাদ দেয়া হয়। কাফেরের বিরুদ্ধে এ অপবাদ অথবা মুসলিমের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে, সে কাফের থাকা অবস্থায় এ কাজ করেছিল, তার জন্য কাযাফ–এর শাস্তি ওয়াজিব করে দেয় না। চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, তাকে স্বাধীন হতে হবে। বাঁদি বা গোলামের বিরুদ্ধে এ অপবাদ অথবা স্বাধীনের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে, সে গোলাম থাকা অবস্থায় এ কাজ করেছিল, তার

জন্য কাযাফ–এর শাস্তি ওয়াজিব করে দেয় না। কারণ গোলামীর অসহায়তা ও দুর্বলতার দরুন তার পক্ষে নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতার ব্যবস্থা করা সম্ভব নাও হতে পারে। স্বয়ং কুরআনই গোলামীর অবস্থাকে 'ইহ্সান' তথা পূর্ণ বিবাহিত অবস্থা গণ্য করেনি। তাই সূরা নিসায় শব্দটি বাঁদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দাউদ যাহেরী এ যুক্তি মানেন না। তিনি বলেন, বাঁদি ও গোলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদদানকারীও কাযাফ–এর শাস্তিলাভের যোগ্য। পঞ্চম শর্ত হচ্ছে, তাকে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ তার জীবন যিনা ও যিনাসদৃশ চালচলন থেকে মুক্ত হবে। যিনা মুক্ত হবার অর্থ হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কখনো যিনার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। যিনা সদৃশ থেকে মুক্ত হবার অর্থ হচ্ছে, সে বাতিল বিবাহ, গোপন বিবাহ, সন্দেহযুক্ত মালিকানা বা বিবাহ সদৃশ যৌন সংগম করেনি। তার জীবন যাপন এমন ধরনের নয় যেখানে তার বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জ বেহায়াপনার অভিযোগ আনা যেতে পারে এবং যিনার চেয়ে কম পর্যায়ে চরিত্রহীনতার অভিযোগ তার প্রতি ইতিপূর্বে কখনো প্রমাণিত হয়নি। কারণ এসব ক্ষেত্রেই তার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ক্ষুণ্ন হয়ে যায় এবং এ ধরনের অনিশ্চিত নিষ্কলুষতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী ৮০ ঘা বেত্রাঘাতের শাস্তিলাভের যোগ্য হতে পারে না। এমন কি যদি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের (কাযাফ) শাস্তি জারি হবার আগে যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয় তার বিরুদ্ধে কখনো কোন যিনার অপরাধের সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে ছেড়ে দেয়া হবে। কারণ যার প্রতি সে অপবাদ আরোপ করেছিল সে নিষ্কলুষ থাকেনি।

কিন্তু এ পাঁচটি ক্ষেত্রে শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি (হদ্) জারি না হবার অর্থ এ নয় যে, পাগল, শিশু, কাফের, গোলাম বা অনিষ্কলুষ ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ ছাড়াই যিনার অপবাদ আরোপকারী দমনমূলক (তা'যীর) শাস্তিলাভের যোগ্যও হবে না।

এবার স্বয়ং মিথ্যা অপবাদ কর্মের মধ্যে যেসব শর্ত পাওয়া যেতে হবে সেগুলোর আলোচনায় আসা যাক। একটি অভিযোগকে দু'টি জিনিসের মধ্য থেকে কোন একটি জিনিস মিথ্যা অপবাদে পরিণত করতে পারে। এক, অভিযোগকারী অভিযুক্তের ওপর এমন ধরনের নারী সংগমের অপবাদ দিয়েছে যা সাক্ষের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর যিনার শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে। দুই, অথবা সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জারজ সন্তান গণ্য করেছে। কিন্তু উভয় অবস্থায়ই এ অপবাদটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হতে হবে। ইশারা–ইংগিত গ্রহণযোগ্য নয়। এর সাহায্যে যিনা বা বংশের নিন্দার অর্থ গ্রহণ করা মিথ্যা অপবাদদাতার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল হয়। যেমন কাউকে ফাসেক, পাপী, ব্যভিচারী বা দুশ্চরিত্র ইত্যাদি বলে দেয়া অথবা কোন মেয়েকে বেশ্যা, কসবী বা ছিনাল বলা কিংবা কোন সৈয়দকে পাঠান বলে দেয়া—এসব ইশারা হয়। এগুলোর মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন মিথ্যা অপবাদ প্রমাণ হয় না। অনুরূপভাবে যেসব শব্দ নিছক গালাগালি হিসেবে ব্যবহার হয়, যেমন হারামি বা হারামজাদা ইত্যাদিকেও সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ গণ্য করা যেতে পারে না। তবে 'তা'রীয' (নিজের প্রতি আপত্তিকর বক্তব্য অস্বীকৃতির মাধ্যমে অন্যকে খোঁটা দেয়া) এর ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে এটাও অপবাদ কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। যেমন কেউ অন্যকে সম্বোধন করে বলে, "হাঁ, কিন্তু আমি তো আর যিনাকারী নই" অথবা "আমার মা তো আর যিনা করে আমাকে জন্ম দেয়নি।" ইমাম

মালেক বলেন, এমন কোন "তা'রীয" "কাযাফ" বা যিনার মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে যা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, প্রতিপক্ষকে যিনাকারী বা জারজ সন্তান গণ্য করাই বক্তার উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় "হদ" বা কাযাফ–এর শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, তাঁর সাথীগণ এবং ইমাম শাফেঈ, সুফিয়ান সওরী, ইবনে শুবরুমাহ ও হাসান ইবনে সালেহ বলেন, "তা'রীযে"র ক্ষেত্রে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং সন্দেহ সহকারে কাযাফ–এর শাস্তি জারি হতে পারে না। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্ বলেন, যদি ঝগড়া–বিবাদের মধ্যে "তা'রীয" করা হয়, তাহলে তা হবে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আর হাসি–ঠাট্টার মধ্যে করা হলে তা ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ হবে না। খলীফাগণের মধ্যে হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা) তা'রীযের জন্য কাযাফ–এর শাস্তি দেন। হযরত উমরের আমলে দু'জন লোকের মধ্যে গালিগালাজ হয়। একজন অন্য জনকে বলে, "আমার বাপও যিনাকারী ছিল না, আমার মাও যিনাকারিনী ছিল না।" মামলাটি হযরত উমরের দরবারে পেশ হয়। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা এ থেকে কি মনে করেন? কয়েকজন বলে, "সে নিজের বাপ–মার প্রশংসা করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির বাপ–মা'র ওপর আক্রমণ করেনি। "আবার অন্য কয়েকজন বলে," তার নিজের বাপ–মা'র প্রশংসা করার জন্য কি শুধু এ শব্দগুলোই রয়ে গিয়েছিল? এ বিশেষ শব্দগুলোকে এ সময় ব্যবহার করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, দ্বিতীয় ব্যক্তির বাপ–মা ব্যভিচারী ছিল।" হযরত উমর (রা) দ্বিতীয় দলটির সাথে একমত হন এবং 'হদ' জারি করেন। (জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা) কারোর প্রতি সমকামিতার অপবাদ দেয়া ব্যভিচারের অপবাদ কিনা এ ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ একে ব্যভিচারের অপবাদ গণ্য করেন এবং 'হদ' জারি করার হুকুম দেন।

পাঁচ : ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ সরাসরি সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ (Cognizable Offence) কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আবী লাইলা বলেন, এটি হচ্ছে আল্লাহর হক। কাজেই যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে সে দাবী করুক বা নাই করুক মিথ্যা অপবাদদাতার বিরুদ্ধে কাযাফ–এর শাস্তি জারি করা ওয়াজিব। কিন্তু তার বিরুদ্ধে মামলা চালানো, যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে, তার দাবীর ওপর নির্ভর করে এবং এদিক দিয়ে এটি ব্যক্তির হক। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আওযাঈও এ একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেকের মতে যদি শাসকের সামনে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তা হবে সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ অন্যথায় এর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয়েছে তার দাবীর ওপর নির্ভরশীল।

ছয় : ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেবার অপরাধ আপোসে মিটিয়ে ফেলার মতো অপরাধ (Compoundable Offence) নয়। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির আদালতে মামলা দায়ের না করাটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু আদালতে বিষয়টি উত্থাপিত হবারপর অপবাদ দানকারীকে তার অপবাদ প্রমাণ করতে বাধ্য করা হবে। আর প্রমাণ করতে না পারলে তার ওপর 'হদ' জারি করা হবে। আদালত তাকে মাফ করতে পারে না, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিও পারে না এবং কোন প্রকার অর্থদণ্ড দিয়েও ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করা

যেতে পারে না। তাওবা করে মাফ চেয়েও সে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি আগেই আলোচিত হয়েছে ঃ

تَعَافَوُا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِىْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

"অপরাধকে আপোসে মিটিয়ে দাও কিন্তু যে অপরাধের নালিশ আমার কাছে চলে এসেছে, সেটা ওয়াজিব হয়ে গেছে।"

সাত ঃ হানাফীদের মতে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দাবী করতে পারে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নিজেই অথবা যখন দাবী করার জন্য অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নিজে উপস্থিত নেই এমন অবস্থায় যার বংশের মর্যাদাহানি হয় সেও দাবী করতে পারে। যেমন বাপ, মা, ছেলেমেয়ে এবং ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়েরা এ দাবী করতে পারে। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে এ অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে লাভযোগ্য। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মারা গেলে তার প্রত্যেক শরয়ী উত্তরাধিকারী হদ্‌ জারি করার দাবী জানাতে পারে। তবে আশ্চার্য ব্যাপার হচ্ছে, ইমাম শাফেঈ স্ত্রী ও স্বামীকে এর বাইরে গণ্য করছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি হচ্ছে, মৃত্যুর সাথে সাথেই দাম্পত্য সম্পর্ক খতম হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় স্বামী বা স্ত্রী কোন এক জনের বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে অন্যের বংশের কোন মর্যাদাহানি হয় না। অথচ এ দু'টি যুক্তিই দুর্বল। কারণ শাস্তি দাবী করাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার বলে মেনে নেবার পর মৃত্যু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক খতম করে দিয়েছে বলে স্বামী ও স্ত্রী এ অধিকারটি লাভ করবে না একথা বলা স্বয়ং কুরআনের বক্তব্য বিরোধী। কারণ কুরআন এক জনের মরে যাওয়ার পর অন্যজনকে উত্তাধিকারী গণ্য করেছে। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কোন একজনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলে অন্যজনের বংশের কোন মর্যাদাহানি হয় না একথাটি স্বামীর ব্যাপারে সঠিক হলেও হতে পারে কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারে একদম সঠিক নয়। কারণ যার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তার তো সমস্ত সন্তান সন্ততির বংশধারাও সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া শুধুমাত্র বংশের মর্যাদাহানির কারণে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব গণ্য করা হয়েছে, এ চিন্তাও সঠিক নয়। বংশের সাথে সাথে মান-সম্মান-ইজ্জত-আবরুর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন পুরুষ ও নারীর জন্য তার স্বামী বা স্ত্রীকে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিনী গণ্য করা কম মর্যাদাহানিকর নয়। কাজেই ব্যভিচারের মিথ্যা সাক্ষ দেবার দাবী যদি উত্তরাধিকারিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে তা থেকে আলাদা করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

আট ঃ কোন ব্যক্তি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে একথা প্রমাণ হয়ে যাবার পর কেবলমাত্র নিম্নলিখিত জিনিসটিই তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে। তাকে এমন চারজন সাক্ষী আনতে হবে যারা আদালতে এ মর্মে সাক্ষ দেবে যে, তারা অপবাদ আরোপিত জনকে ওমুক পুরুষ বা মেয়ের সাথে কার্যত যিনা করতে দেখেছে। হানাফীয়াদের মতে এ চারজন সাক্ষীকে একই সংগে আদালতে আসতে হবে এবং একই সংগে তাদের সাক্ষ দিতে হবে। কারণ যদি তারা একের পর এক আসে তাহলে তাদের প্রত্যেকে মিথ্যা অপবাদদাতা হয়ে যেতে থাকবে এবং তার জন্য আবার চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়ে পড়বে। কিন্তু এটি একটি দুর্বল কথা। ইমাম শাফেঈ ও উসমানুল বাত্তি এ ব্যাপারে যে

কথা বলেছেন সেটিই সঠিক। তারা বলেছেন, সাক্ষীদের একসংগে বা একের পর এক আসার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বরং বেশী ভাল হয় যদি অন্যান্য মামলার মতো এ মামলায়ও সাক্ষীরা একের পর এক আসে এবং সাক্ষ দেয়। হানাফীয়াদের মতে এ সাক্ষীদের "আদেল" তথা ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া জরুরী নয়। যদি অপবাদদাতা চারজন ফাসেক সাক্ষীও আনে তাহলে সে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিও যিনার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কারণ সাক্ষী "আদেল" নয়। তবে কাফের, অন্ধ, গোলাম বা মিথ্যা অপবাদের অপরাধে পূর্বাহ্নে শাস্তিপ্রাপ্ত সাক্ষী পেশ করে অপবাদদাতা শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কিন্তু ইমাম শাফেঈ বলেন, অপবাদদাতা যদি ফাসেক সাক্ষী পেশ করে, তাহলে সে এবং তার সাক্ষী সবাই শরীয়াতের শাস্তির যোগ্য হবে। ইমাম মালেকও একই রায় পেশ করেন। এ ব্যাপারে হানাফীয়াদের অভিমতই নির্ভুলতার বেশী নিকটবর্তী বলে মনে হয়। সাক্ষী যদি "আদেল" (ন্যায়নিষ্ঠ) হয় অপবাদদাতা অপবাদের অপরাধ মুক্ত হয়ে যাবে এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হবে। কিন্তু সাক্ষী যদি "আদেল" না হয়, তাহলে অপবাদদাতার অপবাদ, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির যিনা ও সাক্ষীদের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাচার সবই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকেও শরীয়াতের শাস্তির উপযুক্ত গণ্য করা যেতে পারবে না।

নয় ঃ যে ব্যক্তি এমন সাক্ষ পেশ করতে সক্ষম হবে না, যা তাকে অপবাদের অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারে তার ব্যাপারে কুরআন তিনটি নির্দেশ দেয় ঃ এক, তাকে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত করতে হবে। দুই, তার সাক্ষ কখনো গৃহীত হবে না। তিন, সে ফাসেক হিসেবে চিহ্নিত হবে। অতপর কুরআন বলছে ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

"তারা ছাড়া যারা এরপর তাওবা করে ও সংশোধন করে নেয়, কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (আন নূর–৫)

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, এখানে তাওবা ও সংশোধনের মাধ্যমে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্ক ঐ তিনটি নির্দেশের মধ্য থেকে কোন্‌টির সাথে আছে? প্রথম হুকুমটির সাথে এর সম্পর্ক নেই, এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। অর্থাৎ তাওবার মাধ্যমে 'হদ' তথা শরীয়াতের শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে না এবং যে কোন অবস্থায়ই অপরাধীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। শেষ হুকুমটির সাথে ক্ষমার সম্পর্ক আছে, এ ব্যাপারেও সকল ফকীহ একমত। অর্থাৎ তাওবা করার ও সংশোধিত হবার পর অপরাধী ফাসেক থাকবে না। আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। (এ ব্যাপারে অপরাধী শুধুমাত্র মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণেই ফাসেক হয়, না আদালতের ফায়সালা ঘোষিত হবার পর ফাসেক হিসেবে গণ্য হয়, সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ ও লাইস ইবনে সা'দের মতে, মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণেই ফাসেক হয়। এ কারণে তাঁরা সে সময় থেকেই তাকে প্রত্যাখ্যাত সাক্ষী গণ্য করেন। বিপরীতপক্ষে ইমাম আবু হানীফা, তাঁর সহযোগীগণ ও ইমাম মালেক বলেন, আদালতের ফায়সালা জারি হবার পর সে ফাসেক হয়। তাই তাঁরা হুকুম জারি হবার পূর্ব পর্যন্ত তাকে গ্রহণযোগ্য সাক্ষী মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য

হচ্ছে, অপরাধীর আল্লাহর কাছে ফাসেক হওয়ার ব্যাপারটি মিথ্যা অপবাদ দেবার ফল এবং তার মানুষের কাছে ফাসেক হওয়ার বিষয়টি আদালতে তার অপরাধ প্রমাণিত হওয়া এবং তার শাস্তি পাওয়ার ওপর নির্ভর করে।) এখন থেকে যায় মাঝখানের হুকুমটি অর্থাৎ "মিথ্যা অপবাদদাতার সাক্ষ কখনো গ্রহণ করা হবে না।" إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا বাক্যাংশটির সম্পর্ক এ হুকুমটির সাথে আছে কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের অভিমত ব্যাপকভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল বলেন, কেবলমাত্র শেষ হুকুমটির সাথে এ বাক্যাংশটির সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওবা ও সংশোধন করে নেবে সে আল্লাহর সমীপে এবং মানুষের কাছেও ফাসেক থাকবে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রথম দু'টি হুকুম অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ অপরাধীর বিরুদ্ধে শরীয়াতের শাস্তি জারি করা হবে এবং তার সাক্ষও চিরকাল প্রত্যাখ্যাত থাকবে। এ দলে রয়েছেন কাযী শুরাইহ্, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ', ইবনে সিরীন, মাকহুল, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ, আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মাদ, সুফ্ইয়ান সওরী ও হাসান ইবনে সালেহর মতো শীর্ষ স্থানীয় ফকীহগণ। দ্বিতীয় দলটি বলেন, إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا এর সম্পর্ক প্রথম হুকুমটির সাথে তো নেই–ই তবে শেষের দু'টো হুকুমের সাথে আছে। অর্থাৎ তাওবার পর মিথ্যা অপবাদে শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীর সাক্ষও গ্রহণ করা হবে এবং সে ফাসেক হিসেবেও গণ্য হবে না। এ দলে রয়েছেন আতা, তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, সালেম, যুহরী, ইকরামাহ, উমর ইবনুল আযীয, ইবনে আবী নুজাইহ্, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, মাসরূক, দ্বাহ্হাক, মালেক ইবনে আনাস, উসমান আলবাত্তী, লাইস ইবনে সা'দ, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইবনে জারীর তাবারীর মতো শ্রেষ্ঠ ফকীহবৃন্দ। এরা নিজেদের মতের সমর্থনে অন্যান্য যুক্তি–প্রমাণের সাথে সাথে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুগীরাহ ইবনে শু'বার মামলায় যে ফায়সালা দিয়েছিলেন সেটিও পেশ করে থাকেন। কারণ তার কোন কোন বর্ণনায় একথা বলা হয়েছে যে, 'হদ' জারি করার পর হযরত উমর (রা) আবু বাক্রাহ ও তার দু' সাথীকে বলেন, যদি তোমরা তাওবা করে নাও (অথবা "নিজেদের মিথ্যাচারিতা স্বীকার করে নাও") তাহলে আমি আগামীতে তোমাদের সাক্ষ গ্রহণ করে নেবো অন্যথায় তা গ্রহণ করা হবে না। সাথী দু'জন স্বীকার করে নেয় কিন্তু আবু বাক্রাহ নিজের কথায় অনঢ় থাকেন। বাহ্যত এটি একটি বড় শক্তিশালী সমর্থন মনে হয়। কিন্তু মুগীরাহ ইবনে শু'বার মামলার যে বিস্তারিত বিবরণী আমি পূর্বেই পেশ করেছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার প্রকাশ হয়ে যাবে যে, এ নজিরের ভিত্তিতে এ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা ঠিক নয়। সেখানে মূল কাজটি ছিল সর্ববাদী সম্মত এবং স্বয়ং মুগীরাহ ইবনে শু'বাও এটি অস্বীকার করেননি। মেয়েটি কে ছিল, এ নিয়ে ছিল বিরোধ। মুগীরাহ (রা) বলছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রী, যাকে এরা উম্মে জামীল মনে করেছিলেন। এ সংগে একথাও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, হযরত মুগীরার স্ত্রী ও উম্মে জামীলের চেহারায় এতটা সাদৃশ্য ছিল যে, ঘটনাটি যে পরিমাণ আলোয় যতটা দূর থেকে দেখা গেছে তাতে মেয়েটিকে উম্মে জামীল মনে করার মতো ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আন্দাজ–অনুমান সবকিছু ছিল মুগীরার পক্ষে এবং বাদীপক্ষের একজন সাক্ষীও একথা স্বীকার করেছিলেন যে, মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। এ কারণে হযরত উমর (রা) মুগীরাহ ইবনে শু'বার পক্ষে রায় দেন এবং ওপরে উল্লেখিত হাদীসে যে কথাগুলো উদ্ধৃত হয়েছে আবু বাক্রাহকে শাস্তি দেবার পর

সেগুলো বলেন। এসব অবস্থা পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, হযরত ওমরের উদ্দেশ্য ছিল আসলে একথা বুঝানো যে, তোমরা অযথা একটা কুধারণা পোষণ করেছিলে, একথা মেনে নাও এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরনের কুধারণার ভিত্তিতে লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ না দেবার ওয়াদা কর। অন্যথায় ভবিষ্যতে তোমাদের সাক্ষ কখনো গৃহীত হবে না। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে না যে, সুস্পষ্ট মিথ্যাবাদী প্রমাণিত ব্যক্তিও যদি তাওবা করে তাহলে এরপর হযরত উমরের মতে তার সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। আসলে এ বিষয়ে প্রথম দলটির মতই বেশী শক্তিশালী মনে হয়। মানুষের তাওবার অবস্থা অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া আর কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমাদের সামনে যে ব্যক্তি তাওবা করবে আমরা তাকে বড় জোর ফাসেক বলবো না। এতটুকু সুবিধা তাকে আমরা দিতে পারি। কিন্তু যার মুখের কথার ওপর আস্থা একবার খতম হয়ে গেছে সে কেবলমাত্র আমাদের সামনে তাওবা করছে বলে তার মুখের কথাকে আবার দাম দিতে থাকবো, এত বেশী সুবিধা তাকে দেয়া যেতে পারে না। এ ছাড়া কুরআনের আয়াতের বর্ণনাভংগীও একথাই বলছে- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (তবে যারা তাওবা করেছে) এর সম্পর্ক শুধুমাত্র أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (তারাই ফাসেক) এর সাথেই রয়েছে। তাই এ বাক্যের মধ্যে প্রথম দু'টি কথা বলা হয়েছে কেবলমাত্র নির্দেশমূলক শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ "তাদেরকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো।", "এবং তাদের সাক্ষ কখনো গ্রহণ করো না।" আর তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে খবর পরিবেশন করার ভংগীতে। অর্থাৎ "তারা নিজেরাই ফাসেক।" এ তৃতীয় কথাটির পরে সাথে সাথেই "তারা ছাড়া যারা তাওবা করে নিয়েছে" একথা বলা প্রকাশ করে দেয় যে, এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি শেষের খবর পরিবেশন সংক্রান্ত বাক্যাংশটির সাথে সম্পর্কিত। পূর্বের দু'টি নির্দেশমূলক বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক নেই। তবুও যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি শেষ বাক্যাংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, তাহলে এরপর বুঝে আসে না তা "সাক্ষগ্রহণ করো না" বাক্যাংশ পর্যন্ত এসে থেমে গেল কেন, "আশি ঘা বেত্রাঘাত করো" বাক্যাংশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল না কেন?

দশ : প্রশ্ন করা যেতে পারে, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا এর মাধ্যমে ব্যতিক্রম করাটাকে প্রথম হুকুমটির সাথে সম্পর্কিত বলে মেনে নেয়া যায় না কেন? মিথ্যা অপবাদ তো আসলে এক ধরনের মানহানিই। এরপর এক ব্যক্তি নিজের দোষ মেনে নিয়েছে, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কাজ করবে না বলে তাওবা করেছে। তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না কেন? অথচ আল্লাহ নিজেই হুকুম বর্ণনা করার পর বলছেন, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا .... فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ মাফ করে দেবেন কিন্তু বান্দা মাফ করবে না, এটাতো সত্যই বড় অদ্ভুত ব্যাপার হবে। এর জবাব হচ্ছে : তাওবা আসলে ت - و - ب - ه সমন্বিত চার অক্ষরের একটি শব্দ মাত্র নয়। বরং হৃদয়ের লজ্জানুভূতি, সংশোধনের দৃঢ়সংকল্প ও সততার দিকে ফিরে যাওয়ার নাম। আর এ জিনিসটির অবস্থা আর কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই তাওবার কারণে পার্থিব শাস্তি মাফ হয় না। বরং শুধুমাত্র পরকালীন শাস্তি মাফ হয়। এ কারণে আল্লাহ বলেননি, যদি তারা তাওবা করে নেয় তাহলে তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দাও বরং বলেছেন, যারা তাওবা করে নেবে আমি তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়। যদি তাওবার সাহায্যে পার্থিব শাস্তি মাফ হয়ে যেতে থাকে, তাহলে শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাওবা করবে না এমন অপরাধী কে আছে?

এগার ঃ এ প্রশ্নও করা যেতে পারে, এক ব্যক্তির নিজের অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করতে না পারার মানে তো এ নয় যে, সে মিথ্যুক। এটা কি সম্ভব নয় যে, তার অভিযোগ যথার্থই সঠিক কিন্তু সে এর স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি? তাহলে শুধুমাত্র প্রমাণ পেশ করতে না পারার কারণে তাকে কেবল মানুষের সামনেই নয়, আল্লাহর সামনেও ফাসেক গণ্য করা হবে, এর কারণ কি? এর জবাব হচ্ছে, এক ব্যক্তি নিজের চোখেও যদি কাউকে ব্যভিচার করতে দেখে তাহলেও সে তা নিয়ে আলোচনা করলে এবং সাক্ষী ছাড়া তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করতে থাকলে গোনাহগার হবে। এক ব্যক্তি যদি কোন ময়লা আবর্জনা নিয়ে এক কোণে বসে থাকে তাহলে অন্য ব্যক্তি উঠে সমগ্র সমাজ দেহে তা ছড়িয়ে বেড়াক আল্লাহর শরীয়াত এটা চায় না। সে যদি এ ময়লা–আবর্জনার খবর জেনে থাকে তাহলে তার জন্য দু'টি পথ থাকে। যেখানে তা পড়ে আছে সেখানে তাকে পড়ে থাকতে দেবে অথবা তার উপস্থিতির প্রমাণ পেশ করবে, যাতে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ তা পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন। এ দু'টি পথ ছাড়া তৃতীয় কোন পথ তার জন্য নেই। যদি সে জনগণের মধ্যে এর আলোচনা শুরু করে দেয় তাহলে এক জায়গায় আটকে থাকা আবর্জনাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার অপরাধে অভিযুক্ত হবে। আর যদি সে যথেষ্ট পরিমাণ সাক্ষ ছাড়াই বিষয়টি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে নিয়ে যায় তাহলে শাসকগণ তা পরিষ্কার করতে পারবেন না। ফলে এ মামলায় ব্যর্থতা আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ার কারণও হবে এবং ব্যভিচারীদের মনে তা সাহসের সঞ্চারও করবে। এ জন্য সাক্ষ–প্রমাণ ছাড়া মিথ্যা অভিযোগকারী বাস্তবে যতই সত্যবাদী হোক না কেন সে একজন ফাসেকই।

বার ঃ মিথ্যা অপবাদের 'হদে'র ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে, অপবাদদাতাকে যিনাকারীর তুলনায় হাল্‌কা মার মারতে হবে। অর্থাৎ ৮০ ঘা বেতই মারা হবে কিন্তু যিনাকারীকে যেমন কঠোরভাবে প্রহার করা হয় তাকে ঠিক ততটা কঠোরভাবে প্রহার করা হবে না। কারণ যে অভিযোগের দরুন তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে তার মিথ্যাবাদী হওয়াটা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

তের ঃ মিথ্যা অপবাদের পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে হানাফী ও অধিকাংশ ফকীহের অভিমত হচ্ছে এই যে, অপবাদদাতা শাস্তি পাবার আগে বা মাঝখানে যতবারই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করুক না কেন 'হদ' তার ওপর একবারই জারি হবে। আর যদি হদ জারি করার পর সে নিজের পূর্ববর্তী অপরাধেরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে তাহলে যে 'হদ' তার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে তা–ই যথেষ্ট হবে। তবে যদি হদ জারি করার পর সে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নতুন কোন যিনার অপবাদ দেয় তাহলে আবার নতুন করে মামলা দায়ের করা হবে। মুগীরাহ ইবনে শু'বার (রা) মামলায় শাস্তি পাবার পর আবু বাক্‌রাহ প্রকাশ্যে বলতে থাকেন, "আমি সাক্ষ দিচ্ছি, মুগীরাহ যিনা করেছিল।" হযরত উমর (রা) আবার তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সংকল্প করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আগের অপবাদেরই পুনরাবৃত্তি করছিলেন, তাই হযরত আলী (রা) তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা চালানো যেতে পারে না বলে রায় দেন। হযরত উমর তাঁর রায় গ্রহণ করেন। এরপর ফকীহগণ ঐকমত্যে পৌঁছেন যে, শাস্তিপ্রাপ্ত মিথ্যা অপবাদদাতাকে কেবলমাত্র নতুন অপবাদেই পাকড়াও করা যেতে পারে, আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তিতে নয়।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑥
وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ⑦ وَيَدْرَؤُا
عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ⑧
وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑨ وَلَوْلَا فَضْلُ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ⑩

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অভিযোগ দেয় এবং তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সাক্ষী থাকে না, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির সাক্ষ হচ্ছে (এই যে, সে) চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ দেবে যে, সে (নিজের অভিযোগে) সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক যদি সে (নিজের অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। আর স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ দেয় যে, এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলে, তার নিজের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসুক যদি এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।[৭] *তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ বড়ই মনোযোগ দানকারী ও জ্ঞানী না হলে (স্ত্রীদের প্রতি অভিযোগের ব্যাপার তোমাদেরকে বড়ই জটিলতার সম্মুখীন করতো)।*

চৌদ্দ ঃ কোন দল বা গোষ্ঠীর ওপর মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফীরা বলেন, যদি এক ব্যক্তি বহু লোকের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, যদিও তা একটি শব্দে বা আলাদা আলাদা শব্দে হয়, তাহলেও তার ওপর একটি 'হদ' জারি করা হবে। তবে যদি 'হদ' জারির পর সে আবার কোন নতুন মিথ্যা অপবাদের অবতারণা করে তাহলে সে জন্য পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কারণ আয়াতের শব্দের মধ্যে বলা হয়েছে ঃ "যারা সতী সাধ্বী মেয়েদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়।" এ থেকে জানা যায়, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধেই নয়, একটি দলের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীও শুধুমাত্র একটি 'হদের' হকদার হয়। এ ব্যাপারে আরো একটি যুক্তি এই যে, যিনার এমন কোন অপবাদই হতে পারে না যা কমপক্ষে দু'ব্যক্তির ওপর আরোপিত হয় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরীয়াত প্রবর্তক একটি 'হদেরই হুকুম দিয়েছেন। নারীর বিরুদ্ধে অপবাদের জন্য আলাদা

এবং পুরুষের বিরুদ্ধে অপবাদের জন্য আলাদা 'হদ' জারি করার হুকুম দেননি। এর বিপরীতে ইমাম শাফেঈ বলেন, একটি দলের বিরুদ্ধে অপবাদ দানকারী, এক শব্দে বা আলাদা আলাদা শব্দে অপবাদ দান করুক না কেন, সে জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বাবদ এক একটি পূর্ণ 'হদ' জারি করা হবে। উসমান আলবাত্তীও এ অভিমত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে ইবনে আবীলাইলার উক্তি, শা'বী ও আওযাঈও যার সাথে অভিন্ন মত পোষণ করেন তা হচ্ছে এই যে, একটি বিবৃতির মাধ্যমে পুরো দলের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপকারী একটি হদের হকদার হবে এবং আলাদা আলাদা বিবৃতির মাধ্যমে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপকারী প্রত্যেকটি অপবাদের জন্য আলাদা আলাদা হদের অধিকারী হবে।

৭. এ আয়াত পেছনের আয়াতের কিছুকাল পরে নাযিল হয়। মিথ্যা অপবাদের বিধান যখন নাযিল হয় তখন লোকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয়, ভিন পুরুষ ও নারীর চরিত্রহীনতা দেখে তো মানুষ সবর করতে পারে, সাক্ষী না থাকলে ঠোঁটে তালা লাগাতে পারে এবং ঘটনাটি উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু নিজের স্ত্রীর চরিত্রহীনতা দেখলে কি করবে? হত্যা করলেতো উল্টো শাস্তিলাভের যোগ্য হয়ে যাবে। সাক্ষী খুঁজতে গেলে তাদের আসা পর্যন্ত অপরাধী সেখানে অপেক্ষা করতে যাবে কেন? আর সবর করলে তা করবেই বা কেমন করে। তালাক দিয়ে স্ত্রীকে বিদায় করে দিতে পারে। কিন্তু এর ফলে না মেয়েটির কোন বস্তুগত বা নৈতিক শাস্তি হলো, না তার প্রেমিকের। আর যদি তার অবৈধ গর্ভসঞ্চার হয়, তাহলে অন্যের সন্তান নিজের গলায় ঝুললো। এ প্রশ্নটি প্রথমে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ একটি কাল্পনিক প্রশ্নের আকারে পেশ করেন। তিনি এতদূর বলে দেন, আমি যদি আল্লাহ না করুন নিজের ঘরে এ অবস্থা দেখি, তাহলে সাক্ষীর সন্ধানে যাবো না বরং তলোয়ারের মাধ্যমে তখনই এর হেস্তনেস্ত করে ফেলবো। (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু মাত্র কিছুদিন পরেই এমন কিছু মামলা দায়ের হলো যেখানে স্বামীরা স্বচক্ষেই এ ব্যাপার দেখলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এর অভিযোগ নিয়ে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমরের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আনসারদের এক ব্যক্তি (সম্ভবত উওয়াইমির আজ্‌লানী) রসূলের সামনে হাযির হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে পরপুরুষকে পায় এবং সে মুখ থেকে সে কথা বের করে ফেলে, তাহলে আপনি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের 'হদ' জারি করবেন, হত্যা করলে আপনি তাকে হত্যা করবেন, নীরব থাকলে সে চাপা ক্রোধে ফুঁসতে থাকবে। শেষমেশ সে করবে কি? একথায় রসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ! এ বিষয়টির ফায়সালা করে দাও। (মুসলিম, বুখারী, আবু দাউদ, আহমাদ ও নাসাঈ) ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হেলাল ইবনে উমাইয়াহ এসে নিজের স্ত্রীর ব্যাপারটি পেশ করেন। তিনি তাকে নিজের চোখে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতে দেখেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "প্রমাণ আনো, অন্যথায় তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি জারি হবে।" এতে সাহাবীদের মধ্যে সাধারণভাবে পেরেশানী সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হেলাল বলেন, সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি একদম সঠিক ঘটনাই তুলে ধরছি, আমার চোখ এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এবং কান শুনেছে। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আমার ব্যাপারে এমন হুকুম নাযিল করবেন যা আমার পিঠ বাঁচাবে। এ ঘটনায় এ আয়াত

নাযিল হয়। (বুখারী, আহমাদ ও আবু দাউদ) এখানে মীমাংসার যে পদ্ধতি দেয়া হয়েছে তাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় "লি'আন" বলা হয়।

এ হুকুম এসে যাবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব মামলার ফায়সালা দেন সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের কিতাবগুলোতে লিখিত আকারে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেগুলোই লি'আন সংক্রান্ত বিস্তারিত আইনগত কার্যধারার উৎস।

হেলাল ইবনে উমাইয়ার মামলার যে বিস্তারিত বিবরণ সিহাহে সিত্তা ও মুসনাদে আহমাদ এবং তাফসীরে ইবনে জারিরে ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ঃ এ আয়াত নাযিল হবার পর হেলাল ও তার স্ত্রী দু'জনকে নবীর আদালতে হাযির করা হয়। রসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে আল্লাহর হুকুম শুনান। তারপর বলেন, "খুব ভালভাবে বুঝে নাও, আখেরাতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির চাইতে কঠিন।" হেলাল বলেন, "আমি এর বিরুদ্ধে একদম সত্য অভিযোগ দিয়েছি।" স্ত্রী বলে, "এ সম্পূর্ণ মিথ্যা।" রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "বেশ, তাহলে এদের দু'জনের মধ্যে লি'আন করানো হোক।" তদনুসারে প্রথমে হেলাল উঠে দাঁড়ান। তিনি কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কসম খাওয়া শুরু করেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বলতে থাকেন, "আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যেবাদী। তারপর কি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাওবা করবে?" পঞ্চম কসমের পূর্বে উপস্থিত লোকেরা হেলালকে বললো, "আল্লাহকে ভয় করো। দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির চেয়ে হালকা। এ পঞ্চম কসম তোমার ওপর শাস্তি ওয়াজিব করে দেবে।" কিন্তু হেলাল বলেন, যে আল্লাহ এখানে আমার পিঠ বাঁচিয়েছেন তিনি পরকালেও আমাকে শাস্তি দেবেন না। একথা বলে তিনি পঞ্চম কসমও খান। তারপর তার স্ত্রী ওঠে। সেও কসম খেতে শুরু করে। পঞ্চম কসমের পূর্বে তাকেও থামিয়ে বলা হয়, "আল্লাহকে ভয় করো, আখেরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব বরদাশ্ত করে নেয়া সহজ। এ শেষ কসমটি তোমার ওপর আল্লাহর আযাব ওয়াজিব করে দেবে।" একথা শুনে সে কিছুক্ষণ থেমে যায় এবং ইতস্তত করতে থাকে। লোকেরা মনে করে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে চাচ্ছে। কিন্তু তারপর সে বলতে থাকে, "আমি চিরকালের জন্য নিজের গোত্রকে লাঞ্ছিত করবো না।" তারপর সে পঞ্চম কসমটিও খায়। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং ফায়সালা দেন, এর সন্তান (যে তখন মাতৃগর্ভে ছিল) মায়ের সাথে সম্পর্কিত হবে। বাপের সাথে সম্পর্কিত করে তার নাম ডাকা হবে না। তার বা তার সন্তানের প্রতি অপবাদ দেবার অধিকার কারোর থাকবে না। যে ব্যক্তি তার বা তার সন্তানের প্রতি অপবাদ দেবে সে মিথ্যা অপবাদের (কাযাফ) শাস্তির অধিকারী হবে। ইদ্দতকালে তার খোরপোশ ও বাসস্থানলাভের কোন অধিকার হেলালের ওপর বর্তায় না। কারণ তাকে তালাক বা মৃত্যু ছাড়াই স্বামী থেকে আলাদা করা হচ্ছে। তারপর তিনি লোকদের বলেন, তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখো সে কার মতো হয়েছে। যদি এ আকৃতির হয় তাহলে হেলালের হবে। আর যদি ঐ আকৃতির হয়, তাহলে যে ব্যক্তির সাথে মিলিয়ে একে অপবাদ দেয়া হয়েছে এ তার হবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখা গেলো সে শেষোক্ত ব্যক্তির আকৃতি পেয়েছে। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لكان لى ولها شان (لولا مضى من كتاب الله অথবা বর্ণনান্তরে لو لا الايمان

অর্থাৎ যদি কসমসমূহ না হতো (অথবা আল্লাহর কিতাব প্রথমেই ফায়সালা না করে দিতো) তাহলে আমি এ মেয়েটির সাথে কঠোর ব্যবহার করতাম।

'উওয়াইমির আজলানীর মামলার বিবরণ পাওয়া যায় বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে। সাহল ইবনে সা'দ সা'ঈদী ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এগুলো বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ উওয়াইমির ও তার স্ত্রী উভয়কে মসজিদে নববীতে ডাকা হয়। তারা নিজেদের ওপর 'লি'আন' করার আগে রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকেও সতর্ক করে দিয়ে তিনবার বলেন, "আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তাহলে কি তোমাদের কেউ তাওবা করবে?" দু'জনের কেউ যখন তাওবা করলো না তখন তাদের 'লি'আন' করানো হয়। এরপর 'উওয়াইমির বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি এ স্ত্রীকে রেখে দেই তাহলে মিথ্যুক হবো।" একথা বলেই রসূলুল্লাহ (সা) তাকে হুকুম দেয়া ছাড়াই তিনি তিন তালাক দিয়ে দেন। সাহ্ল ইবনে সা'দ বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) এ তালাক জারি করেন, তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং বলেন, "যে দম্পতি লি'আন করবে তাদের জন্য এ ছাড়াছাড়ি।" লি'আনকারী স্বামী–স্ত্রীকে আলাদা করে দেবার এ সুন্নাত কায়েম হয়ে যায়। এরপর তারা আর কখনো একত্র হতে পারবে না। সাহ্ল ইবনে সা'দ একথাও বর্ণনা করেন যে, স্ত্রী গর্ভবতী ছিল এবং 'উওয়াইমির বলেন, এ গর্ভ আমার ঔরসজাত নয়। এ জন্য শিশুকে মায়ের সাথে সম্পর্কিত করা হয় এবং এ সুন্নাত জারি হয় যে, এ ধরনের সন্তান মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং মা তার উত্তরাধিকারী হবে।

এ দু'টি মামলা ছাড়া হাদীসের কিতাবগুলোতে আমরা এমন বহু রেওয়ায়াত পাই যেগুলো থেকে এ মামলাগুলো কাদের সাথে জড়িত ছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। হতে পারে সেগুলোর কোন কোনটি এ দু'টি মামলার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু কয়েকটিতে অন্য কিছু মামলার কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলো থেকে লি'আন আইনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত হয়।

ইবনে উমর একটি মামলার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বামী–স্ত্রী লি'আন শেষ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ ও ইবনে জারীর) ইবনে উমরের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করানো হয়। তারপর স্বামীটি গর্ভের সন্তান অস্বীকার করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং ফায়সালা শুনিয়ে দেন, সন্তান হবে শুধুমাত্র মায়ের। (সিহাহে সিত্তা ও আহমাদ) ইবনে উমরেরই আর একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, উভয়ের লি'আন করার পরে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তোমাদের হিসাব এখন আল্লাহর জিম্মায়। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যুক।" তারপর তিনি পুরুষটিকে বলেন, لا سبيل لك عليها (অর্থাৎ এখন এ আর তোমার নয়। তুমি এর ওপর নিজের কোন অধিকার দেখাতে পারো না। এর ওপর কোনরকম হস্তক্ষেপও করতে পারো না। অথবা এর বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকারও আর তোমার নেই)। পুরুষটি বলে, হে আল্লাহর রসূল! আর আমার সম্পদ? (অর্থাৎ যে মোহরানা আমি তাকে দিয়েছিলাম তা আমাকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করুন)। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

لَا مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ اَبْعَدُ وَاَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا -

"সম্পদ ফেরত নেবার কোন অধিকার তোমার নেই। যদি তুমি তার ওপর সত্য অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে ঐ সম্পদ সে আনন্দ উপভোগের প্রতিদান যা তুমি হালাল করে তার থেকে লাভ করেছো। আর যদি তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে সম্পদ তোমার কাছ থেকে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। তার তুলনায় তোমার কাছ থেকে তা বেশী দূরে রয়েছে।" (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)।

দারুকুত্নী আলী ইবনে আবু তালেব ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উক্তি উদ্ধৃত করেছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ "সুন্নাত এটিই নির্ধারিত হয়েছে যে, লি'আনকারী স্বামী–স্ত্রী পরবর্তী পর্যায়ে আর কখনো একত্র হতে পারে না।" (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আর কোনদিন তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না)। আবার এ দারুকুত্নী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরা দু'জন আর কখনো একত্র হতে পারে না।

কাবীসাহ ইবনে যুওয়াইব বর্ণনা করেছেন, হযরত উমরের আমলে এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে অবৈধ গণ্য করে তারপর আবার তা নিজের বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বলতে থাকে, এ শিশু আমার নয়। ব্যাপারটি হযরত উমরের আদালতে পেশ হয়। তিনি তার ওপর কাযাফের শাস্তি জারি করেন এবং ফায়সালা দেন, শিশু তার সাথেই সম্পর্কিত হবে। (দারুকুত্নী, বাইহাকী)।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বলে, আমার একটি স্ত্রী আছে, আমি তাকে ভীষণ ভালবাসি। কিন্তু তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, সে কোন স্পর্শকারীর হাত ঠেলে দেয় না। (উল্লেখ্য, এটি একটি রূপক ছিল। এর অর্থ যিনাও হতে পারে আবার যিনার কম পর্যায়ের নৈতিক দুর্বলতাও হতে পারে।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তালাক দিয়ে দাও। সে বলে, আমি তাকে ছাড়া থাকতে পারি না। জবাব দেন, তুমি তাকে রেখে দাও। (অর্থাৎ তিনি তার কাছ থেকে তার ইংগিতের ব্যাখ্যা নেননি এবং তার উক্তিকে যিনার অপবাদ হিসেবে গণ্য করে লি'আন করার হুকুম দেননি।)–নাসাঈ।

আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বলে, আমার স্ত্রী কালো ছেলে জন্ম দিয়েছে। আমি তাকে আমার সন্তান বলে মনে করি না। (অর্থাৎ নিছক শিশু সন্তানের গায়ের রং তাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। নয়তো তার দৃষ্টিতে স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ লাগাবার অন্য কোন কারণ ছিল না।) রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমার তো কিছু উট আছে? সে বলে, হাঁ, আছে। জিজ্ঞেস করেন, সেগুলোর রং কি? জবাব দেয়, লাল। জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে কোনটা কি খাকি রংয়ের আছে? জবাব দেয়, জি হাঁ, কোন কোনটা এমনও আছে। জিজ্ঞেস করেন, এ রংটি কোথায় থেকে এলো? জবাব দেয়, হয়তো কোন শিরা টেনে নিয়ে গেছে। (অর্থাৎ তাদের বাপ–দাদাদের কেউ এ রংয়ের থেকে থাকবে এবং তার প্রভাব এর মধ্যে এসে গেছে।) তিনি বলেন, "সম্ভবত এ শিশুটিকেও কোন শিরা টেনে নিয়ে গেছে।" তারপর তিনি তাকে সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার অনুমতি দেননি। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ও আবু দাউদ।)

আবু হুরাইরার (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লি'আন সম্পর্কিত আয়াত আলোচনা প্রসংগে বলেন, "যে স্ত্রী কোন বংশে এমন সন্তান প্রবেশ করায় যে ঐ বংশের নয় (অর্থাৎ হারামের শিশু গর্ভে ধারণ করে স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়) তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাকে কখ্‌খনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজের সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে অথচ সন্তান তাকে দেখছে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে পরদা করবেন এবং পূর্বের ও পরের সমস্ত সৃষ্টির সামনে তাকে লাঞ্ছিত করবেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী।)

লি'আনের আয়াত এবং এ হাদীসগুলো, নজিরসমূহ ও শরীয়াতের সাধারণ মূলনীতি–গুলোই হচ্ছে ইসলামে লি'আনের আইনের উৎস। এগুলোর আলোকে ফকীহগণ লি'আনের বিস্তারিত আইন–কানুন তৈরী করেছেন। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখে লি'আনের পথ অবলম্বন না করে হত্যা করে বসে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে। কারণ নিজের উদ্যোগে 'হদ' জারি করার তথা আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার তার ছিল না। দ্বিতীয় দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে না এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহিও করতে হবে না, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হতে হবে (অর্থাৎ যথার্থই সে তার যিনার কারণে এ কাজ করেছে)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়াইহ্‌ বলেন, এটিই হত্যার কারণ এ মর্মে তাকে দু'জন সাক্ষী আনতে হবে। মালেকীদের মধ্যে ইবনুল কাসেম ও ইবনে হাবীব এ মর্মে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে সেই যিনাকারীর বিবাহিত হতে হবে। অন্যথায় কুমার যিনাকারীকে হত্যা করলে তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে তাকে কিসাস থেকে শুধুমাত্র তখনই মাফ করা হবে যখন সে যিনার চারজন সাক্ষী পেশ করবে অথবা নিহত ব্যক্তি মরার আগে নিজ মুখে একথা স্বীকার করে যাবে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করছিল এবং এ সংগে নিহত ব্যক্তিকে বিবাহিতও হতে হবে। (নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)।

দুই ঃ ঘরে বসে লি'আন হতে পারে না। এ জন্য আদালতে যাওয়া জরুরী।

তিন ঃ লি'আন দাবী করার অধিকার শুধু স্বামীর নয়, স্ত্রীরও। স্বামী যখন তার ওপর যিনার অপবাদ দেয় অথবা তার শিশুর বংশধারা মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন স্ত্রী আদালতে গিয়ে লি'আন দাবী করতে পারে।

চার ঃ সব স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে কি লি'আন হতে পারে অথবা এ জন্য তাদের দু'জনের মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে? এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম শাফেঈ বলেন, যার কসম আইনের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য এবং যার তালাক দেবার ক্ষমতা আছে সে লি'আন করতে পারে। অর্থাৎ তার মতে শুধুমাত্র মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াই লি'আনের যোগ্যতা সম্পন্ন হবার জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে স্বামী–স্ত্রী মুসলিম বা কাফের, গোলাম বা স্বাধীন, গ্রহণযোগ্য সাক্ষের অধিকারী হোক বা না হোক এবং মুসলিম স্বামীর স্ত্রী মুসলমান বা যিম্মী যেই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। প্রায় একই ধরনের অভিমত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদেরও। কিন্তু হানাফীগণ

বলেন, লি'আন শুধুমাত্র এমন স্বাধীন মুসলমান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে যারা কাযাফের অপরাধে শাস্তি পায়নি। যদি স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই কাফের, গোলাম বা কাযাফের অপরাধে পূর্বেই শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে লি'আন হতে পারে না। এ ছাড়াও যদি স্ত্রী এর আগেও কখনো হারাম বা সন্দেহযুক্ত পদ্ধতিতে কোন পুরুষের সাথে মাখামাখি করে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও লি'আন ঠিক হবে না। হানাফীদের এ শর্তগুলো আরোপ করার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের মতে লি'আন ও কাযাফের আইনের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই যে, অন্য ব্যক্তি যদি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে তার জন্য রয়েছে 'হদ' আর স্বামী এ অপবাদ দিলে সে লি'আন করে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। বাকি অন্যান্য সব দিক দিয়ে লি'আন ও কাযাফ একই জিনিস। এ ছাড়াও হানাফীদের মতে যেহেতু লি'আনের কসম সাক্ষ দেবার মর্যাদা রাখে, তাই সাক্ষ দেবার যোগ্যতা নেই এমন কোন ব্যক্তিকে তারা এর অনুমতি দেয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে হানাফীদের অভিমত দুর্বল এবং ইমাম শাফেঈ যে কথাটি বলেছেন সেটিই সঠিক। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, কুরআন স্ত্রীর বিরুদ্ধে কাযাফের ব্যাপারটিকে কাযাফের আয়াতের একটি অংশে পরিণত করেনি বরং সে জন্য একটি স্বতন্ত্র আইন বর্ণনা করেছেন। তাই তাকে কাযাফের আইনের আওতায় এনে কাযাফের জন্য যেসব শর্ত নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো সবই তার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে না। লি'আনের আয়াতের শব্দগুলো কাযাফের আয়াতের শব্দাবলী থেকে আলাদা এবং উভয় হুকুমও ভিন্ন। তাই লি'আনের আয়াত থেকেই লি'আনের বিধান গ্রহণ করা উচিত, কাযাফের আয়াত থেকে নয়। যেমন কাযাফের আয়াতে শাস্তি লাভের যোগ্য হচ্ছে এমন লোক যে সতী সাধ্বী নারীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেবে। কিন্তু লি'আনের আয়াতে সতী সাধ্বী স্ত্রীর শর্ত আরোপ করা হয়নি। একটি মেয়ে কোন সময় হয়তো পাপ কাজ করেছিল, যদি পরবর্তীকালে সে তাওবা করে কোন পুরুষকে বিয়ে করে এবং তারপর তার স্বামী তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাহলে লি'আনের আয়াত একথা বলে না যে, এ মেয়ের স্বামীকে এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেবার বা এর সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দাও, কারণ এর জীবন এক সময় কলুষিত ছিল। দ্বিতীয় এবং ঠিক একই পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই যে, স্ত্রীর বিরুদ্ধে কাযাফ ও অপরিচিতার বিরুদ্ধে কাযাফের মধ্যে আসমান যমীন ফারাক। এদের উভয়ের ব্যাপারে আইনের প্রকৃতি এক হতে পারে না। পরনারীর সাথে অন্য পুরুষের আবেগ-অনুভূতি, স্বার্থ-অধিকার, সমাজ-সংস্কৃতি ও বংশ-গোত্রগত কোন সম্পর্ক হতে পারে না। তার চাল-চলনের ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তির খুব বেশী আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে তাহলে তা হবে তার সমাজকে চরিত্রহীনতা মুক্ত দেখার আবেগ থেকে। পক্ষান্তরে নিজের স্ত্রীর সাথে মানুষের সম্পর্ক এক ধরনের নয়, কয়েক ধরনের এবং অত্যন্ত গভীর। সে একাধারে তার বংশধারা, ধন-সম্পদ ও গৃহের আমানতদার। তার জীবন সঙ্গিনী। তার গোপনীয়তার সংরক্ষক। তার অত্যন্ত গভীর ও সংবেদনশীল আবেগ-অনুভূতি তার সাথে জড়িত। তার খারাপ চাল-চলনে মানুষের আত্মমর্যাদা, ইজ্জত, স্বার্থ ও ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর সুগভীর আঘাত আসে। এ দু'টি ব্যাপার কোন্ দিক দিয়ে এক, যার ফলে উভয়ের জন্য আইনের একই প্রকৃতি হতে হবে? একজন জিম্মী, অথবা গোলাম কিংবা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রীর ব্যাপার কি কোন স্বাধীন সাক্ষদানের যোগ্য মুসলমানের ব্যাপার থেকে সামান্যতম ভিন্ন অথবা গুরুত্ব ও [illegible]

দিক দিয়ে একটুখানিও কম? সে যদি নিজের চোখে নিজের স্ত্রীকে কারোর সাথে ডলাডলি করতে দেখতো অথবা সে যদি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতো যে, তার স্ত্রী অন্য কারোর সংস্পর্শে গর্ভবতী হয়ে গেছে, তাহলে তাকে লি'আন করার অধিকার না দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? আর এ অধিকার তার থেকে ছিনিয়ে নেবার পর আমাদের আইনে তার জন্য আর কি পথ আছে? কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার জানা যায়। বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে স্ত্রীর যথার্থ ব্যভিচার বা অবৈধ গর্ভধারণের ফলে একজন স্বামী এবং স্বামীর মিথ্যা অপবাদ বা সন্তানের বংশ অযথা অস্বীকারের ফলে একজন স্ত্রী যে জটিল সমস্যায় ভুগতে থাকে কুরআন তাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করার জন্য একটি উপায় বের করতে চায়। এ প্রয়োজন শুধুমাত্র সাক্ষদানের যোগ্য স্বাধীন মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং কুরআনের শব্দাবলীর মধ্যেও এমন কোন জিনিস নেই যা এ প্রয়োজনটি শুধুমাত্র তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তবে কুরআন লি'আনের কসমকে সাক্ষদান হিসেবে গণ্য করেছে তাই সাক্ষদানের শর্তাবলী এখানে আরোপিত হবে, এ যুক্তি পেশ করলে এর দাবী হবে, ন্যায়নিষ্ঠ গ্রহণযোগ্য সাক্ষের অধিকারী স্বামী যদি কসম খায় এবং স্ত্রী কসম খেতে ইতস্তত করে তাহলে স্ত্রীকে রজম করা হবে। কারণ ব্যভিচারের ওপর সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে, এ অবস্থায় হানাফীগণ রজম করার হুকুম দেন না। তারা নিজেরাই যে এ কসমগুলোকে হুবহু সাক্ষের মর্যাদা দান করেন না এটা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। বরং সত্য বলতে কি স্বয়ং কুরআনও এ কসমগুলোকে সাক্ষ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করলেও এগুলোকে সাক্ষ গণ্য করে না। নয়তো স্ত্রীকে চারটি কসমের পরিবর্তে আটটি কসম খাবার হুকুম দিতো।

পাঁচ ঃ নিছক ইশারা-ইংগিত, রূপক, উপমা বা সন্দেহ-সংশয় প্রকাশের ফলে লি'আন অনবার্য হয়ে পড়ে না। বরং কেবলমাত্র এমন অবস্থায় তা অনিবার্য হয় যখন স্বামী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যিনার অপবাদ দেয় অথবা সুস্পষ্ট ভাষায় সন্তানকে নিজের বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। ইমাম মালেক ও লাইস ইবনে সা'দ এর ওপর আরো এ শর্তটি বাড়ান যে, কসম খাবার সময় স্বামীকে বলতে হবে, সে নিজের চোখে স্ত্রীকে ব্যভিচারে রত থাকতে দেখেছে। কিন্তু এটি একটি ভিত্তিহীন শর্ত। কুরআনে এর কোন ভিত্তি নেই, হাদীসেও নেই।

ছয় ঃ যদি অপবাদ দেবার পর স্বামী কসম খেতে ইতস্তত করে বা ছলনার আশ্রয় নেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহযোগীগণ বলেন, তাকে বন্দী করতে হবে এবং যতক্ষণ সে লি'আন না করে অথবা নিজের অপবাদকে মিথ্যা বলে না মেনে নেয় ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেয়া হবে না। আর মিথ্যা বলে মেনে নিলে তার বিরুদ্ধে কাযাফের দণ্ড জারি হয়ে যাবে। এর বিপরীতপক্ষে ইমাম মালেক, শাফেঈ, হাসান ইবনে সালেহ ও লাইস ইবনে সা'দের মতে, লি'আন করতে ইতস্তত করার ব্যাপারটি নিজেই মিথ্যার স্বীকারোক্তি। তাই কাযাফের হদ্ ওয়াজিব হয়ে যায়।

সাত ঃ স্বামীর কসম খাওয়ার পর স্ত্রী যদি লি'আন করতে ইতস্তত করে, তাহলে হানাফীদের মতে তাকে বন্দী করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে লি'আন করবে অথবা তারপর যিনার স্বীকারোক্তি না করে নেবে। অন্যদিকে উপরোক্ত ইমামগণ বলেন, এ অবস্থায় তাকে রজম করে দেয়া হবে। তারা কুরআনের ঐ

উক্তি থেকে যুক্তি পেশ করেন যে, একমাত্র কসম খাওয়ার পরই স্ত্রী শাস্তি মুক্ত হবে। এখন যেহেতু সে কসম খাচ্ছে না, তাই নিশ্চিতভাবেই সে শাস্তির যোগ্য হবে। কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা হচ্ছে, কুরআন এখানে 'শাস্তির' ধরন বলে দেয়নি বরং সাধারণভাবে শাস্তির কথা বলছে। যদি বলা হয়, শাস্তি মানে এখানে যিনার শাস্তিই হতে পারে, তাহলে এর জবাব হচ্ছে, যিনার শাস্তির জন্য কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় চার জন সাক্ষীর শর্ত আরোপ করেছে। নিছক এক জনের চারটি কসম এ শর্ত পূরা করতে পারে না। স্বামীর কসম তো তার নিজের কাযাফের শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়া এবং স্ত্রীর ওপর লি'আনের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিন্তু তার মাধ্যমে স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ প্রমাণিত হবার জন্য যথেষ্ট নয়। স্ত্রীর জবাবী কসম খেতে অস্বীকার করার ফলে অবশ্যই সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয় এবং বড়ই গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে সত্য কিন্তু সন্দেহের ভিত্তিতে হদ্ জারি করা যেতে পারে না। এ বিষয়টিকে পুরুষের কাযাফের হদের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। কারণ তার কাযাফ তো প্রমাণিত, এ কারণেই তাকে লি'আন করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এর বিপরীতে স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ প্রমাণিত নয়। কারণ তার নিজের স্বীকারোক্তি অথবা চারজন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী সাক্ষীর সাক্ষ ছাড়া তা প্রমাণিত হতে পারে না।

আট ঃ যদি লি'আনের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকে তাহলে ইমাম আহমাদের মতে স্বামী গর্ভস্থিত সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করুক বা না করুক স্বামীর গর্ভস্থিত সন্তানের দায়মুক্ত হবার এবং সন্তান তার ঔরসজাত গণ্য না হবার জন্য লি'আন নিজেই যথেষ্ট। ইমাম শাফেঈ বলেন, স্বামীর যিনার অপবাদ ও গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করা এক জিনিস নয়। এ জন্য স্বামী যতক্ষণ গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তা যিনার অপবাদ সত্ত্বেও তার ঔরসজাত গণ্য হবে। কারণ স্ত্রী যিনাকারিনী হওয়ার ফলেই বর্তমান গর্ভজাত সন্তানটি যে, যিনার কারণে জন্ম নিয়েছে, এটা অপরিহার্য নয়।

নয় ঃ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ স্ত্রীর গর্ভধারণকালে স্বামীকে গর্ভস্থিত সন্তান অস্বীকার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং এরি ভিত্তিতে লি'আনকে বৈধ বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি স্বামীর অপবাদের ভিত্তি যিনা না হয়ে থাকে বরং শুধু এটাই হয়ে থাকে যে, সে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় গর্ভবতী পেয়েছে যখন তার মতে এ গর্ভস্থিত সন্তান তার হতে পারে না তখন এ অবস্থায় লি'আনের বিষয়টিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মূলতবী করে দেয়া উচিত। কারণ অনেক সময় কোন কোন রোগের ফলে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে সন্দেহ দেখা দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গর্ভসঞ্চার হয় না।

দশ ঃ যদি পিতা সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে লি'আন অনিবার্য হয়ে পড়ে, এ ব্যাপারে সবাই একমত। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, একবার সন্তানকে গ্রহণ করে নেবার পর (সে গ্রহণ করাটা যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন, সুস্পষ্ট শব্দাবলী ও বাক্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা হোক অথবা এমন কাজ করা হোক যাতে মনে হয় শিশুকে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে যেমন, জন্মের পর মোবারকবাদ গ্রহণ করা অথবা শিশুর সাথে পিতৃসুলভ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করা কিংবা তার প্রতিপালনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা) পিতার পক্ষে আর তার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় পিতা বংশধারা অস্বীকার করলে কাযাফের শাস্তির অধিকারী হবে। তবে পিতা

কতক্ষণ পর্যন্ত বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার রাখে, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম মালেকের মতে, স্ত্রী যে সময় গর্ভবতী ছিল সে সময় যদি স্বামী গৃহে উপস্থিত থেকে থাকে তাহলে গর্ভসঞ্চারের সময় থেকে নিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময়–কালের মধ্যে স্বামীর জন্য সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার সুযোগ আছে। এরপর তার অস্বীকার করার অধিকার নেই। তবে এ সময় যদি সে অনুপস্থিত থেকে থাকে এবং তার অসাক্ষাতে সন্তান জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে যখনই সে জানবে তখন তাকে অস্বীকার করতে পারে। ইমাম আবু হানীফার মতে, যদি জন্মের এক–দু'দিনের মধ্যে সে অস্বীকার করে তাহলে লি'আন করে সন্তানের দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এক–দু'বছর পরে অস্বীকার করে তাহলে লি'আন হবে ঠিকই কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরে বা জন্ম সম্পর্কে জানার পরে চল্লিশ দিনের মধ্যে পিতার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার আছে। এরপর এ অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এ চল্লিশ দিনের শর্ত অর্থহীন। সঠিক কথা সেটিই যেটি ইমাম আবু হানীফা বলেছেন। অর্থাৎ জন্মের পর বা জন্মের কথা জানার পর এক–দু'দিনের মধ্যেই বংশধারা অস্বীকার করা যেতে পারে। তবে যদি এ ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে, যাকে যথার্থ বাধা বলে স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

এগার ঃ যদি স্বামী তালাক দেবার পর সাধারণভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে লি'আন হবে না। বরং তার বিরুদ্ধে কাযাফের মামলা দায়ের করা হবে। কারণ লি'আন হচ্ছে স্বামী--স্ত্রীর জন্য। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীটি তার স্ত্রী নয়। তবে যদি রজ'ঈ তালাক হয় এবং রুজু (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার) করার সময়–কালের মধ্যে সে অপবাদ দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু ইমাম মালেকের মতে, এটি শুধুমাত্র এমন অবস্থায় কাযাফ হবে যখন কোন গর্ভস্থিত বা ভূমিষ্ঠ সন্তানের বংশধারা গ্রহণ করা বা না করার সমস্যা মাঝখানে থাকবে না। অন্যথায় বায়েন তালাক দেবার পরও পুরুষের লি'আন করার অধিকার থাকে। কারণ সে স্ত্রী লোককে বদনাম করার জন্য নয় বরং নিজেই এমন এক শিশুর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে লি'আন করছে যাকে সে নিজের বলে মনে করে না। ইমাম শাফেঈও প্রায় এই একই মত দিয়েছেন।

বার ঃ লি'আনের আইনগত ফলাফলের মধ্য থেকে কোনটার ব্যাপারে সবাই একমত আবার কোনটার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে।

যেসব ফলাফলের ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন শাস্তি লাভের উপযুক্ত হয় না। স্বামী যদি সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে সন্তান হবে একমাত্র মায়ের। সন্তান বাপের সাথে সম্পর্কিত হবে না এবং তার উত্তরাধিকারীও হবে না। মা তার উত্তরাধিকারী হবে এবং সে মায়ের উত্তরাধিকারী হবে। নারীকে ব্যভিচারিনী এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলার অধিকার কারোর থাকবে না। যদিও লি'আনের সময় তার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে তার ব্যভিচারিনী হবার ব্যাপারে কারোর মনে সন্দেহ না থাকে তবুও তাকে ও তার সন্তানকে একথা বলার অধিকার থাকবে না। যে ব্যক্তি লি'আনের পরে তার অথবা তার সন্তানের বিরুদ্ধে আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তি করবে সে 'হদে'র যোগ্য হবে। নারীর মোহরানা বাতিল হয়ে যাবে না। ইদ্দত পালনকালে নারী পুরুষের থেকে খোরপোশ ও বাসস্থানের সুবিধা লাভের হকদার হবে না। নারী ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

যারা এ মিথ্যা অপবাদ তৈরী করে এনেছে[৮] তারা তোমাদেরই ভিতরের একটি অংশ।[৯] এ ঘটনাকে নিজেদের পক্ষে খারাপ মনে করো না বরং এও তোমাদের জন্য ভালই।[১০] যে এর মধ্যে যতটা অংশ নিয়েছে সে ততটাই গোনাহ কামাই করেছে আর যে ব্যক্তি এর দায়দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় নিয়েছে[১১] তার জন্য তো রয়েছে মহাশাস্তি। যখন তোমরা এটা শুনেছিলে তখনই কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা করেনি[১২] এবং কেন বলে দাওনি এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা দোষারোপ?[১৩]

দু'টি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এক, লি'আনের পরে পুরুষ ও নারী কিভাবে আলাদা হবে? দুই, লি'আনের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাবার পর কি তাদের উভয়ের আবার মিলিত হওয়া সম্ভব? প্রথম বিষয়ে ইমাম শাফেঈ বলেন, যখনই পুরুষ লি'আন শেষ করবে, নারী জবাবী লিআন করুক বা না করুক তখনই সংগে সংগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। ইমাম মালেক, লাইস ইবনে সা'দ ও যুফার বলেন, পুরুষ ও নারী উভয়েই যখন লি'আন শেষ করে তখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেন, লি'আনের ফলে ছাড়াছাড়ি আপনা আপনি হয়ে যায় না বরং আদালত ছাড়াছাড়ি করে দেবার ফলেই ছাড়াছাড়ি হয়। যদি স্বামী নিজেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ভালো, অন্যথায় আদালতের বিচারপতি তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করার কথা ঘোষণা করবেন। দ্বিতীয় বিষয়টিতে ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ, যুফার, সুফিয়ান সওরী, ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন, লি'আনের মাধ্যমে যে স্বামী–স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছে তারা এরপর থেকে চিরকালের জন্য পরস্পরের ওপর হারাম হয়ে যাবে। তারা পুনর্বার পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও কোন অবস্থাতেই পারবে না। হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও (রা) এ একই মত পোষণ করেন। বিপরীত পক্ষে সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়েব, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রাহেমাহুমুল্লাহর মতে, যদি স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নেয় এবং তার ওপর কাযাফের হদ জারি হয়ে যায় তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে পুনরবার বিয়ে হতে পারে।

তারা বলেন, তাদের উভয়কে পরস্পরের জন্য হারামকারী জিনিস হচ্ছে লি'আন। যতক্ষণ তারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ হারামও প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু যখনই স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নিয়ে শাস্তি লাভ করবে তখনই লি'আন খতম হয়ে যাবে এবং হারামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

৮. হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে যে অপবাদ রটানো হয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ অপবাদকে "ইফ্‌ক" শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ অপরাধকে পুরোপুরি খণ্ডন করা হয়েছে। 'ইফ্‌ক' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কথা উল্‌টে দেয়া, বাস্তব ঘটনাকে বিকৃত করে দেয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দটিকে ডাহা মিথ্যা ও অপবাদ দেয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর কোন দোষারোপ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করলে তখন এর অর্থ হয় সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ।

এ সূরাটি নাযিলের মূলে যে ঘটনাটি আসল কারণ হিসেবে কাজ করেছিল এখান থেকে তার ওপর আলোচনা শুরু হয়েছে। ভূমিকায় এ সম্পর্কিত প্রারম্ভিক ঘটনা আমি হযরত আয়েশার বর্ণনার মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছি। পরবর্তী ঘটনাও তাঁরই মুখে শুনুন। তিনি বলেন ঃ "এ মিথ্যা অপবাদের গুজব কমবেশী এক মাস ধরে সারা শহরে ছড়াতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারাত্মক ধরনের মানসিক কষ্টে ভুগতে থাকেন। আমি কাঁদতে থাকি। আমার বাপ–মা চরম পেরেশানী ও দুঃখে–শোকে ভুগতে থাকেন। শেষে একদিন রসূলুল্লাহ (সা) আসেন এবং আমার কাছে বসেন। এ সমগ্র সময়–কালে তিনি কখনো আমার কাছে বসেননি। হযরত আবু বকর (রা) ও উম্মে রুমান (হযরত আয়েশার মা) অনুভব করেন আজ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর কথা হবে। তাই তাঁরা দু'জনও কাছে এসে বসেন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে। যদি তুমি নিরপরাধ হয়ে থাকো তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তোমার অপরাধ মুক্তির কথা প্রকাশ করে দেবেন। আর যদি তুমি সত্যিই গোনাহে লিপ্ত হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং ক্ষমা চাও। বান্দা যখন তার গোনাহ স্বীকার করে নিয়ে তাওবা করে তখন আল্লাহ তা মাফ করে দেন। একথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে যায়। আমি আমার পিতাকে বলি, আপনি রসূলুল্লাহর কথার জবাব দিন। তিনি বলেন ঃ "মা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কি বলবো।" আমি আমার মাকে বললাম, "তুমিই কিছু বলো" তিনিও একই কথা বলেন, "আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না।" একথায় আমি বলি, আপনাদের কানে একটা কথা এসেছে এবং তা মনের মধ্যে জমে বসে গেছে। এখন আমি যদি বলি, আমি নিরপরাধ—এবং আল্লাহ সাক্ষী আছেন আমি নিরপরাধ—তাহলে আপনারা তা মেনে নেবেন না। আর যদি এমন একটি কথা আমি স্বীকার করে নিই যা আমি করিনি—আর আল্লাহ জানেন আমি করিনি—তাহলে আপনারা তা মেনে নেবেন। আমি সে সময় হযরত ইয়াকুবের (আ) নাম স্মরণ করার চেষ্টা করি কিন্তু নামটি মনে করতে পারিনি। শেষে আমি বলি, এ অবস্থায় আমার জন্য এ ছাড়া আর কি উপায় থাকে যে, আমি সেই একই কথা বলি যা হযরত ইউসুফের বাপ বলেছিলেন فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (এখানে সে ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যখন হযরত ইয়াকুবের সামনে তার ছেলে বিন ইয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অপবাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছিল ঃ সূরা ইউসুফ ১০ রুকূ'তে একথা আলোচিত হয়েছে)। একথা বলে আমি শুয়ে পড়ি এবং অন্যদিকে পাশ ফিরি। সে

সময় আমি মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ জানেন আমি গোনাহ করিনি, তিনি নিশ্চয়ই সত্য প্রকাশ করে দেবেন। যদিও একথা আমি কল্পনাও করিনি যে, আমার স্বপক্ষে অহী নাযিল হবে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে। আল্লাহ নিজেই আমার পক্ষ সমর্থন করবেন। এ থেকে নিজেকে আমি অনেক নিম্নতর মনে করতাম। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন স্বপ্ন দেখবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার নির্দোষিতার কথা জানিয়ে দেবেন। এরি মধ্যে রসূলুল্লাহর (সা) ওপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো যা অহী নাযিল হবার সময় হতো, এমন কি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর মুবারক চেহারা থেকে মুক্তোর মতো স্বেদবিন্দু টপ্‌কে পড়তে থাকতো। আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। আমি তো ছিলাম একদম নির্ভীক। কিন্তু আমার বাপ-মা'র অবস্থা ছিল যেন কাটলে শরীর থেকে একফোঁটা রক্তও পড়বে না। তারা ভয় পাচ্ছিল, না জানি আল্লাহ কি সত্য প্রকাশ করেন। যখন সে অবস্থা খতম হয়ে গেলো তখন রসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি হেসে প্রথমে যে কথাটি বলেন, সেটি ছিল ঃ মুবারক হোক আয়েশা! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতার কথা নাযিল করেছেন এবং এরপর নবী (সা) দশটি আয়াত শুনান (অর্থাৎ ১১ নম্বর আয়াত থেকে ২০ নম্বর পর্যন্ত)। আমার মা বলেন, ওঠো এবং রসূলুল্লাহর (সা) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো! আমি বললাম, "আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না, তোমাদের দু'জনের প্রতিও না। বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমার নির্দোষিতার কথা নাযিল করেছেন। তোমরা তো এ মিথ্যা অপবাদ অস্বীকারও করনি।" (উল্লেখ্য, এটি কোন একটি বিশেষ হাদীসের অনুবাদ নয় বরং হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলোতে এ সম্পর্কিত যতগুলো বর্ণনা হযরত আয়েশা (রা) উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলোর সার নির্যাস আমি এখানে পরিবেশন করেছি।)

এ প্রসংগে আরো একটি সূক্ষ্ম কথা অনুধাবন করতে হবে। হযরত আয়েশার (রা) নিরপরাধ হবার কথা বর্ণনা করার আগে পুরো একটি রুকূ'তে যিনা, কাযাফ ও লি'আনের বিধান বর্ণনা করে মহান আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে এ সত্যটির ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে দিয়েছেন যে, যিনার অপবাদ দেবার ব্যাপারটি কোন ছেলেখেলা নয়, নিছক কোন মাহফিলে হাস্যরস সৃষ্টি করার জন্য একে ব্যবহার করা যাবে না। এটি একটি মারাত্মক ব্যাপার। অপবাদদাতার অপবাদ যদি সত্য হয় তাহলে তাকে সাক্ষী আনতে হবে। যিনাকারী ও যিনাকারিনীকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে। আর অপবাদ যদি মিথ্যা হয় তাহলে অপবাদদাতা ৮০ ঘা বেত্রাঘাত লাভের যোগ্য, যাতে ভবিষ্যতে সে আর এ ধরনের কোন কাজ করার দুঃসাহস না করে। এ অভিযোগ যদি স্বামী দিয়ে থাকে তাহলে আদালতে লি'আন করে তাকে ব্যাপারটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। একথাটি একবার মুখে উচ্চারণ করে কোন ব্যক্তি ঘরে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না। কারণ এটা হচ্ছে একটা মুসলিম সমাজ। সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এখানে যিনা কোন আনন্দদায়ক বিষয়ে পরিণত হতে পারে না এবং এর আলোচনাও হাস্য রসালাপের বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে পারে না।

৯. হাদীসে মাত্র কয়েকজন লোকের নাম পাওয়া যায়। তারা এ গুজবটি ছড়াচ্ছিল। তারা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যায়েদ ইবনে রিফা'আহ (এ ব্যক্তি সম্ভবত রিফা'আহ ইবনে যায়েদ ইহুদী মুনাফিকের ছেলে), মিস্‌তাহ ইবনে উসাসাহ, হাস্‌সান ইবনে সাবেত

ও হামনা বিনতে জাহশ। এর মধ্যে প্রথম দু'জন ছিল মুনাফিক এবং বাকি তিনজন মু'মিন। মু'মিন তিন জন বিভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণে এ চক্রান্তের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এরা ছাড়া আর যারা কমবেশী এ গোনাহে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাদের নাম হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলোতে আমার নজরে পড়েনি।

১০. এর অর্থ হচ্ছে, ভয় পেয়ো না। মুনাফিকরা মনে করছে তারা তোমাদের ওপর একটা বিরাট আঘাত হেনেছে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ এটি উল্টো তাদের ওপরই পড়বে এবং তোমাদের জন্য ভালো প্রমাণিত হবে। যেমন আমি ইতিপূর্বে ভূমিকায় বর্ণনা করে এসেছি, মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের যে আসল ময়দান ছিল মুনাফিকরা সেখানেই তাদেরকে পরাস্ত করার জন্য এ প্রপাগাণ্ডা শুরু করে। অর্থাৎ নৈতিকতার ময়দান। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার কারণে তারা প্রত্যেকটি ময়দানে নিজেদের প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় লাভ করে চলছিল। আল্লাহ তাকেও মুসলমানদের কল্যাণের উপকরণে পরিণত করে দিলেন। এ সময় একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অন্যদিকে হযরত আবু বকর ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তৃতীয় দিকে সাধারণ মু'মিনগণ যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন তা থেকে একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তাঁরা অসৎকর্ম থেকে কত দূরে অবস্থান করেন, কতটা সংযম ও সহিষ্ণুতার অধিকারী, কেমন ন্যায়নিষ্ঠ ও কি পরিমাণ ভদ্র ও রুচিশীল মানসিকতার ধারক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজ্জতের ওপর যারা আক্রমণ চালিয়েছিল তাঁর একটি মাত্র ইংগিতই তাদের শিরচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এক মাস ধরে তিনি সবরের সাথে সবকিছু বরদাশ্‌ত করতে থাকেন এবং আল্লাহর হুকুম এসে যাবার পর কেবলমাত্র যে তিনজন মুসলমানের বিরুদ্ধে কাযাফ তথা যিনার মিথ্যা অপবাদের অপরাধ প্রমাণিত ছিল তাদের ওপর 'হদ' জারি করেন। এরপরও তিনি মুনাফিকদেরকে কিছুই বলেননি। হযরত আবু বকরের নিজের আত্মীয়, যার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ তিনি করতেন, সেও তাঁদের কলিজায় তীর বিঁধিয়ে দিতে থাকে কিন্তু এর জবাবে আল্লাহর এ নেক বান্দাটি না তার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেন, না তার পরিবার-পরিজনকে সাহায্য–সহায়তা দেয়া বন্ধ করেন। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণের একজনও সতীনের দুর্নাম ছড়াবার কাজে একটুও অংশ নেননি। বরং কেউ এ অপবাদের প্রতি নিজের সামান্যতমও সন্তোষ, পছন্দ অথবা মেনে নেয়ার মনোভাবও প্রকাশ করেননি। এমনকি হযরত যয়নবের সহোদর বোন হাম্‌না বিনতে জাহ্‌শ নিছক নিজের বোনের জন্য তাঁর সতীনের দুর্নাম রটাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং সতীনের পক্ষে ভালো কথাই বলেন। হযরত আয়েশার নিজের বর্ণনা, রসূলের স্ত্রীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আড়ি চলতো আমার যয়নবের সাথে। কিন্তু "ইফ্‌ক"–এর ঘটনা প্রসংগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, আয়েশা সম্পর্কে তুমি কি জানো? তখন এর জবাবে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম, আমি তার মধ্যে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। হযরত আয়েশার নিজের ভদ্রতা ও রুচিশীলতার অবস্থা এই ছিল যে, হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত তাঁর দুর্নাম রটাবার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি সবসময় তাঁর প্রতি সম্মান ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। লোকেরা স্মরণ করিয়ে দেয়, ইনি তো সেই ব্যক্তি যিনি আপনার বিরুদ্ধে দুর্নাম রটিয়েছিলেন। কিন্তু এ জবাব দিয়ে তিনি তাদের মুখ বন্ধ করে দেন যে, এ ব্যক্তি ইসলামের শত্রু কবি গোষ্ঠীকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও

ইসলামের পক্ষ থেকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। এ ঘটনার সাথে যাদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল, এ ছিল তাদের অবস্থা। আর সাধারণ মুসলমানদের মানসিকতা কতদূর পরিচ্ছন্ন ছিল তা এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর স্ত্রী যখন তাঁর কাছে এ গুজবগুলোর কথা বললেন তখন তিনি বলেন, "আইয়ুবের মা! যদি সে সময় আয়েশার জায়গায় তুমি হতে, তাহলে তুমি কি এমন কাজ করতে?" তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি কখনো এমন কাজ করতাম না।" হযরত আবু আইয়ুব বলেন, "তাহলে আয়েশা তোমার চেয়ে অনেক বেশী ভালো। আর আমি বলি কি, যদি সাফওয়ানের জায়গায় আমি হতাম, তাহলে এ ধরনের কথা কল্পনাই করতে পারতাম না। সাফওয়ান তো আমার চেয়ে ভালো মুসলমান।" এভাবে মুনাফিকরা যা কিছু চেয়েছিল ফল হলো তার একেবারে উল্টো। এবং মুসলমানদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব আগের তুলনায় আরো বেশী সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

এ ছাড়া এ ঘটনার মধ্যে কল্যাণের আর একটি দিকও ছিল। সেটি ছিল এই যে, এ ঘটনাটি ইসলামের আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তামাদ্দুনিক নীতি-নিয়মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনের উপলক্ষে পরিণত হয়। এর বদৌলতে মুসলমানরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব নির্দেশ লাভ করে যেগুলো কার্যকর করে মুসলিম সমাজকে চিরকালের জন্য অসৎকর্মের উৎপাদন ও সেগুলোর সম্প্রসারণ থেকে সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে আর অসৎকর্ম উৎপাদিত হয়ে গেলেও যথাসময়ে তার পথ রোধ করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও এর মধ্যে কল্যাণের আর একটি দিকও ছিল। মুসলমানরা সকলেই একথা ভালোভাবে জেনে যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন। যা কিছু আল্লাহ জানান তাই তিনি জানেন। এর বাইরে তাঁর জ্ঞান ততটুকুই যতটুকু জ্ঞান একজন মানুষের থাকতে পারে। একমাস পর্যন্ত হযরত আয়েশার (রা) ব্যাপারে তিনি ভীষণ পেরেশান থাকেন। কখনো চাকরানীকে জিজ্ঞেস করতেন, কখনো পবিত্র স্ত্রীগণকে, কখনো হযরত আলীকে (রা), কখনো হযরত উসামাকে (রা)। শেষ পর্যন্ত হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেও এভাবে জিজ্ঞেস করেন যে, যদি তুমি এ গোনাহটি করে থাকো, তাহলে তাওবা করো আর না করে থাকলে আশা করা যায় আল্লাহ তোমার নিরপরাধ হওয়া প্রমাণ করে দেবেন। যদি তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতেন তাহলে এ পেরেশানী, এ জিজ্ঞাসাবাদ এবং এ তাওবার উপদেশ কেন? তবে আল্লাহর অহী যখন সত্য কথা জানিয়ে দেয় তখন সারা মাসে তিনি যা জানতেন না তা জানতে পারেন। এভাবে আকীদার অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধারণত লোকেরা নিজেদের নেতৃবর্গের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি ও আতিশয্যের শিকার হয়ে থাকে তা থেকে আল্লাহ সরাসরি অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেন। বিচিত্র নয়, এক মাস পর্যন্ত অহী না পাঠাবার পেছনে আল্লাহর এ উদ্দেশ্যটাও থেকে থাকবে। প্রথম দিনেই অহী এসে গেলে এ ফায়দা লাভ করা যেতে পারতো না। (আরো বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন্ নামল, ৮৩ টীকা।)

১১. অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে ছিল এ অপবাদটির মূল রচয়িতা এবং এ কদর্য প্রচারাভিযানের আসল নায়ক। কোন কোন হাদীসে ভুলক্রমে হযরত হাস্সান ইবনে সাবেতকে (রা) এ আয়াতের লক্ষ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটা মূলত বর্ণনাকারীদের নিজেদেরই বিভ্রান্তির ফল। নয়তো হযরত হাস্সানের (রা) দুর্বলতা এর চেয়ে বেশী কিছু

ছিল না যে, তিনি মুনাফিকদের ছড়ানো এ ফিত্নায় জড়িয়ে পড়েন। হাফেয ইবনে কাসীর যথার্থ বলেছেন, এ হাদীসটি যদি বুখারী শরীফে উদ্ধৃত না হতো, তাহলে এ প্রসংগটি আলোচনাযোগ্যই হতো না। এ প্রসংগে সবচেয়ে বড় মিথ্যা বরং মিথ্যা অপবাদ হচ্ছে এই যে, বনী উমাইয়াহ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ আয়াতের লক্ষ মনে করে। বুখারী, তাবারানী ও বাইহাকীতে হিশাম ইবনে আবদুল মালিক উমুবীর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, الذى تولى كبره অর্থ হচ্ছে আলী ইবনে আবু তালেব। অথচ এ ফিত্নায় হযরত আলীর (রা) গোড়া থেকেই কোন অংশ ছিল না। ব্যাপার শুধু এতটুকু ছিল, যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব বেশী পেরেশান দেখেন তখন নবী (সা) তাঁর কাছে পরামর্শ চাওয়ায় তিনি বলেন, আল্লাহ এ ব্যাপারে আপনাকে কোন সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ রাখেননি, বহু মেয়ে আছে, আপনি চাইলে আয়েশাকে তালাক দিয়ে আর একটি বিয়ে করতে পারেন। এর অর্থ কখনোই এটা ছিল না যে, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছিল হযরত আলী তাকে সত্য বলেছিলেন। বরং শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেরেশানী দূর করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

১২. অন্য একটি অনুবাদ এও হতে পারে, নিজেদের লোকদের অথবা নিজেদের সমাজের লোকদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করোনি কেন? আয়াতের শব্দাবলী দু'ধরনের অর্থের অবকাশ রাখে। আর এ দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে একটি গভীর তত্ব। এটি ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। হযরত আয়েশা (রা) ও সাফ্ওয়ান ইবনে মু'আত্তালের (রা) মধ্যে যে ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছিল তা তো এই ছিল যে, কাফেলার এক ভদ্র মহিলা (তিনি নবী পত্নী ছিলেন একথা বাদ দিলেও) ঘটনাক্রমে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। আর কাফেলারই এক ব্যক্তি যিনি ঘটনাক্রমে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এখন যদি কেউ বলে, নাউযুবিল্লাহ এরা দুজন নিজেদেরকে একান্তে পেয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়ে গেছেন, তাহলে তার একথার বাহ্যিক শব্দাবলীর আড়ালে আরো দু'টো কাল্পনিক কথাও রয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, বক্তা (পুরুষ হোক বা নারী) যদি নিজেই ঐ জায়গায় হতেন, তাহলে কখনোই গোনাহ না করে থাকতেন না। কারণ তিনি যদি গোনাহ থেকে বিরত থেকে থাকেন তাহলে এটা শুধু এ জন্য যে, বিপরীত লিংগের কেউ এ পর্যন্ত এভাবে একান্তে তার নাগালে আসেনি নয়তো এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবার লোক তিনি নন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যে সমাজের তিনি একজন সদস্য, তার নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তার ধারণা হচ্ছে, এখানে এমন একজন নারী ও পুরুষ নেই যিনি এ ধরনের সুযোগ পেয়ে গোনাহে লিপ্ত হননি। এতো শুধুমাত্র তখনকার ব্যাপার যখন বিষয়টি নিছক একজন পুরুষ ও একজন নারীর সাথে জড়িত থাকে। আর ধরুন যদি সে পুরুষ ও নারী উভয়ই একই জায়গার বাসিন্দা হন এবং যে মহিলাটি ঘটনাক্রমে কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ঐ পুরুষটির কোন বন্ধু, আত্মীয় বা প্রতিবেশীর স্ত্রী, বোন বা মেয়ে হয়ে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটি আরো গুরুতর হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, বক্তা নিজেই নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে এবং নিজের সমাজ সম্পর্কেও এমন জঘন্য ধারণা পোষণ করেন যার সাথে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের দূরতম সম্পর্কও নেই। কে এমন সজ্জন আছেন যিনি একথা চিন্তা করতে পারেন যে, তার কোন বন্ধু, প্রতিবেশী বা পরিচিত ব্যক্তির গৃহের কোন মহিলার সাথে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তার পথে দেখা হয়ে যাবে এবং

প্রথম অবস্থায়ই তিনি তার ইজ্জত লুটে নেবার কাজ করবেন তারপর তাকে গৃহে পৌঁছিয়ে দেবার কথা চিন্তা করবেন! কিন্তু এখানে তো ব্যাপার ছিল এর চেয়ে হাজার গুণ গুরুতর। মহিলা অন্য কেউ ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী, যাঁদেরকে প্রত্যেকটি মুসলমান নিজের মায়ের চেয়েও বেশী সম্মানের যোগ্য মনে করতো এবং যাঁদেরকে আল্লাহ নিজেই প্রত্যেক মুসলমানের ওপর নিজের মায়ের মতই হারাম গণ্য করেছিলেন। পুরুষটি কেবলমাত্র ঐ কাফেলার একজন সদস্য, ঐ সেনাদলের একজন সৈন্য এবং ঐ শহরের একজন অধিবাসীই ছিলেন না বরং তিনি মুসলমানও ছিলেন। ঐ মহিলার স্বামীকে তিনি আল্লাহর রসূল এবং নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছিলেন আর তাঁর হুকুমে প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়ার জন্য বদরের যুদ্ধের মতো ভয়াবহ জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। এ অবস্থায় তো এ উক্তির মানসিক প্রেক্ষাপট জঘন্যতার এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার চেয়ে নোংরা ও ঘৃণ্য কোন প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তাই করা যায় না। তাই মহান আল্লাহ বলছেন, মুসলিম সমাজের যেসব ব্যক্তি একথা তাদের কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে অথবা কমপক্ষে একে সন্দেহযোগ্য মনে করেছে তারা নিজেদের মন-মানসিকতারও খুবই খারাপ ধারণা দিয়েছে এবং নিজেদের সমাজের লোকদেরকেও অত্যন্ত হীন চরিত্র ও নিকৃষ্ট নৈতিকবৃত্তির অধিকারী মনে করেছে।

১৩. অর্থাৎ একথাতো বিবেচনার যোগ্যই ছিল না। একথা শোনার সাথে সাথেই প্রত্যেক মুসলমানের একে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার, মিথ্যা ও বানোয়াট কথা ও অপবাদ আখ্যা দেয়া উচিত ছিল। সম্ভবত কেউ এখানে প্রশ্ন করতে পারে, একথাই যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুই বা প্রথম দিনই একে মিথ্যা বলে দিলেন না কেন? কেন তারা একে এতটা গুরুত্ব দিলেন? এর জবাব হচ্ছে, স্বামী ও পিতার অবস্থা সাধারণ লোকদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের হয়। যদিও স্ত্রীকে স্বামীর চেয়ে বেশী কেউ চিনতে বা জানতে পারে না এবং একজন সৎ, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত স্ত্রী সম্পর্কে কোন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন স্বামী লোকদের অপবাদের কারণে খারাপ ধারণা করতে পারে না, তবুও যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তখন সে এমন এক ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয় যার ফলে সে একে মিথ্যা অপবাদ বলে প্রত্যাখ্যান করলেও প্রচারণাকারীদের মুখ বন্ধ হবে না বরং তারা নিজেদের কণ্ঠ আরো এক ডিগ্রী উঁচুতে চড়িয়ে বলতে থাকবে, দেখো, বউ কেমন স্বামীর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সবকিছু করে যাচ্ছে আর স্বামী মনে করছে আমার স্ত্রী বড়ই সতী সাধ্বী। এ ধরনের সংকট মা-বাপের ক্ষেত্রেও দেখা দেয়। সে বেচারারা নিজেদের মেয়ের সতীত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে যদি মুখ খোলেও তাহলে মেয়ের অবস্থান পরিষ্কার হয় না। প্রচারণাকারীরা একথাই বলবে, মা-বাপ তো, কাজেই নিজের মেয়ের পক্ষ সমর্থন করবে না তো আর কি করবে! এ জিনিসটিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ও উম্মে রুমানকে ভিতরে ভিতরে শোকে-দুঃখে জর্জরিত ও বিহবল করে চলছিল। নয়তো আসলে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতো তাঁর ভাষণে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে কোন খারাপ জিনিস দেখিনি এবং যে ব্যক্তির সম্পর্কে এ অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যেও না।

لَوْلَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰئِكَ
عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ أَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ
بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهُ
هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

তারা (নিজেদের অপবাদের প্রমাণ স্বরূপ) চারজন সাক্ষী আনেনি কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী আনেনি তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যুক।[১৪] যদি তোমাদের প্রতি দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তাহলে যেসব কথায় তোমরা লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলে সেগুলোর কারণে তোমাদের ওপরে মহাশাস্তি নেমে আসতো। (একটু ভেবে দেখো তো, সে সময় তোমরা কেমন মারাত্মক ভুল করছিলে) যখন তোমরা এক মুখ থেকে আর এক মুখে এ মিথ্যা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যা সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা একে একটা মামুলি কথা মনে করছিলে অথচ আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়।

১৪. "আল্লাহর কাছে" অর্থাৎ আল্লাহর আইনে অথবা আল্লাহর আইন অনুযায়ী। নয়তো আল্লাহ তো জানতেন ঐ অপবাদ ছিল মিথ্যা। তারা সাক্ষী আনেনি বলেই তা মিথ্যা, আল্লাহর কাছে তার মিথ্যা হবার জন্য এর প্রয়োজন নেই।

এখানে যেন কেউ এ ভুল ধারণার শিকার না হন যে, এ ক্ষেত্রে নিছক সাক্ষীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিকে অপবাদের মিথ্যা হবার যুক্তি ও ভিত্তি গণ্য করা হচ্ছে এবং মুসলমানদের বলা হচ্ছে যেহেতু অপবাদদাতা চার জন সাক্ষী আনেনি তাই তোমরাও শুধুমাত্র এ কারণেই তাকে সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ গণ্য করো। বাস্তবে সেখানে যা ঘটেছিল তার প্রতি দৃষ্টি না দিলে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। অপবাদদাতারা এ কারণে অপবাদ দেয়নি যে, তারা তাদের মুখ দিয়ে যা কিছু বলে যাচ্ছিল তারা সবাই বা তাদের কোন একজন স্বচক্ষে তা দেখেছিল। বরং হযরত আয়েশা (রা) কাফেলার পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন এবং হযরত সাফ্ওয়ান পরে তাঁকে নিজের উটের পিঠে সওয়ার করে কাফেলার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন শুধুমাত্র এরি ভিত্তিতে তারা এতবড় অপবাদ তৈরী করে ফেলেছিল। কোন বুদ্ধি--বিবেকবান ব্যক্তি এ অবস্থায় হযরত আয়েশার এভাবে পিছনে থেকে যাওয়াকে নাউযুবিল্লাহ কোন ষড়যন্ত্রের ফল ছিল বলে ভাবতে পারতেন না। সেনা প্রধানের স্ত্রী চুপিচুপি কাফেলার পিছনে এক ব্যক্তির সাথে থেকে যাবে তারপর ঐ ব্যক্তিই তাকে নিজের

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

একথা শোনার সাথে সাথেই তোমরা বলে দিলে না কেন, "এমন কথা মুখ দিয়ে বের করা আমাদের শোভা পায় না, সুবহানাল্লাহ! এ তো একটি জঘন্য অপবাদ।" আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে ভবিষ্যতে কখনো এ ধরনের কাজ করো না। আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কার নির্দেশ দেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।[১৫]

যারা চায় মু'মিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।[১৬] *আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।*[১৭] *যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা তোমাদের প্রতি না হতো এবং আল্লাহ যদি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র না হতেন (তাহলে যে জিনিস এখনই তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিলো তার পরিণাম হতো অতি ভয়াবহ)।*

উটের পিঠে বসিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ঠিক দুপুরের সময় সবার চোখের সামনে দিয়ে সেনা ছাউনিতে পৌঁছে যাবে, কোন ষড়যন্ত্রকারী এভাবে ষড়যন্ত্র করে না। স্বয়ং এ অবস্থাটাই তাদের উভয়ের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ পেশ করছে। এ অবস্থায় যদি অপবাদদাতারা নিজেদের চোখে কোন ঘটনা দেখতো তাহলে কেবলমাত্র তারি ভিত্তিতে অপবাদ দিতে পারতো। অন্যথায় যেসব লক্ষণের ওপর কুচক্রীরা অপবাদের ভিত্তি রেখেছিল সেগুলোর ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

১৫. এ আয়াতগুলো এবং বিশেষ করে আল্লাহর এ বাণী "মু'মিন পুরুষ ও নারীরা নিজেদের লোকদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে না কেন" থেকে এ মূলনীতির উৎপত্তি হয় যে, মুসলিম সমাজে সকল ব্যবহারিক বিষয়ের ভিত্তি সুধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কুধারণা কেবলমাত্র এমন অবস্থায় পোষণ করা উচিত যখন তার জন্য কোন ইতিবাচক ও প্রমাণসূচক ভিত্তি থাকবে। এ ব্যাপারে নীতি হচ্ছে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দোষ,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۱﴾ وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ
وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲﴾

৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলো না। যে কেউ তার অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করার হুকুম দেবে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকতো তাহলে তোমাদের একজনও পবিত্র হতে পারতো না।[১৮] *কিন্তু আল্লাহই যাকে চান তাকে পবিত্র করে দেন এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞাত।*[১৯]

তোমাদের মধ্য থেকে যারা প্রাচুর্য ও সামর্থের অধিকারী তারা যেন এ মর্মে কসম খেয়ে না বসে যে, তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন ও আল্লাহর পথে গৃহত্যাগকারীদেরকে সাহায্য করবে না। তাদেরকে ক্ষমা করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীলতা ও দয়া গুণে গুণান্বিত।[২০]

যতক্ষণ তার অপরাধী হবার বা তার প্রতি অপরাধের সন্দেহ করার কোন যুক্তিসংগত কারণ না থাকে আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সত্যবাদী, যতক্ষণ তার অনির্ভরযোগ্য হবার কোন প্রমাণ না থাকে।

১৬. পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আয়াতের প্রত্যক্ষ অর্থ হচ্ছে, যারা এ ধরনের অপবাদ তৈরী করে ও তা প্রচার করে মুসলিম সমাজে চরিত্রহীনতার প্রসার ঘটাবার এবং উম্মতে মুসলিমার চরিত্র হননের চেষ্টা করছে তারা শাস্তিলাভের যোগ্য। কিন্তু আয়াতের শব্দাবলী অশ্লীলতা ছড়াবার যাবতীয় অবস্থার অর্থবোধক। কার্যত ব্যভিচারের আড্ডা কায়েম করার ওপরও এগুলো প্রযুক্ত হয়। আবার চরিত্রহীনতাকে উৎসাহিত করা এবং সে জন্য আবেগ-অনুভূতিকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিতকারী কিস্‌সা-কাহিনী, কবিতা, গান, ছবি

ও বেলাধূলার উপরও প্রযুক্ত হয়। তাছাড়া এমন ধরনের ক্লাব, হোটেল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এর আওতায় এসে যায় যেখানে নারী–পুরুষের মিলিত নৃত্য ও মিলিত আমোদ ফূর্তির ব্যবস্থা করা হয়। কুরআন পরিষ্কার বলছে, এরা সবাই অপরাধী। কেবল আখেরাতেই নয়, দুনিয়ায়ও এদের শাস্তি পাওয়া উচিত। কাজেই অশ্লীলতার এসব উপায় উপকরণের পথ রোধ করা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। কুরআন এখানে যে সমস্ত কাজকে জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ গণ্য করছে এবং যেগুলো সম্পাদনকারীকে শাস্তিলাভের যোগ্য বলে ফায়সালা দিচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের দণ্ডবিধি অনুযায়ী সে সমস্ত কাজ শাস্তিযোগ্য ও পুলিশের হস্তক্ষেপলাভের উপযোগী হতে হবে।

১৭. অর্থাৎ তোমরা জানো না এ ধরনের এক একটি কাজের প্রভাব সমাজে কোথায় কোথায় পৌঁছে যায়, কতলোক এগুলোতে প্রভাবিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে এর কি পরিমাণ ক্ষতি সমাজ জীবনকে বরদাশত করতে হয়। এ বিষয়টি আল্লাহর খুব ভালোভাবে জানেন। কাজেই আল্লাহর উপর নির্ভর করো এবং তিনি যেসব অসৎকাজ চিহ্নিত করছেন পূর্ণ শক্তিতে সেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার ও দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করো। এগুলো ছোট ছোট বিষয় নয় যে, এগুলোর প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে হবে। আসলে এগুলো অনেক বড় বিষয়। কাজেই যারা এসব কাজ করবে তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।

১৮. অর্থাৎ শয়তান তো তোমাদের গায়ে অসৎকাজের নাপাকী মাখিয়ে দেবার জন্য এমন উন্মুখ হয়ে বসে আছে যে, যদি আল্লাহ নিজেই অনুগ্রহ ও দয়া করে তোমাদের সততা ও অসততার পার্থক্য না দেখান এবং তোমাদের সংশোধনের শিক্ষা ও সুযোগলাভের সৌভাগ্য দান না করেন, তাহলে তোমাদের একজনও নিজে নিজের শক্তি–সামর্থের জোরে পবিত্র ও পাপ পংকিলতা থেকে মুক্ত হতে পারো না।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ চোখ বন্ধ করে, আন্দাজে যাকে তাকে পবিত্রতা দান করেন না বরং নিজের নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে দান করেন। আল্লাহ জানেন কে কল্যাণ চায় এবং কে অকল্যাণে অভিলাষী। প্রত্যেক ব্যক্তি একান্তে যেসব কথা বলে আল্লাহ তা সবই শুনে থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে মনে যা চিন্তা করে আল্লাহ তা থেকে মোটেই বেখবর থাকেন না। এ সরাসরি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ ফায়সালা করেন, কাকে পবিত্রতা দান করবেন ও কাকে পবিত্রতা দান করবেন না।

২০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ যখন আমার নির্দোষিতার কথা ঘোষণা করেন তখন হযরত আবু বকর (রা) কসম খেয়ে বসেন, তিনি আগামীতে মিস্তাহ ইবনে উসাসকে সাহায্য করা বন্ধ করে দেবেন। কারণ মিস্তাহ আত্মীয়–সম্পর্কের কোন পরোয়া করেননি এবং তিনি সারা জীবন তাঁর ও তাঁর সমগ্র পরিবারের যে উপকার করে এসেছেন সে জন্য একটুও লজ্জা অনুভব করেননি। এ ঘটনায় এ আয়াত নাযিল হয় এবং এ আয়াত শুনেই হযরত আবু বকর (রা) সংগে সংগেই বলেন, بلى والله انا نحب ان تغفر لنا يا ربنا "আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমরা চাই, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের ভুল–ভ্রান্তি মাফ করে দেবে।" কাজেই তিনি আবার মিস্তাহকে সাহায্য করতে থাকেন এবং এবার আগের চেয়ে বেশী করে করতে থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা হচ্ছে, হযরত আবু বকর ছাড়া আরো কয়েকজন সাহাবীও এ কসম খেয়েছিলেন যে, যারা মিথ্যা অপবাদ ছড়াতে অংশ নিয়েছি...

তাদেরকে তাঁরা আর কোন সাহায্য সহায়তা দেবেন না। এ আয়াতটি নাযিল হবার পর তারা সবাই নিজেদের কসম ভেঙ্গে ফেলেন। এভাবে এ ফিত্‌নার ফলে মুসলিম সমাজে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তা এক মুহূর্তেই দূর হয়ে যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তারপর সে জানতে পারে এতে কোন কল্যাণ নেই এবং এর ফলে কসম ভেঙ্গে ফেলে যে বিষয়ে কল্যাণ আছে তা অবলম্বন করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে কসম ভাঙ্গার কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে কি না। এক দল ফকীহ বলেন, কল্যাণের পথ অবলম্বন করাই কাফ্‌ফারা, এ ছাড়া আর কোন কাফ্‌ফারার প্রয়োজন নেই। তারা এ আয়াত থেকে যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, আল্লাহ হযরত আবু বকরকে কসম ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দেন এবং কাফ্‌ফারা আদায় করার হুকুম দেননি। এ ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত উক্তিটিকেও তারা যুক্তি হিসেবে পেশ করেন ঃ

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنَ فَرَاىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَذَالِكَ كَفَّارَتُهُ ـ

"যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তারপর সে জানতে পারে অন্য বিষয়টি তার চেয়ে ভালো, এ অবস্থায় তার ভালো বিষয়টি গ্রহণ করা উচিত এবং এই ভালো বিষয়টি গ্রহণ করাই তার কাফ্‌ফারা।"

অন্য দলটি বলেন, কসম ভাঙ্গার জন্য আল্লাহ কুরআন মজীদে একটি পরিষ্কার ও স্বতন্ত্র হুকুম নাযিল করেছেন (আল বাকারাহ ২২৫ ও আল মায়েদাহ ৮৯ আয়াত)। এ আয়াতটি ঐ হুকুম রহিত করেনি এবং পরিষ্কারভাবে এর মধ্যে কোন সংশোধনও করেনি। কাজেই ঐ হুকুম স্বস্থানে অপরিবর্তিত রয়েছে। আল্লাহ এখানে হযরত আবু বকরকে অবশ্যি কসম ভেঙ্গে ফেলতে বলেছেন কিন্তু তাঁকে তো এ কথা বলেননি যে, তোমার ওপর কোন কাফ্‌ফারা ওয়াজিব নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তিটির অর্থ হচ্ছে শুধু এই যে, একটি ভুল ও অসংগত বিষয়ের কসম খেয়ে ফেললে যে গুনাহ হয় সঠিক ও সংগত পন্থা অবলম্বন তার অপনোদন হয়ে যায়। কসমের কাফ্‌ফারা রহিত করা এর উদ্দেশ্য নয়। বস্তুতঃ অন্য একটি হাদীস–এর ব্যাখ্যা করে দেয়। তাতে নবী করীম (সা) বলেন ঃ

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهٖ ـ

"যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তারপর সে জানতে পারে অন্য বিষয় তার চেয়ে ভালো, তার যে বিষয়টি ভালো সেটিই করা উচিত এবং নিজের কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করা উচিত।"

এ থেকে জানা যায়, কসম ভাঙ্গার কাফ্‌ফারা আলাদা জিনিস এবং ভালো কাজ না করার গোনাহের কাফ্‌ফারা অন্য জিনিস। ভালো কাজ করা হচ্ছে একটি জিনিসের কাফ্‌ফারা

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْغَٰفِلَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَالطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

যারা সতী সাধ্বী, সরলমনা[২১] মু'মিন মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেয় তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের হাত–পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ দেবে।[২১(ক)] সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ্য হবে, তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী।

দুশ্চরিত্রা মহিলারা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা মহিলাদের জন্য। সচ্চরিত্রা মহিলারা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা মহিলাদের জন্য। লোকে যা বলে তা থেকে তারা পূত–পবিত্র।[২২] তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা।

এবং দ্বিতীয় জিনিসের কাফ্‌ফারা কুরআন নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাদের ব্যাখ্যা, ৪৬ টীকা)।

২১. মূলে غافلات (গাফেলাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সরলমনা ও ভদ্র মহিলারা, যারা ছল–চাতুরী জানে না, যাদের মন নির্মল, কলুষমুক্ত ও পাক–পবিত্র, যারা অসভ্যতা ও অশ্লীল আচরণ কি ও কিভাবে করতে হয় তা জানে না এবং কেউ তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে একথা যারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিষ্কলুষ–সতী–সাধ্বী মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া সাতটি "সর্বনাশা" কবীরাহ গোনাহের অন্তরভূক্ত। তাবারানীতে হযরত হুযাইফার বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

قذف المحصنة يهدم عمل ماة سنة

"একজন নিরপরাধ সতী সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া একশ বছরের সৎকাজ ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট।"

২১(ক). ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, ৫৫ এবং সূরা হা–মীম আস্ সাজ্‌দাহ, ২৫ টীকা।

২২. এ আয়াতে একটি নীতিগত কথা বুঝানো হয়েছে। সেটি হচ্ছে ঃ দুশ্চরিত্ররা দুশ্চরিত্রদের সাথেই জুটি বাঁধে এবং সচ্চরিত্র ও পাক–পবিত্র লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই সচ্চরিত্র ও পাক–পবিত্র লোকদের সাথেই মানানসই। একজন দুষ্কৃতকারী শুধু একটিমাত্র দুষ্কৃতি করে না। সে আর সব দিক দিয়ে একদম ভালো এবং শুধুমাত্র একটি দুষ্কর্মে লিপ্ত—ব্যাপারটা মোটেই এ রকম নয়। তার চলাফেরা, আচার–আচরণ, স্বভাব–চরিত্র সবকিছুর মধ্যে নানান অসৎপ্রবণতা লুকিয়ে থাকে এবং এগুলো তার একটি বড় অসৎপ্রবণতাকে সহায়তা দান ও প্রতিপালন করে। কোন ব্যক্তির মধ্যে হঠাৎ একটি অসৎপ্রবণতা কোন অদৃশ্য গোলার মতো বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, অথচ এর কোন আলামত ইতিপূর্বে তার চালচলন ও আচার–আচরণে দেখা যায়নি, এটা কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। মানব জীবনে প্রতিনিয়ত এ মনস্তাত্বিক সত্যটির প্রদর্শনী হচ্ছে। একজন পাক–পবিত্র মানুষ, যার সমগ্র জীবন সবার সামনে সুস্পষ্ট, সে একটি ব্যভিচারী নারীর সাথে ঘর সংসার করে এবং বছরের পর বছর তাদের মধ্যে গভীর প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকে, একথা কিভাবে বোধগম্য হয়? একথা কি চিন্তা করা যেতে পারে যে, কোন নারী এমনও হতে পারে যে ব্যভিচারিনী হবে এবং তারপর তার চলন–বলন, অংগভংগী, আচার–ব্যবহার কোন জিনিস থেকেও তার এসব অসৎবৃত্তির কোন লক্ষণই ফুটে উঠবে না? অথবা কোন ব্যক্তি পবিত্র হৃদয়বৃত্তির অধিকারী ও উন্নত চরিত্রবানও হবে আবার সে এমন নারীর প্রতি সন্তুষ্টও থাকবে যার মধ্যে এসব লক্ষণ দেখা যাবে? একথা এখানে বুঝাবার কারণ হচ্ছে এই যে, ভবিষ্যতে যদি কারোর প্রতি এ অপবাদ দেয়া হয়, তাহলে লোকেরা যেন অন্ধের মতো তা শুনেই বিশ্বাস করে না নেয়, বরং তারা যেন চোখ খুলে দেখে নেয় কার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হচ্ছে, কি অপবাদ দেয়া হচ্ছে এবং তা কোনভাবে সেখানে খাপ খায় কি না? কথা যদি জুতসই হয়, তাহলে মানুষ এক পর্যায় পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতে পারে অথবা কমপক্ষে সম্ভব মনে করতে পারে। কিন্তু উদ্ভট ও অপরিচিত কথা, যার সত্যতার স্বপক্ষে একটি চিহ্নও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, তা শুধুমাত্র কোন নির্বোধ বা দুর্জনের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে বলেই তাকে কেমন করে মেনে নেয়া যায়?

কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতের এ অর্থও করেছেন যে, খারাপ কথা খারাপ লোকদের জন্য (অর্থাৎ তারা এর হকদার) এবং ভালো কথা ভালো লোকদের জন্য, আর ভালো লোকদের সম্পর্কে দুর্মুখেরা যেসব কথা বলে তা তাদের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া থেকে তারা মুক্ত ও পবিত্র। অন্য কিছু লোক এর অর্থ করেছেন এভাবে, খারাপ কাজ খারাপ লোকদের পক্ষেই সাজে এবং ভালো কাজ ভালো লোকদের জন্যই শোভনীয়, ভালো লোকেরা খারাপ কাজের অপবাদ বহন থেকে পবিত্র। ভিন্ন কিছু লোক এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে, খারাপ কথা খারাপ লোকদেরই বলার মতো এবং ভালো লোকেরা ভালো কথাই বলে থাকে, অপবাদদাতারা যে ধরনের কথা বলছে ভালো লোকেরা তেমনি ধরনের কথা বলা

কর্মপন্থা আল্লাহর জ্ঞান–ভাণ্ডারে ছিল না। নয়তো তিনি এগুলো বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিতেন।

দুই ঃ এ সুযোগে দ্বিতীয় যে কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর শরীয়াত কোন অসৎকাজ নিছক হারাম করে দিয়ে অথবা তাকে অপরাধ গণ্য করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করে না বরং যেসব কার্যকারণ কোন ব্যক্তিকে ঐ অসৎকাজে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে অথবা তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাছাড়া শরীয়াত অপরাধের সাথে সাথে অপরাধের কারণ, অপরাধের উদ্যোক্তা ও অপরাধের উপায়–উপকরণাদির ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করে। এভাবে আসল অপরাধের ধারে কাছে পৌছার আগেই অনেক দূর থেকেই মানুষকে রুখে দেয়া হয়। মানুষ সবসময় অপরাধের কাছ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং প্রতিদিন পাকড়াও হতে ও শাস্তি পেতে থাকবে, এটাও সে পছন্দ করে না। সে নিছক একজন অভিযোক্তাই (Prosecutor) নয় বরং একজন সহানুভূতিশীল সহযোগী, সংস্কারকারী ও সাহায্যকারীও। তাই সে মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিষ্কৃতিলাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার শিক্ষামূলক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

২৪. মূলে حتى تستانسوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। লোকেরা সাধারণত একে حتى تستاذنوا (অর্থাৎ যতক্ষণ না অনুমতি নাও) অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু আসলে উভয় ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। একে উপেক্ষা করা চলে না। حتى تستاذنوا বললে আয়াতের অর্থ হতো ঃ "কারোর বাড়িতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না অনুমতি নিয়ে নাও।" এ প্রকাশ ভংগী পরিহার করে আল্লাহ حتى تستانسوا শব্দ ব্যবহার করেছেন। استيناس শব্দ انس ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমাদের ভাষায় এর মানে হয় পরিচিতি, অন্তরংগতা, সম্মতি ও প্রীতি। এ ধাতু থেকে উৎপন্ন تستانسوا শব্দ যখনই বলা হবে তখনই এর মানে হবে, সম্মতি আছে কি না জানা অথবা নিজের সাথে অন্তরংগ করা। কাজেই আয়াতের সঠিক অর্থ হবে ঃ "লোকদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তাদেরকে অন্তরংগ করে নেবে অথবা তাদের সম্মতি জেনে নেবে।" অর্থাৎ একথা না জেনে নেবে যে, গৃহমালিক তোমার আসাকে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে করছে না এবং তার গৃহে তোমার প্রবেশকে সে পছন্দ করছে। এ জন্য আমি অনুবাদে "অনুমতি নেবা'র পরিবর্তে 'সম্মতি লাভ' শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ এ অর্থটি মূলের নিকটতর।

২৫. জাহেলী যুগে আরববাসীদের নিয়ম ছিল, তারা حُيِّيتُم صَبَاحًا، حُيِّيتُم مساءً (সুপ্রভাত, শুভ সন্ধ্যা) বলতে বলতে নিসংকোচে সরাসরি একজন অন্যজনের গৃহে প্রবেশ করে যেতো। অনেক সময় বহিরাগত ব্যক্তি গৃহ মালিক ও তার বাড়ির মহিলাদেরকে বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলতো। আল্লাহ এর সংশোধনের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে সে অবস্থান করে সেখানে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) রক্ষা করার অধিকার আছে এবং তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া তার এ গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা অন্য ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। এ হুকুমটি নাযিল হবার পর

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজে যেসব নিয়ম ও রীতিনীতির প্রচলন করেন আমি নীচে সেগুলো বর্ণনা করছি ঃ

এক ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এ অধিকারটিকে কেবলমাত্র গৃহের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং একে একটি সাধারণ অধিকার গণ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে অন্যের গৃহে উঁকি ঝুঁকি মারা, বাইর থেকে চেয়ে দেখা এমন কি অন্যের চিঠি তার অনুমতি ছাড়া পড়ে ফেলা নিষিদ্ধ। হযরত সওবান (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদ করা গোলাম) বর্ননা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

اذا دخل البصر فلا اذن

"দৃষ্টি যখন একবার প্রবেশ করে গেছে তখন আর নিজের প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেবার দরকার কি?" (আবু দাউদ)

হযরত হুযাইল ইবনে শুরাহবীল বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে এলেন এবং ঠিক তাঁর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী (সা) তাকে বললেন, هكذا عنك ، فانما الاستيذان من النظر "পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (আবু দাউদ) নবী করীমের (সা) নিজের নিয়ম ছিল এই যে, যখন কারোর বাড়িতে যেতেন, দরজার ঠিক সামনে কখনো দাঁড়াতেন না। কারণ সে যুগে ঘরের দরজায় পরদা লটকানো থাকতো না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। (আবু দাউদ) রসূলুল্লাহর (সা) খাদেম হযরত আনাস বলেন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রসূলের (সা) কামরার মধ্যে উঁকি দিলেন। রসূলুল্লাহর (সা) হাতে সে সময় একটি তীর ছিল। তিনি তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ননা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ نَظَرَ فِىْ كِتَابِ اَخِيْهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَاِنَّمَا يَنْظُرُ فِىْ النَّارِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার পত্রে চোখ বুলালো সে যেন আগুনের মধ্যে দৃষ্টি ফেলছে।" (আবু দাউদ)

বুখারী ও মুসলিমে উদ্বৃত হয়েছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ امْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحِصَاةٍ فَفَقَاتَ عَلَيْهِ مَاكَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ-

"যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে উঁকি মারে এবং তুমি একটি কাঁকর মেরে তার চোখ কানা করে দাও, তাহলে তাতে কোন গোনাহ হবে না।"

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنِ اطَّلَعَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَؤُا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنَهُ

"যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উঁকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেঁদা করে দেয়, তবে তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না।"

ইমাম শাফেঈ এ হাদীসটিকে একদম শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি কেউ ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে তার চোখ ছেঁদা করে দেবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হানাফীগণ এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে যে, নিছক দৃষ্টি দেবার ক্ষেত্রে এ হুকুমটি দেয়া হয়নি। বরং এটি এমন অবস্থায় প্রযোজ্য যখন কোন ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, গৃহবাসীদের বাধা দেয়ায়ও সে নিরস্ত হয় না এবং গৃহবাসীরা তার প্রতিরোধ করতে থাকে। এ প্রতিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে যদি তার চোখ ছেঁদা হয়ে যায় বা শরীরের কোন অংগহানি হয় তাহলে এ জন্য গৃহবাসীরা দায়ী হবে না। (আহকামুল কুরআন–জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

দুই ঃ ফকীহগণ শ্রবণ শক্তিকেও দৃষ্টিশক্তির হুকুমের অন্তরভুক্ত করেছেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তার দৃষ্টি পড়বে না ঠিকই কিন্তু তার কান তো গৃহবাসীদের কথা বিনা অনুমতিতে শুনে ফেলবে। এ জিনিসটিও দৃষ্টির মতো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ।

তিন ঃ কেবলমাত্র অন্যের গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেবার হুকুম দেয়া হয়নি বরং নিজের মা–বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার মায়ের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি চাইবো? জবাব দিলেন, হাঁ। সে বললো, আমি ছাড়া তাঁর সেবা করার আর কেউ নেই। এ ক্ষেত্রে কি আমি যতবার তাঁর কাছে যাবো প্রত্যেকবার অনুমতি নেবো? জবাব দিলেন, اتحب ان تراها عريانة "তুমি কি তোমার মাকে উলংগ অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর?" (ইবনে জারীর এ মুরসাল হাদীসটি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি হচ্ছে, عليكم ان تستانئوا على امهاتكم واخواتكم "নিজেদের মা–বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।" (ইবনে কাসীর) বরং ইবনে মাসউদ তো বলেন, নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবার সময়ও অন্ততপক্ষে গলা খাঁকারী দিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁর স্ত্রী যয়নবের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখনই গৃহে আসতে থাকতেন তখনই আগেই এমন কোন আওয়াজ করে দিতেন যাতে তিনি আসছেন বলে জানা যেতো। তিনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে যাওয়া পছন্দ করতেন না। (ইবনে জারীর)

চার ঃ শুধুমাত্র এমন অবস্থায় অনুমতি চাওয়া জরুরী নয় যখন কারোর ঘরে হঠাৎ কোন বিপদ দেখা দেয়। যেমন, আগুন লাগে অথবা কোন চোর ঢোকে। এ অবস্থায় সাহায্য দান করার জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায়।

পাঁচ ঃ প্রথম প্রথম যখন অনুমতি চাওয়ার বিধান জারি হয় তখন লোকেরা তার নিয়ম কানুন জানতো না। একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে

এবং দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে ءالج (আমি কি ভেতরে ঢুকে যাবো?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাঁদী রওযাহকে বলেন, এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। একটু উঠে গিয়ে তাকে বলে এসো, السلام عليكم ادخل ؟ (আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?) বলতে হবে। (ইবনে জারির ও আবু দাউদ) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার বাবার ঋণের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি দু-তিনবার বললেন, "আমি? আমি?" অর্থাৎ এখানে আমি বললে কে কি বুঝবে যে, তুমি কে? (আবু দাউদ) কালাদাহ ইবনে হাম্বল নামে এক ব্যক্তি কোন কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। সালাম ছাড়াই এমনিই সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, বাইরে যাও এবং আস্সালামু আলাইকুম বলে ভেতরে এসো। (আবু দাউদ) অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ছিল, মানুষ নিজের নাম বলে অনুমতি চাইবে। হযরত উমরের (রা) ব্যাপারে বর্ণিত আছে, নবী করীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তিনি বলতেন ঃ

السلام عليكم يارسول الله ايدخل عمر ؟

"আস্সালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রসূল! উমর কি ভেতরে যাবে?" (আবু দাউদ)

অনুমতি নেবার জন্য নবী করীম (সা) বড় জোর তিনবার ডাক দেবার সীমা নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যদি তিনবার ডাক দেবার পরও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে ফিরে যাও। (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ) নবী (সা) নিজেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একবার তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদার বাড়ীতে গেলেন এবং আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে দু'বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। তৃতীয় বার জবাব না পেয়ে তিনি ফিরে গেলেন। হযরত সা'দ ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল আপনার মুবারক কণ্ঠ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম ও রহমতের দোয়া বের হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নীচুস্বরে জবাব দিচ্ছিলাম। (আবু দাউদ ও আহমাদ) এ তিনবার ডাকা একের পর এক হওয়া উচিত নয় বরং একটু থেমে থেমে হতে হবে। এর ফলে ঘরের লোকেরা যদি কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সে জন্য তারা জবাব দিতে না পারে তাহলে সে কাজ শেষ করে জবাব দেবার সুযোগ পাবে।

ছয় ঃ গৃহমালিক বা গৃহকর্তা অথবা এমন এক ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে যার সম্পর্কে মানুষ যথার্থই মনে করবে যে, গৃহকর্তার পক্ষ থেকে সে অনুমতি দিচ্ছে। যেমন, গৃহের খাদেম অথবা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কোন ছোট শিশু যদি বলে, এসে যান, তাহলে তার কথায় ভেতরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

সাত ঃ অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে অযথা পীড়াপীড়ি করা অথবা অনুমতি না পাওয়ায় দরজার ওপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয নয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর গৃহকর্তার পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায় বা অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, তাহলে ফিরে যাওয়া উচিত।

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكٰى لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়।[২৬] আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য বেশী শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি[২৭] এবং যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। তবে তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা এমন গৃহে প্রবেশ করো যেখানে কেউ বাস করে না এবং তার মধ্যে তোমাদের কোন কাজের জিনিস আছে[২৮] তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও যা কিছু গোপন করো আল্লাহ সবই জানেন।

হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে[২৯] এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে।[৩০] এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন।

২৬. অর্থাৎ কারোর শূন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই প্রবেশকারীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে প্রবেশ করতে পারে। যেমন গৃহকর্তা আপনাকে বলে দিয়েছেন, যদি আমি ঘরে না থাকি, তাহলে আপনি আমার কামরায় বসে যাবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্য কোন জায়গায় আছেন এবং আপনার আসার খবর পেয়ে তিনি বলে পাঠিয়েছেন, আপনি বসুন, আমি এখনই এসে যাচ্ছি। অন্যথায় গৃহে কেউ নেই অথবা ভেতর থেকে কেউ বলছে না নিছক এ কারণে বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকে যাওয়া কারোর জন্য বৈধ নয়।

২৭. অর্থাৎ এ জন্য নারাজ হওয়া বা মন খারাপ করা উচিত নয়। কোন ব্যক্তি যদি কারো সাথে দেখা করতে না চায় তাহলে তার অস্বীকার করার অধিকার আছে। অথবা কোন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সে অক্ষমতা জানিয়ে দিতে পারে। ফকীহগণ ارْجِعُوا (ফিরে যাও) এর হুকুমের এ অর্থ নিয়েছেন যে, এ অবস্থায় দরজার সামনে গাঁট হয়ে

দাঁড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই বরং সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। অন্যকে সাক্ষাত দিতে বাধ্য করা অথবা তার দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে বিরক্ত করতে থাকার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই।

২৮. এখানে মূলত হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মুসাফির খানা ইত্যাদি যেখানে লোকদের জন্য প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে সেখানকার কথা বলা হচ্ছে।

২৯. মূল শব্দগুলো হচ্ছে يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ এখানে غَضٌّ মানে হচ্ছে, কোন জিনিস কম করা, হ্রাস করা ও নিচু করা। غض بصر এর অনুবাদ সাধারণত করা হয়, "দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া বা রাখা।" কিন্তু আসলে এ হুকুমের অর্থ সবসময় দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, পূর্ণ দৃষ্টিভরে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। "দৃষ্টি সংযত রাখা" থেকে এ অর্থ ভালোভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে জিনিসটি দেখা সংগত নয় তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে। এ জন্য দৃষ্টি নত করাও যায় আবার অন্য কোন দিকে নজর ঘুরিয়েও নেয়া যায়। مِنْ اَبْصَارِهِمْ এর মধ্যে مِنْ (মিন) "কিছু" বা "কতক" অর্থ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ সমস্ত দৃষ্টি সংযত করার হুকুম দেয়া হয়নি বরং কোন কোন দৃষ্টি সংযত করতে বলা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন জিনিসই পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় বরং তিনি কেবলমাত্র একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে দৃষ্টির ওপর এ বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চান। এখন পূর্বাপর আলোচনা থেকে জানা যায়, এ বিধি-নিষেধ যে জিনিসের ওপর আরোপ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, পুরুষদের মহিলাদেরকে দেখা অথবা অন্যদের লজ্জাস্থানে দৃষ্টি দেয়া কিংবা অশ্লীল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আল্লাহর কিতাবের এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা হাদীস করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

এক ঃ নিজের স্ত্রী বা মুহাররাম নারীদের ছাড়া কাউকে নজর ভরে দেখা মানুষের জন্য জায়েয নয়। একবার হঠাৎ নজর পড়ে গেলে ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলে সেখানে আবার দৃষ্টিপাত করা ক্ষমাযোগ্য নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা, ফুসলানো কণ্ঠের যিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত লাগানো ও অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে চলা হাত ও পায়ের যিনা। ব্যভিচারের এ যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয় তখন লজ্জাস্থানগুলো তাকে পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ) হযরত বুরাইদাহ বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে (রা) বলেন ঃ

يَا عَلِىُّ لاَ تَتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ

"হে আলী! এক নজরের পর দ্বিতীয় নজর দিয়ো না। প্রথম নজর তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কিন্তু দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই।" (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করবো? বললেন, চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নামিয়ে নাও। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) আল্লাহর উক্তি বর্ণনা করেছেন :

اِنَّ النَّظْرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ -

"দৃষ্টি হচ্ছে ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্য থেকে একটি তীর, যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো যার মিষ্টি সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে"। (তাবারানী)

আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) বলেন :

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلَى مَحَاسِنِ اَمْرَاَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا -

"যে মুসলমানের দৃষ্টি কোন মেয়ের সৌন্দর্যের ওপর পড়ে এবং সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এ অবস্থায় আল্লাহ তার ইবাদাতে বিশেষ স্বাদ সৃষ্টি করে দেন।" (মুসনাদে আহমাদ)

ইমাম জা'ফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর থেকে রেওয়ায়াত করেছেন : বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (তিনি সে সময় ছিলেন একজন উঠতি তরুণ) মাশ'আরে হারাম থেকে ফেরার পথে নবী করীমের (সা) সাথে তাঁর উটের পিঠে বসেছিলেন। পথে মেয়েরা যাচ্ছিল। ফযল তাদেরকে দেখতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের ওপর হাত রাখলেন এবং তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ) এ বিদায় হজ্জেরই আর একটি ঘটনা। খাস্'আম গোত্রের একজন মহিলা পথে রসূলুল্লাহকে (সা) থামিয়ে দিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটি বিধান জিজ্ঞেস্ করছিলেন। ফযল ইবনে আব্বাস তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখ ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ)

দুই : এ থেকে কেউ যেন এ ভুল ধারণা করে না বসেন যে, নারীদের মুখ খুলে চলার সাধারণ অনুমতি ছিল তাইতো চোখ সংযত করার হুকুম দেয়া হয়। অন্যথায় যদি চেহারা ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আবার দৃষ্টি সংযত করার বা না করার প্রশ্ন আসে কেন? এ যুক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও ভুল এবং ঘটনার দিক দিয়েও সঠিক নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এর ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, চেহারার পরদা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে যাবার পরও হঠাৎ কোন নারী ও পুরুষের সামনাসামনি হয়ে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আর একজন পরদানশীন মহিলারও কখনো মুখ খোলার

প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে মুসলমান মহিলারা পরদা করা সত্ত্বেও অমুসলিম নারীরা তো সর্বাবস্থায় পরদার বাইরেই থাকবে। কাজেই নিছক দৃষ্টি সংযত করার হুকুমটি মহিলাদের মুখ খুলে ঘোরাফেরা করাকে অনিবার্য করে দিয়েছে, এ যুক্তি এখানে পেশ করা যেতে পারে না। আর ঘটনা হিসেবে এটা ভুল হবার কারণ এই যে, সূরা আহযাবে হিজাবের বিধান নাযিল হবার পরে মুসলিম সমাজে যে পরদার প্রচলন করা হয়েছিল চেহারার পরদা তার অন্তরভুক্ত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এর প্রচলন হবার ব্যাপারটি বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশার হাদীস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন, জংগল থেকে ফিরে এসে যখন দেখলাম কাফেলা চলে গেছে তখন আমি বসে পড়লাম এবং ঘুম আমার দু'চোখের পাতায় এমনভাবে জেঁকে বসলো যে, আমি ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে কাউকে ওখানে পড়ে থাকতে দেখে কাছে এলেন।

فَعَرَفَنِىْ حِيْنَ رَآنِىْ وَكَانَ قَدْ رَآنِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِىْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِىْ بِجَلْبَابِىْ -

"তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেললেন। কারণ পরদার হুকুম নাযিল হবার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনে ফেলে যখন তিনি 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়লেন তখন তাঁর আওয়াজে আমার চোখ খুলে গেলো এবং নিজের চাদরটি দিয়ে মুখ ঢেকে নিলাম।" (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম)

আবু দাউদের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে উম্মে খাল্লাদ নাম্নী এক মহিলার ছেলে এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার সম্পর্কে জানার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তার চেহারা নেকাব আবৃত ছিল। কোন কোন সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, এ সময়ও তোমার মুখ নেকাবে আবৃত? অর্থাৎ ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তো একজন মায়ের শরীরের প্রতি কোন নজর থাকে না, বেহুঁশ হয়ে পড়ে অথচ তুমি এক দম নিশ্চিন্তে নিজেকে পরদাবৃত করে এখানে হাজির হয়েছো। জবাবে তিনি বলতে লাগলেন : ان ارزا ابنى فلن ارزا حيائى "আমি পুত্র তো হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু লজ্জা তো হারাইনি"। আবু দাউদেই হযরত আয়েশার হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক মহিলা পরদার পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন পেশ করেন। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, এটা মহিলার হাত না পুরুষের? মহিলা বলেন, মহিলারই হাত। বলেন, "নারীর হাত হলে তো কমপক্ষে নখ মেহেদী রঞ্জিত হতো।" আর হজ্জের সময়ের যে দু'টি ঘটনার কথা আমরা ওপরে বর্ণনা করে এসেছি সেগুলো নববী যুগে চেহারা খোলা রাখার পক্ষে দলীল হতে পারে না। কারণ ইহ্রামের পোশাকে নেকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবুও এ অবস্থায়ও সাবধানী মেয়েরা ভিন্ পুরুষদের সামনে চেহারা খোলা রাখা পছন্দ করতেন না। হযরত আয়েশার বর্ণনা, বিদায় হজ্জের সফরে আমরা ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। মুসাফিররা যখন

আমাদের কাছ দিয়ে যেতে থাকতো তখন আমরা মেয়েরা নিজেদের মাথা থেকে চাদর টেনে নিয়ে মুখ ঢেকে নিতাম এবং তারা চলে যাবার পর মুখ আবরণমুক্ত করতাম। (আবু দাউদ, অধ্যায় ঃ মুখ আবৃত করা যেখানে হারাম)

তিন ঃ যেসব অবস্থায় কোন স্ত্রীলোককে দেখার কোন যথার্থ প্রয়োজন থাকে কেবলমাত্র সেগুলোই দৃষ্টি সংযত করার হুকুমের বাইরে আছে। যেমন কোন ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মেয়েটিকে দেখার অনুমতি আছে। বরং দেখাটা কমপক্ষে মুস্তাহাব তো অবশ্যই। মুগীরাহ ইবনে শু'বা বর্ণনা করেন, আমি এক জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, মেয়েটিকে দেখে নিয়েছো তো? আমি বলি, না। বলেন ঃ

انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما

"তাকে দেখে নাও। এর ফলে তোমাদের মধ্যে অধিকতর একাত্মতা সৃষ্টি হওয়ার আশা আছে।" (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি কোথাও বিয়ের পয়গাম দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ انظر اليها فان فى اعين الانصار شيئا "মেয়েটিকে দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে কিছু দোষ থাকে।" (মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ اَنْ يَّرٰى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ -

"তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে তখন যতদূর সম্ভব তাকে দেখে নিয়ে এ মর্মে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত যে, মেয়েটির মধ্যে এমন কোন গুণ আছে যা তাকে বিয়ে করার প্রতি আকৃষ্ট করে।" (আহমাদ ও আবু দাউদ)

মুসনাদে আহমাদে আবু হুমাইদাহর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) এ উদ্দেশ্যে দেখার অনুমতিকে فلاجناح عليه শব্দগুলোর সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এমনটি করায় ক্ষতির কিছু নেই। তাছাড়া মেয়েটির অজান্তেও তাকে দেখার অনুমতি দিয়েছেন। এ থেকেই ফকীহগণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যভাবে দেখার বৈধতার বিধানও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন অপরাধ অনুসন্ধান প্রসংগে কোন সন্দেহজনক মহিলাকে দেখা অথবা আদালতে সাক্ষ দেবার সময় কাযীর কোন মহিলা সাক্ষীকে দেখা কিংবা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের রুগিনীকে দেখা ইত্যাদি।

চার ঃ দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশের এ অর্থও হতে পারে যে, কোন নারী বা পুরুষের সতরের প্রতি মানুষ দৃষ্টি দেবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ اِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ -

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

আর হে নবী! মু'মিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে[৩১] এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাজত করে[৩২] আর[৩৩] তাদের সাজসজ্জা না দেখায়,[৩৪] যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া।[৩৫] আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।[৩৬]

"কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।" (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) আমাকে বলেন : لاتنظر الى فخذ حى ولا ميت "কোন জীবিত বা মৃত মানুষের রানের ওপর দৃষ্টি দিয়ো না।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

৩০. লজ্জাস্থানের হেফাজত অর্থ নিছক প্রবৃত্তির কামনা থেকে দূরে থাকা নয় বরং নিজের লজ্জাস্থানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়। পুরুষের জন্য সতর তথা লজ্জাস্থানের সীমানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন : عورة الرجل مابين سرته الى ركبته "পুরুষের সতর হচ্ছে তার নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত।" (দারুকুত্‌নী ও বাইহাকী) শরীরের এ অংশ স্ত্রী ছাড়া আর কারোর সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা হারাম। আসহাবে সুফ্‌ফার দলভুক্ত হযরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করীম (সা) বললেন : اما علمت ان الفخذ عورة ؟ "তুমি কি জানো না, রান ঢেকে রাখার জিনিস?" (তিরমিযী, আবু দাউদ, মুআত্তা) হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: لاتبرز (يا لا تكشف) فخذك "নিজের রান কখনো খোলা রাখবে না।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) কেবল অন্যের সামনে নয়, একান্তেও উলংগ থাকা নিষিদ্ধ। তাই নবী করীম (সা) বলেছেন :

اياكم والتعرى فان معكم من لايفارقكم الا عند الغائط وحين يفضى الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم –

"সাবধান, কখনো উলংগ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সত্তা আছে যারা কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (অর্থাৎ কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা),

তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা স্ত্রীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়া। কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো এবং তাদেরকে সম্মান করো।" (তিরমিযী)

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন ঃ

احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

"নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকি সবার থেকে নিজের সতরের হেফাজত করো।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আর যখন আমরা একাকী থাকি? জবাব দেন ঃ فا الله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه "এ অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, তিনিই এর বেশী হকদার।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

৩১. নারীদের জন্যও পুরুষদের মতো দৃষ্টি সংযমের একই বিধান রয়েছে। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা করে ভিন্ পুরুষদের দেখা উচিত নয়। ভিন্ পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে ফিরিয়ে নেয়া উচিত এবং অন্যদের সতর দেখা থেকে দূরে থাকা উচিত। কিন্তু পুরুষদের পক্ষে মেয়েদেরকে দেখার তুলনায় মেয়েদের পক্ষে পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে কিছু ভিন্ন বিধান রয়েছে। একদিকে হাদীসে আমরা এ ঘটনা পাচ্ছি যে, হযরত উম্মে সালামাহ ও হযরত উম্মে মাইমূনাহ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম এসে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় স্ত্রীকে বললেন, احتجبا منه "তার থেকে পরদা করো।" স্ত্রীরা বললেন ঃ

يا رسول الله اليس اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا

"হে আল্লাহর রসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না এবং চিনতেও পাচ্ছেন না।" বললেন ঃ افعميا وان انتما، الستما تبصرانه "তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না?" হযরত উম্মে সালামাহ (রা) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, ذالك بعد ان امر بالحجاب "এটা যখন পরদার হুকুম নাযিল হয়নি সে সময়কার ঘটনা"। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) এবং মুআত্তার একটি রেওয়ায়াত এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ হযরত আয়েশার কাছে একজন অন্ধ এলেন এবং তিনি তার থেকে পরদা করলেন। বলা হলো, আপনি এর থেকে পরদা করছেন কেন? এ-তো আপনাকে দেখতে পারে না। উম্মুল মু'মিনীন (রা) এর জবাবে বললেন ঃ لكني انظر اليه "কিন্তু আমি তো তাকে দেখছি।" অন্যদিকে আমরা হযরত আয়েশার একটি হাদীস পাই, তাতে দেখা যায়, ৭ হিজরী সনে হাবশীদের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো এবং তারা মসজিদে নববীর চত্বরে একটি খেলার আয়োজন করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হযরত আয়েশাকে এ খেলা দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ) তৃতীয় দিকে আমরা দেখি, ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যখন তাঁর স্বামী তিন তালাক দিলেন তখন প্রশ্ন দেখা দিল তিনি কোথায় ইদ্দত পালন করবেন। প্রথমে নবী করীম (সা) বললেন, উম্মে শরীক আনসারীয়ার কাছে থাকো। তারপর বললেন, তার কাছে আমার সাহাবীগণ অনেক বেশী যাওয়া আশা করে (কারণ তিনি ছিলেন একজন বিপুল ধনশালী ও দানশীলা মহিলা। বহু লোক তাঁর বাড়িতে মেহমান থাকতেন এবং তিনি তাদের মেহমানদারী

করতেন।) কাজেই তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের ওখানে থাকো। সে অন্ধ। তুমি তার ওখানে নিসংকোচে থাকতে পারবে।" (মুসলিম ও আবু দাউদ)

এসব বর্ণনা একত্র করলে জানা যায়, পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে মহিলাদের ওপর তেমন বেশী কড়াকড়ি নেই যেমন মহিলাদেরকে দেখার ব্যাপারে পুরুষদের ওপর আরোপিত হয়েছে। এক মজলিসে মুখোমুখি বসে দেখা নিষিদ্ধ। পথ চলার সময় অথবা দূর থেকে কোন কোন জায়েয খেলা দেখতে গিয়ে পুরুষদের ওপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। আর কোন যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলে একই বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও দেখলে কোন ক্ষতি নেই। ইমাম গাযযালী ও ইবনে হাজার আসকালানীও হাদীসগুলো থেকে প্রায় এ একই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শাওকানী নাইলুল আওতারে ইবনে হাজারের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "এ থেকেও বৈধতার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় যে, মেয়েদের বাইরে বের হবার ব্যাপারে সবসময় বৈধতাকেই কার্যকর করা হয়েছে। মসজিদে, বাজারে এবং সফরে মেয়েরা তো মুখে নেকাব দিয়ে যেতো, যাতে পুরুষরা তাদেরকে না দেখে। কিন্তু পুরুষদেরকে কখনো এ হুকুম দেয়া হয়নি যে, তোমরাও নেকাব পরো, যাতে মেয়েরা তোমাদেরকে না দেখে। এ থেকে জানা যায়, উভয়ের ব্যাপারে হুকুমের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে।" (৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা) তবুও মেয়েরা নিশ্চিন্তে পুরুষদেরকে দেখবে এবং তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকবে, এটা কোনক্রমেই জায়েয নয়।

৩২. অর্থাৎ অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে উন্মুক্ত করাও পরিহার করে। এ ব্যাপারে মহিলাদের ও পুরুষদের জন্য একই বিধান, কিন্তু নারীদের সতরের সীমানা পুরুষদের থেকে আলাদা। তাছাড়া মেয়েদের সতর মেয়েদের ও পুরুষদের জন্য আবার ভিন্ন ভিন্ন।

পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর হাত ও মুখ ছাড়া তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ এমন কি বাপ ও ভাইয়ের সামনেও তা খোলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন পাতলা বা চোস্ত পোশাক পরা উচিত নয় যার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন কাঠামো ভেতর থেকে ফুটে উঠতে থাকে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তাঁর বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তখন তিনি পাত্‌লা কাপড় পরে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) সংগে সংগেই মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন ঃ

يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ –

"হে আসমা! কোন মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের কোন অংশ দেখা যাওয়া জায়েয নয়।" (আবু দাউদ)

এ ধরনের আর একটি ঘটনা ইবনে জারীর হযরত আয়েশা থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ তাঁর কাছে তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনুত তোফায়েলের মেয়ে আসেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রবেশ করে তাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেন। হযরত আয়েশা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ হচ্ছে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তিনি বলেন ঃ

اِذَا عَرِكَتِ الْمَرْاَةُ لَمْ يَحِلُّ لَهَا اَنْ تُظْهِرَ اِلاَّ وَجْهَهَا وَاِلاَّ مَا دُوْنَ هٰذَا وَقَبَضَ عَلٰى ذِرَاعِ نَفْسِهِ وَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهِ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْلَ قَبْضَةٍ اُخْرٰى –

"মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার জন্য নিজের মুখ ও হাত ছাড়া আর কিছু বের করে রাখা হালাল নয়, আর নিজের কব্জির ওপর হাত রেখে হাতের সীমানা তিনি এভাবে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুঠি ও হাতের তালুর মধ্যে মাত্র এক মুঠি পরিমাণ জায়গা খালি থাকে।"

এ ব্যাপারে শুধুমাত্র এতটুকু সুযোগ আছে যে, ঘরের কাজকর্ম করার জন্য মেয়েদের শরীরের যতটুকু অংশ খোলার প্রয়োজন দেখা দেয় নিজেদের মুহাররাম আত্মীয়দের (যেমন বাপ–ভাই ইত্যাদি) সামনে মেয়েরা শরীরের কেবলমাত্র ততটুকু অংশই খুলতে পারে। যেমন আটা মাখাবার সময় হাতের আস্তিন গুটানো অথবা ঘরের মেঝে ধুয়ে ফেলার সময় পায়ের কাপড় কিছু ওপরের দিকে তুলে নেয়া।

আর মহিলাদের জন্য মহিলাদের সতরের সীমারেখা হচ্ছে পুরুষদের জন্য পুরুষদের সতরের সীমারেখার মতই। অর্থাৎ নাভি ও হাঁটুর মাঝখানের অংশ। এর অর্থ এ নয় যে, মহিলাদের সামনে মহিলারা অর্ধ উলংগ থাকবে। বরং এর অর্থ শুধুমাত্র এই যে, নাভি ও হাঁটুর মাঝখানের অংশটুকু ঢাকা হচ্ছে ফরয এবং অন্য অংশগুলো ঢাকা ফরয নয়।

৩৩. এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর শরীয়াত নারীদের কাছে শুধুমাত্র এতটুকুই দাবী করে না যতটুকু পুরুষদের কাছে করে। অর্থাৎ দৃষ্টি সংযত করা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করা। বরং তাদের কাছ থেকে আরো বেশী কিছু দাবী করে। এ দাবী পুরুষদের কাছে করেনি। পুরুষ ও নারী যে এ ব্যাপারে সমান নয় তা এ থেকে পরিষ্কার প্রকাশ হয়।

৩৪. আমি زِيْنَت শব্দের অনুবাদ করেছি "সাজসজ্জা"। এর দ্বিতীয় আর একটি অনুবাদ হতে পারে প্রসাধন। তিনটি জিনিসের ওপর এটি প্রযুক্ত হয়। সুন্দর কাপড়, অলংকার এবং মাথা, মুখ, হাত, পা ইত্যাদির বিভিন্ন সাজসজ্জা, যেগুলো সাধারণত মেয়েরা করে থাকে। আজকের দুনিয়ায় এ জন্য "মেকআপ" (Makeup) শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ সাজসজ্জা কাকে দেখানো যাবে না এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা সামনের দিকে আসছে।

৩৫. তাফসীরগুলোর বিভিন্ন বর্ণনা এ আয়াতটির অর্থ যথেষ্ট অস্পষ্ট করে তুলেছে। অন্যথায় কথাটি মোটেই অস্পষ্ট নয়, একেবারেই পরিষ্কার। প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে لاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ অর্থাৎ "তারা যেন নিজেদের সাজসজ্জা ও প্রসাধন প্রকাশ না করে।" আর দ্বিতীয় বাক্যাংশে اِلاَّ শব্দটি বলে এ নিষেধাজ্ঞায় যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে যাকে আলাদা তথা নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, مَا ظَهَرَ مِنْهَا "যা কিছু এ সাজসজ্জা থেকে আপনা আপনি প্রকাশ হয় বা প্রকাশ হয়ে যায়।" এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, মহিলাদের নিজেদের স্বেচ্ছায় এগুলো প্রকাশ ও এসবের প্রদর্শনী না করা উচিত। তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় (যেমন চাদর বাতাসে উড়ে যাওয়া এবং কোন আভরণ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া) অথবা যা নিজে নিজে প্রকাশিত (যেমন ওপরে যে

চাদরটি জড়ানো থাকে, কারণ কোনক্রমেই তাকে লুকানো তো সম্ভব নয় আর নারীদের শরীরের সাথে লেপটে থাকার কারণে মোটামুটিভাবে তার মধ্যেও স্বতস্ফূর্তভাবে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়) সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জবাবদিহি নেই। এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম নাখ্‌ঈ। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাসসির مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর অর্থ নিয়েছেন ঃ مَا يُظْهِرُهُ الْاِنْسَانُ عَلَى الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ (মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ করে দেয়) এবং তারপর তারা এর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন মুখ ও হাতকে তাদের সমস্ত সাজসজ্জাসহ। অর্থাৎ তাদের মতে মহিলারা তাদের গালে রুজ পাউডার, ঠোঁটে লিপষ্টিক ও চোখে সুরমা লাগিয়ে এবং হাতে আংটি, চুড়ি ও কংকন ইত্যাদি পরে তা উন্মুক্ত রেখে লোকদের সামনে চলাফেরা করবে। ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁর শিষ্যগণ এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। হানাফী ফকীহদের একটি বিরাট অংশও এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। (আহ্‌কামুল কুরআন—জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৮৮–৩৮৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু আরবী ভাষার কোন্‌ নিয়মে مَا ظَهَرَ কে مَا يُظْهِرُ এর অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে তা আমি বুঝতে অক্ষম। "প্রকাশ হওয়া" ও "প্রকাশ করার" মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এবং আমরা দেখি কুরআন স্পষ্টভাবে "প্রকাশ করা" থেকে বিরত রেখে "প্রকাশ হওয়া"র ব্যাপারে অবকাশ দিচ্ছে। এ অবকাশকে "প্রকাশ করা" পর্যন্ত বিস্তৃত করা কুরআনেরও বিরোধী এবং এমন সব হাদীসেরও বিরোধী যেগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, নববী যুগে হিজাবের হুকুম এসে যাবার পর মহিলারা মুখ খুলে চলতো না, হিজাবের হুকুমের মধ্যে চেহারার পরদাও শামিল ছিল এবং ইহরাম ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় নেকাবকে মহিলাদের পোশাকের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিল। তারপর এর চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ অবকাশের পক্ষে যুক্তি হিসেবে একথা পেশ করা হয় যে, মুখ ও হাত মহিলাদের সতরের অন্তরভুক্ত নয়। অথচ সতর ও হিজাবের মধ্যে যমীন আসমান ফারাক। সতর মুহাররাম পুরুষদের সামনে খোলাও জায়েয নয়। আর হিজাব তো সতরের অতিরিক্ত একটি জিনিস, যাকে নারীদের ও গায়ের মুহাররাম পুরুষদের মাঝখানে আটকে দেয়া হয়েছে এবং এখানে সতরের নয় বরং হিজাবের বিধান আলোচ্য বিষয়।

৩৬. জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় এক ধরনের আঁটসাঁট বাঁধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খোঁপার সাথে এর গিরো বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা থাকতো। সেখানে গলা ও বুকের ওপরের দিকের অংশটি পরিষ্কার দেখা যেতো। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটে খোঁপা দেখা যেতো। (তাফসীরে কাশ্‌শাফ, ২য় খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড ২৮৩–২৮৪ পৃষ্ঠা) এ আয়াত নাযিল হবার পর মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ওড়নার প্রচলন করা হয়। আজকালকার মেয়েদের মতো তাকে ভাঁজ করে পেঁচিয়ে গলার মালা বানানো এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এটি শরীরে জড়িয়ে মাথা, কোমর, বুক ইত্যাদি সব ভালোভাবে ঢেকে নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। মু'মিন মহিলারা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে হযরত আয়েশা (রা) তার প্রশংসা করে বলেন ঃ সূরা নূর নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে তা শুনে লোকেরা ঘরে ফিরে আসে এবং নিজেদের স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদের আয়াতগুলো শোনায়। আনসারদের মেয়েদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ বাক্যাংশ শোনার

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিম্নোক্তদের সামনে ছাড়া[৩৭] স্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ,[৩৮] নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে,[৩৯] ভাই,[৪০] ভাইয়ের ছেলে,[৪১] বোনের ছেলে,[৪২] নিজের মেলামেশার মেয়েদের,[৪৩] নিজের মালিকানাধীনদের,[৪৪] অধীনস্থ পুরুষদের যাদের অন্য কোন রকম উদ্দেশ্য নেই[৪৫] এবং এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ।[৪৬] তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।[৪৭]

হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো,[৪৮] আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।[৪৯]

পর নিজের জায়গায় চুপটি করে বসে ছিল। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সংগেই ওড়না বানিয়ে ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। পরদিন ফজরের নামাযের সময় যতগুলো মহিলা মসজিদে নববীতে হাজির হয়েছিল তাদের সবাই দোপাট্টা ও ওড়না পরা ছিল। এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) আরো বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন : মহিলারা পাত্‌লা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে ওড়না তৈরী করে। (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ এবং আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)

ওড়না পাত্‌লা কাপড়ের না হওয়া উচিত। এ বিধানগুলোর মেজাজ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে এ বিষয়টি নিজে নিজেই উপলব্ধি করা যায়। কাজেই আনসারদের মহিলারা হুকুম শুনেই বুঝতে পেরেছিল কোন্ ধরনের কাপড় দিয়ে ওড়না তৈরী করলে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। কিন্তু শরীয়াত প্রবর্তক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটিকে শুধুমাত্র লোকদের বোধ ও উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দেননি বরং তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করে

দিয়েছেন। দেহ্ইয়াহ কাল্বী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মিসরের তৈরী সূক্ষ্ম মল্মল্ (কাবাতী) এলো। তিনি তা থেকে একটুকরা আমাকে দিলেন এবং বললেন, এখান থেকে কেটে এক খণ্ড দিয়ে তোমার নিজের জামা তৈরী করে নাও এবং এক অংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর দোপাট্টা বানিয়ে দাও, কিন্তু তাকে বলে দেবে تجعل تحته ثوبا لا يصفها এর নিচে যেন আর একটি কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীরের গঠন ভেতর থেকে দেখা না যায়।" (আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)।

৩৭. অর্থাৎ যাদের মধ্যে একটি মহিলা তার পূর্ণ সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা সহকারে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে এসব লোক হচ্ছে তারাই। এ জনগোষ্ঠীর বাইরে আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে-ই থাক না কেন কোন নারীর তার সামনে সাজগোজ করে আসা বৈধ নয়। ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها বাক্যে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল তার অর্থ এখানে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এভাবে যে, এ সীমিত গোষ্ঠীর বাইরে যারাই আছে তাদের সামনে নারীর সাজসজ্জা ইচ্ছাকৃত বা বেপরোয়াভাবে নিজেই প্রকাশ করা উচিত নয়, তবে তার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অথবা তার ইচ্ছা ছাড়াই যা প্রকাশ হয়ে যায় অথবা যা গোপন করা সম্ভব না হয় তা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য।

৩৮. মূলে ابآء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ শুধু বাপ নয় বরং দাদা ও দাদার বাপ এবং নানা ও নানার বাপও এর অন্তরভুক্ত। কাজেই একটি মহিলা যেভাবে তার বাপ ও শ্বশুরের সামনে আসতে পারে ঠিক তেমনিভাবে আসতে পারে তার বাপের ও নানার বাড়ির এসব মুরব্বীদের সামনেও।

৩৯. ছেলের অন্তরভুক্ত হবে নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই। আর এ ব্যাপারে নিজের ও সতীনের মধ্যে কোন ফারাক নেই। নিজের সতীন পুত্রদের সন্তানদের সামনে নারীরা ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে যেমন নিজের সন্তানদের ও সন্তানদের সন্তানদের সামনে করতে পারে।

৪০. ভাইয়ের মধ্যে সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাই সবাই শামিল।

৪১. ভাইবোনদের ছেলে বলতে তিন ধরনের ভাই বোনদের সন্তান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নাতি, নাতির ছেলে এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই এর অন্তরভুক্ত।

৪২. এখানে যেহেতু আত্মীয়দের গোষ্ঠী খতম হয়ে যাচ্ছে তাই সামনের দিকে অনাত্মীয় লোকদের কথা বলা হচ্ছে। এ জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে তিনটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। কারণ এ বিষয়গুলো না বুঝলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, কেউ কেউ সাজসজ্জা প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেবলমাত্র এমন সব আত্মীয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করেন যাদের নাম এখানে উচ্চারণ করা হয়েছে। বাকি সবাইকে এমনকি আপন চাচা ও আপন মামাকেও যেসব আত্মীয়দের থেকে পরদা করতে হবে তাদের মধ্যে গণ্য করেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এদের নাম কুরআনে বলা হয়নি। কিন্তু একথা সঠিক নয়। আপন চাচা ও মামা তো দূরের কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো দুধ চাচা ও দুধ মামা থেকেও পরদা করতে হযরত আয়েশাকে অনুমতি

দেননি। সিহাহেসিত্তা ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আবুল কু'আইসের ভাই আফ্লাহ তাঁর কাছে এলেন এবং ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। যেহেতু তখন পরদার হুকুম নাযিল হয়ে গিয়েছিল, তাই হযরত আয়েশা অনুমতি দিলেন না। তিনি বলে পাঠালেন, তুমি তো আমার ভাইঝি, কারণ তুমি আমার ভাই আবুল কু'আইসের স্ত্রীর দুধপান করেছো। কিন্তু এ সম্পর্কটা কি এমন পর্যায়ের যেখানে পরদা উঠিয়ে দেয়া জায়েয এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। ইত্যবসরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে গেলেন। তিনি বললেন, সে তোমার কাছে আসতে পারে। এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ আয়াতকে এ অর্থে নেননি যে, এর মধ্যে যেসব আত্মীয়ের কথা বলা হয়েছে কেবল তাদের থেকে পরদা করা হবে না এবং বাকি সবার থেকে পরদা করা হবে। বরং তিনি এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যেসব আত্মীয়ের সাথে একটি মেয়ের বিয়ে হারাম তারা সবাই এ আয়াতের হুকুমের অন্তরভুক্ত। যেমন চাচা, মামা, জামাতা ও দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন। তাবে'ঈদের মধ্যে হযরত হাসান বসরীও এ মত প্রকাশ করেছেন এবং আল্লামা আবু বকর জাস্সাস আহকামুল কুরআনে এর প্রতিই সমর্থন জানিয়েছেন। (৩য় খণ্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের সাথে চিরন্তন হারামের সম্পর্ক নয় (অর্থাৎ যাদের সাথে একজন কুমারী বা বিধবার বিয়ে বৈধ) তারা মুহাররাম আত্মীয়দের অন্তরভুক্ত নয়। মেয়েরা নিসংকোচে সাজসজ্জা করে তাদের সামনে আসবে না। আবার একেবারে অনাত্মীয় অপরিচিতদের মতো তাদের থেকে তেমনি পূর্ণ পরদাও করবে না যেমন ভিন পুরুষদের থেকে করে। এ দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি কি দৃষ্টিভংগী হওয়া উচিত তা শরীয়াতে নির্ধারিত নেই। কারণ এটা নির্ধারিত হতে পারে না। এর সীমানা বিভিন্ন আত্মীয়ের ব্যাপারে তাদের আত্মীয়তা, বয়স, পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এবং উভয়পক্ষের অবস্থার (যেমন এক গৃহে বা আলাদা আলাদা বাস করা) প্রেক্ষিতে অবশ্যি বিভিন্ন হবে এবং হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের নিয়ম ও কর্মপদ্ধতি যা কিছু ছিল তা থেকে আমরা এ দিকনির্দেশনাই পাই। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা। বহু হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি রসূলের (সা) সামনে আসতেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কমপক্ষে চেহারা ও হাতের ক্ষেত্রে কোন পরদা ছিল না। বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় নবীর (সা) ইন্তিকালের মাত্র কয়েক মাস আগে এবং সে সময়ও এ অবস্থাই বিরাজিত ছিল (দেখুন আবু দাউদ, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুহাররাম তার গোলামকে আদব শিক্ষা দেবে)। অনুরূপভাবে হযরত উম্মেহানী ছিলেন আবু তালেবের মেয়ে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত বোন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি নবী করীমের (সা) সামনে আসতেন এবং কমপক্ষে তাঁর সামনে কখনো নিজের মুখ ও চেহারার পরদা করেননি। মক্কা বিজয়ের সময়ের একটি ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন। এ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। (দেখুন আবু দাউদ, কিতাবুস সওম, বাবুন ফীন নীয়্যাত ফিস সওমে ওয়ার রুখসাতে ফকীহ।) অন্যদিকে আমরা দেখি, হযরত আব্বাস তার ছেলে ফযলকে এবং রাবী'আহ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাত ভাই) তাঁর ছেলে আবদুল মুত্তালিবকে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বলে পাঠালেন যে, এখন তোমরা যুবক হয়ে গেছো, তোমরা রোজগারের ব্যবস্থা করতে না পারলে তোমাদের বিয়ে হতে পারে না, কাজেই তোমরা রসূলের (সা) কাছে গিয়ে কোন চাকরির দরখাস্ত করো। তারা দু'জন হযরত যয়নবের গৃহে গিয়ে রসূলুল্লাহর খিদমতে হাযির হলেন। হযরত যয়নব ছিলেন ফযলের আপন ফুপাত বোন আর আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আর বাপের সাথেও তাঁর ফযলের সাথে যেমন তেমনি আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি তাদের দু'জনের সামনে হাযির হলেন না এবং রসূলের (সা) উপস্থিতিতে পরদার পেছন থেকে তাদের সাথে কথা বলতে থাকলেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ) এ দু'ধরনের ঘটনাবলী মিলিয়ে দেখলে ওপরে আমি যা বর্ণনা করে এসেছি বিষয়টির সে চেহারাই বোধগম্য হবে।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেখানে আত্মীয়তা সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায় সেখানে মুহাররাম আত্মীয়দের থেকেও সতর্কতা হিসেবে পরদা করা উচিত। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে উদ্ধৃত হয়েছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সওদার (রা) এক ভাই ছিল বাঁদিপুত্র (অর্থাৎ তাঁর পিতার ক্রীতদাসীর গর্ভজাত ছিল)। তাঁর সম্পর্কে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে (রা) তাঁর ভাই উত্‌বা এ মর্মে অসীয়াত করেন যে, এ ছেলেকে নিজের ভাতিজা মনে করে তার অভিভাবকত্ব করবে কারণ সে আসলে আমার ঔরসজাত। এ মামলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তিনি হযরত সা'দের দাবী এই বলে নাকচ করে দিলেন যে, "যার বিছানায় সন্তানের জন্ম হয়েছে সে-ই সন্তানের পিতা। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।" কিন্তু সাথে সাথেই তিনি হযরত সওদাকে বলে দিলেন, এ ছেলেটি থেকে পরদা করবে (احتجبى منه) কারণ সে যে সত্যিই তার ভাই এ ব্যাপারে নিসন্দেহ হওয়া যায়নি।

৪৩. মূলে نسائهن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "তাদের মহিলারা" এখানে কোন্ মহিলাদের কথা বলা হয়েছে সে বিতর্কে পরে আসা যাবে। এখন সবার আগে যে কথাটি উল্লেখযোগ্য এবং যেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত সেটি হচ্ছে, এখানে নিছক "মহিলারা" (النساء) বলা হয়নি, যার ফলে মুসলমান মহিলার জন্য সমস্ত মহিলাদের এবং সব ধরনের মেয়েদের সামনে বেপরদা হওয়া ও সাজসজ্জা প্রকাশ করা জায়েয হয়ে যেতো। বরং نسائهن বলে মহিলাদের সাথে তার স্বাধীনতাকে সর্বাবস্থায় একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। সে গণ্ডী যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এটা কোন্ গণ্ডী এবং সে মহিলারাই বা কারা যাদের ওপর نساء هن শব্দ প্রযুক্ত হয়? এর জবাব হচ্ছে, এ ব্যাপারে ফকীহ ও মুফাস্‌সিরগণের উক্তি বিভিন্ন :

একটি দল বলেন, এখানে কেবলমাত্র মুসলমান মেয়েদের কথা বলা হয়েছে। যিম্মী বা অন্য যে কোন ধরনের অমুসলিম মেয়েরাই হোক না কেন মুসলমান মেয়েদেরকে তাদের থেকে পুরুষদের থেকে যেমন করা হয় তেমনি পরদা করা উচিত। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও জুরাইজ এ মত পোষণ করেন। এঁরা নিজেদের সমর্থনে এ ঘটনাটিও পেশ করে থাকেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত আবু উবাইদাহকে লেখেন, "আমি শুনেছি কিছু কিছু মুসলিম নারী অমুসলিম নারীদের সাথে হাম্মামে যাওয়া শুরু করেছে। অথচ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য তার শরীরের ওপর তার মিল্লাতের অন্তরভুক্তদের

ছাড়া অন্য কারোর দৃষ্টি পড়া হালাল নয়।" এ পত্র যখন হযরত আবু উবাইদাহ পান তখন তিনি হঠাৎ ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বলতে থাকেন, "হে আল্লাহ! যেসব মুসলমান মহিলা নিছক ফর্সা হবার জন্য এসব হাম্মামে যায় তাদের মুখ যেন আখেরাতে কালো হয়ে যায়।" (ইবনে জারীর, বায়হাকী ও ইবনে কাসীর)

দ্বিতীয় দলটি বলেন, এখানে সব নারীদের কথা বলা হয়েছে। ইমাম রাযীর দৃষ্টিতে এ মতটিই সঠিক। কিন্তু একথা বোধগম্য নয় যে, যদি সত্যিই আল্লাহর উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে তাহলে আবার نِسَاءِهِنَّ বলার অর্থ কি? এ অবস্থায় তো শুধু النِّسَاءِ বলা উচিত ছিল।

তৃতীয় মতটিই যুক্তিসংগত এবং কুরআনের শব্দের নিকটতরও। সেটি হচ্ছে, যেসব নারীদের সাথে তারা মেলামেশা করে, যাদের সাথে তাদের জানাশোনা আছে, যাদের সাথে তারা সম্পর্ক রাখে এবং যারা তাদের কাজে কর্মে অংশ নেয় তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে। তারা মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও। অপরিচিত মহিলাদের যাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণের অবস্থা জানা নেই অথবা যাদের বাইরের অবস্থা সন্দেহজনক এবং যারা নির্ভরযোগ্য নয়, তাদেরকে এ গণ্ডীর বাইরে রাখাই এর উদ্দেশ্য। কিছু সহীহ হাদীস থেকে এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের কাছে যিম্মী মহিলাদের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে আসল জিনিসটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে সেটি ধর্মীয় বিভিন্নতা নয় বরং নৈতিক অবস্থা। অমুসলিম হলেও পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য পরিবারের ভদ্র, লজ্জাশীলা ও সদাচারী মহিলাদের সাথে মুসলিম মহিলারা পুরোপুরি নিসংকোচে মেলামেশা করতে পারে। কিন্তু মুসলমান মেয়েরাও যদি বেহায়া, বেপরদা ও অসদাচারী হয় তাহলে প্রত্যেক শরীফ ও ভদ্র পরিবারের মহিলার তাদের থেকে পরদা করা উচিত। কারণ নৈতিকতার জন্য তাদের সাহচর্য ভিন পুরুষদের সাহচর্যের তুলনায় কম ক্ষতিকর নয়। আর অপরিচিত মহিলারা যাদের অবস্থা জানা নেই, তাদের সাথে মেলামেশা করার সীমানা আমাদের মতে গায়ের মুহাররাম আত্মীয়দের সামনে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সর্বাধিক সীমানার সমপরিমাণ হতে পারে। অর্থাৎ তাদের সামনে মহিলারা কেবলমাত্র মুখ ও হাত খুলতে পারে, বাকি সারা শরীর ও অংগসজ্জা ঢেকে রাখতে হবে।

৪৪. এ নির্দেশটির অর্থ বুঝার ব্যাপারেও ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। একটি দল এর অর্থ করেছেন এমন সব বাঁদী যারা কোন মহিলার মালিকানাধীন আছে। তাদের মতে, আল্লাহর উক্তির অর্থ হচ্ছে, বাঁদী মুশরিক বা আহলি কিতাব যে দলেরই অন্তরভুক্ত হোক না কেন মুসলিম মহিলা মালিক তার সামনে তো সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারে কিন্তু মহিলার নিজেরই মালিকানাধীন গোলামের থেকেও পরদা করার ব্যাপারটি অপরিচিত স্বাধীন পুরুষের থেকে পরদার সমপর্যায়ের। এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, সা'ঈদ ইবনে মুসাইইব, তাউস ও ইমাম আবু হানীফার মত। ইমাম শাফেঈ'র একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। এ মনীষীদের যুক্তি হচ্ছে, গোলামের জন্য তার মহিলা মালিক মুহাররাম নয়। যদি সে স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে তার আগের মহিলা মালিককে বিয়েও করতে পারে। কাজেই নিছক গোলামী এমন কোন কারণ হতে পারে না যার ফলে মহিলারা তাদের সামনে এমন স্বাধীনভাবে

চলাফেরা করবে যার অনুমতি মুহাররাম পুরুষদের সামনে চলাফেরা করার জন্য দেয়া হয়েছে। এখন বাকী থাকে এ প্রশ্নটি যে, ما ملكت ايمانهن শব্দাবলী ব্যাপক অর্থবোধক, গোলাম ও বাঁদী উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়, তাহলে আবার বিশেষভাবে বাঁদীদের জন্য একে ব্যবহার করার যুক্তি কি? এর জবাব তারা এভাবে দেন যে, এ শব্দাবলী যদিও ব্যাপক অর্থবোধক তবুও পরিবেশ ও পরিস্থিতি এগুলোর অর্থকে মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ করছে। প্রথমে نسائهن বলা হয় তারপর বলা হয় ماملكت ايمانهن প্রথমে نسائهن শব্দ শুনে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারতো এখানে এমন নারীদের কথা বলা হয়েছে যারা কোন নারীর পরিচিত মহলের বা আত্মীয়–স্বজনদের অন্তরভুক্ত হবে। এ থেকে হয়তো বাঁদীরা এর অন্তরভুক্ত নয়, এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই ما ملكت ايمانهن বলে দিয়ে একথা পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাধীন মেয়েদের মতো বাঁদীদের সামনেও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় দলের মতে এ অনুমতিতে বাঁদী ও গোলাম উভয়ই রয়েছে। এটি হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ও অন্য কতিপয় আহলে বায়েত ইমামের অভিমত। ইমাম শাফে'ঈর একটি বিখ্যাত উক্তিও এর সপক্ষে রয়েছে। তাদের যুক্তি শুধুমাত্র ماملكت ايمانهن এর ব্যাপক অর্থ থেকে নয় বরং তারা সুন্নাতে রসূল থেকেও এর সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেন। যেমন এ ঘটনাটি ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌আদাতিল ফাযারী নামক এক গোলামকে নিয়ে হযরত ফাতেমার বাড়িতে গেলেন। তিনি সে সময় এমন একটি চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন যা দিয়ে মাথা ঢাকতে গেলে পা খুলে যেতো এবং পা ঢাকতে গেলে মাথা খুলে যেতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হতবিহ্বল ভাব দেখে বললেন, ليس عليك باس انما هو ابوك وغلامك "কোন দোষ নেই, এখানে আছে তোমার বাপ ও তোমার গোলাম।" (আবু দাউদ, আহমাদ ও বায়হাকী আনাস ইবনে মালেকের উদ্ধৃতি থেকে। ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমাকে এ গোলামটি দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একে লালন পালন করেছিলেন এবং তারপর মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ উপকারের প্রতিদান সে এভাবে দিয়েছিল যে, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের সময় হযরত আলীর প্রতি চরম শত্রুতার প্রকাশ ঘটিয়ে আমীর মু'আবিয়ার একান্ত সমর্থকে পরিণত হয়েছিল।) অনুরূপভাবে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি থেকেও যুক্তি প্রদর্শন করেন—

اذا كان لاحد اكن مكاتب وكان له ما يودى فلتحتجب منه

"যখন তোমাদের কেউ তার গোলামের সাথে "মুকাতাবাত" তথা অর্থ আদায়ের বিনিময়ে মুক্তি দেবার লিখিত চুক্তি করে এবং সে চুক্তিকৃত অর্থ আদায় করার ক্ষমতা রাখে তখন তার সে গোলাম থেকে পরদা করা উচিত।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ উম্মে সালামার রেওয়ায়াত থেকে)

৪৫. মূলে التابعين غير اولى الاربه من الرجال শব্দাবলী বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "পুরুষদের মধ্য থেকে এমন সব পুরুষ যারা অনুগত, কামনা রাখে

না।" এ শব্দগুলো থেকে প্রকাশ হয়, মুহাররাম পুরুষদের ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সামনে একজন মুসলমান মহিলা কেবলমাত্র এমন অবস্থায় সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে, যখন তার মধ্যে দু'টি গুণ পাওয়া যায়, এক, সে অনুগত অর্থাৎ অধীনস্থ ও কর্তৃত্বের অধীন। দুই, তার মধ্যে কামনা নেই। অর্থাৎ নিজের বয়স, শারিরীক অসামর্থ, বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা, দারিদ্র ও অর্থহীনতা অথবা অন্যের পদানত হওয়া ও গোলামীর কারণে তার মনে গৃহকর্তার স্ত্রী, মেয়ে, বোন বা মা সম্পর্কে কোন কুসংকল্প সৃষ্টি হবার শক্তি বা সাহস থাকে না। এ হুকুমকে যে ব্যক্তিই নাফরমানীর অবকাশ অনুসন্ধানের নিয়েতে নয় বরং আনুগত্য করার নিয়তে পড়বে সে প্রথম দৃষ্টিতেই অনুভব করবে যে, আজকালকার বেয়ারা, খানসামা, শোফার ও অন্যান্য যুবক কর্মচারীরা অবশ্যি এ সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। মুফাস্‌সির ও ফকীহগণ এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তার ওপর একবার নজর বুলালে জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ এ শব্দগুলোর কি অর্থ বুঝেছেন তা জানা যেতে পারে ঃ

ইবনে আব্বাস ঃ এর অর্থ হচ্ছে এমন সব সাদাসিধে বোকা ধরনের লোক যারা মহিলাদের ব্যাপারে আগ্রহী নয়।

কাতাদাহ ঃ এমন পদানত ব্যক্তি যে নিজের পেটের খাবার যোগাবার জন্য তোমার পেছনে পড়ে থাকে।

মুজাহিদ ঃ এমন লোক যে ভাত চায়, মেয়েলোক চায় না। থাকে।

শা'বী ঃ যে ব্যক্তি গৃহকর্তার অনুগত তার পদানত এবং যার মধ্যে মেয়েদের প্রতি তাকাবার হিম্মত নেই।

ইবনে যায়েদ ঃ যে ব্যক্তি কোন পরিবারের সাথে লেগে থাকে। এমনকি তাদের ঘরের লোকে পরিণত হয় এবং সে পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়। ঘরের মেয়েদের প্রতি সে নজর দেয় না এবং এ ধরনের নজর দেবার হিম্মতই করতে পারে না। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই সে তাদের সাথে লেগে থাকে।

তাউস ও যুহ্‌রী ঃ নির্বোধ ব্যক্তি, যার মধ্যে মেয়েদের প্রতি উৎসাহ নেই এবং এর হিম্মতও নেই।

(ইবনে জারীর, ১৮ খণ্ড, ৯৫–৯৬ পৃষ্ঠা এবং ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাখ্যাগুলোর চাইতেও বেশী স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। এটি ঘটেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায়। বুখারী, মুসলিম আবু দাউদ, নাসাঈ ও আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এটি হযরত আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামাহ (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ মদীনা তাইয়েবায় ছিল এক নপুংশক হিজড়ে। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ ও অন্য মহিলারা তাকে غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ এর মধ্যে গণ্য করে নিজেদের কাছে আসতে দিতেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহর কাছে গেলেন। সেখানে তিনি তাকে উম্মে সালামার (রা) ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়ার সাথে কথা বলতে শুনলেন। সে বলছিল, কাল যদি তায়েফ জয় হয়ে যায়, তাহলে আপনি গাইলান সাকাফির মেয়ে বাদীয়াকে না নিয়ে

শান্ত হবেন না। তারপর সে বাদীয়ার সৌন্দর্য ও তার দেহ সৌষ্ঠবের প্রশংসা করতে থাকলো এমনকি তার গোপন অংগসমূহের প্রশংসামূলক বর্ণনাও দিয়ে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বললেন, "ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই তো তাকে খুবই লক্ষ করে দেখেছিস বলে মনে হয়।" তারপর তিনি হুকুম দিলেন, তার সাথে পরদা করো এবং ভবিষ্যতে যেন সে গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। এরপর তিনি তাকে মদীনা থেকে বের করে দিলেন এবং অন্যান্য নপুংশক পুরুষদেরকেও অন্যের গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিলেন। কারণ তাদেরকে নপুংশক মনে করে মেয়েরা তাদের সামনে সতর্কতা অবলম্বন করতো না এবং তারা এক ঘরের মেয়েদের অবস্থা অন্য ঘরের পুরুষদের কাছে বর্ণনা করতো। এ থেকে জানা যায়, কারো غير اولى الاربة (কামনাহীন) হবার জন্য কেবলমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, সে শারীরিক দিক দিয়ে ব্যভিচার করতে সমর্থ নয় যদি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যৌন কামনা থেকে থাকে এবং সে মেয়েদের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয় তাহলে অবশ্যি সে অনেক রকমের বিপদের কারণ হতে পারে।

৪৬. অর্থাৎ যাদের মধ্যে এখনো যৌন কামনা সৃষ্টি হয়নি। বড় জোর দশ–বারো বছরের ছেলেদের ব্যাপারে একথা বলা যেতে পারে। এর বেশী বয়সের ছেলেরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলেও তাদের মধ্যে যৌন কামনার উন্মেষ হতে থাকে।

৪৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমটিকে কেবলমাত্র অলংকারের ঝংকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, দৃষ্টি ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিতকারী জিনিসগুলোও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশনী করতে নিষেধ করেছেন তার বিরোধী। তাই তিনি মহিলাদেরকে খোশ্বু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার হুকুম দিয়েছেন। হযরত আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لَا تَمْنَعُوْا اَمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٍ

"আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। কিন্তু তারা যেন খোশ্বু লাগিয়ে না আসে।" (আবু দাউদ ও আহমাদ)

একই বক্তব্য সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, একটি মেয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। হযরত আবু হুরাইরা (রা) তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি অনুভব করলেন মেয়েটি খোশ্বু মেখেছে। তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দাসী! তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো?" সে বললো হাঁ। বললেন, "আমি আমার প্রিয় আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মেয়ে মসজিদে খোশ্বু মেখে আসে তার নামায ততক্ষণ কবুল হয় না যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে ফরয গোসলের মত গোসল করে।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, নাসাঈ)। আবু মূসা আশআরী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْاَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِىَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيْدًا –

“যে নারী আতর মেখে পথ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয়, সে এমন ও এমন। তিনি তার জন্য খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।” (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ) তাঁর নির্দেশ ছিল, মেয়েদের এমন খোশ্‌বু ব্যবহার করা উচিত, যার রং প্রগাঢ় কিন্তু সুবাস হাল্‌কা। (আবু দাউদ)।

অনুরূপভাবে নারীরা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের আওয়াজ পুরুষদেরকে শোনাবে এটাও তিনি অপছন্দ করতেন। প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি কুরআনেই দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেরাই লোকদেরকে দীনী মাসায়েল বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেখানে এর কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দীনী বা নৈতিক লাভও নেই সেখানে মহিলারা নিজেদের আওয়াজ ভিন্ পুরুষদেরকে শুনাবে, এটা পছন্দ করা হয়নি। কাজেই নামাযে যদি ইমাম ভুলে যান তাহলে পুরুষদের সুব্‌হানাল্লাহ বলার হুকুম দেয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে এক হাতের ওপর অন্য এক হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

৪৮. অর্থাৎ এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত যেসব ভুল–ভ্রান্তি তোমরা করেছো তা থেকে তাওবা করো এবং ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী নিজেদের কর্মপদ্ধতি সংশোধন করে নাও।

৪৯. প্রসংগত এ বিধানগুলো নাযিল হবার পর কুরআনের মর্মবাণী অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী সমাজে অন্য যেসব সংস্কারমূলক বিধানের প্রচলন করেন সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসারও এখানে বর্ণনা করা সংগত মনে করছি ঃ

এক ঃ মুহাররাম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি অন্য লোকদেরকে (আত্মীয় হলেও) কোন মেয়ের সাথে একাকী সাক্ষাত করতে ও তার কাছে নির্জনে বসতে নিষেধ করেছেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لاَ تَلْجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ

“যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না। কারণ শয়তান তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্ত ধারায় আবর্তন করছে।” (তিরমিযী)

হযরত জাবের থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا للّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَخْلُوَنْ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعْهَا
ذُوْ مُحْرِمٍ مِنْهَا فَاِنْ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ–

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মুহাররাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান।” (আহমাদ)

প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত তৃতীয় একটি হাদীস ইমাম আহমাদ আমের ইবনে রাবীআহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহর (সা) নিজের সতর্কতা এমন

পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, একবার রাতের বেলা তিনি হযরত সাফিয়ার সাথে তাঁর গৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দু'জন আনসারী তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে থামিয়ে বললেন, আমার সাথের এ মহিলা হচ্ছে আমার স্ত্রী সাফিয়া। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রসূল! আপনার সম্পর্কেও কি কোন কুধারণা হতে পারে? বললেন, শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে। আমার আশংকা হলো সে আবার তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি না করে বসে। (আবু দাউদ, সওম অধ্যায়)।

দুই ঃ কোন পুরুষের হাত কোন গায়ের মুহাররাম মেয়ের গায়ে লাগুক এটাও তিনি বৈধ করেননি। তাই তিনি পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাই'আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের আই'আত নেবার সময় কখনো এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন ভিন্ মেয়ের শরীরে লাগেনি। তিনি মেয়েদের থেকে শুধুমাত্র মৌখিক শপথ নিতেন এবং শপথ নেয়া শেষ হলে বলতেন, যাও তোমাদের বাই'আত হয়ে গেছে।" (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ)।

তিন ঃ তিনি মেয়েদের মুহাররাম ছাড়া একাকী অথবা গায়ের মুহাররামের সাথে সফর করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) খুতবায় বলেন ঃ

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مُحْرِمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مُحْرِمٍ-

"কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মুহাররাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না তার কোন মুহাররাম তার সাথে থাকে।"

এক ব্যক্তি উঠে বললো, আমার স্ত্রী হজ্জে যাচ্ছে এবং আমার নাম অমুক অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, فانطلق فحج مع امرأتك "বেশ, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে চলে যাও।" এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস ইবনে উমর, আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোতে শুধুমাত্র সফরের সময়সীমা অথবা সফরের দূরত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী মু'মিন মহিলার পক্ষে মুহাররাম ছাড়া সফর করা বৈধ নয়। এর মধ্যে কোন হাদীসে ১২ মাইল বা এর চেয়ে বেশী দূরত্বের সফরের ওপর বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। কোনটিতে একদিন, কোনটিতে এক দিন এক রাত, কোনটিতে দু'দিন আবার কোনটিতে তিন দিনের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভিন্নতা এ হাদীসগুলোর নির্ভরযোগ্যতা খতম করে দেয় না এবং এ কারণে এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীসকে অন্য সব হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এ হাদীসে বর্ণিত সীমারেখাকে আইনগত পরিমাপ গণ্য করার চেষ্টা করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য হয় না। কারণ এ বিভিন্নতার একটি যুক্তিসংগত কারণ বোধগম্য হতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময় ঘটনার যেমন যেমন অবস্থা রসূলের (সা) সামনে এসেছে সে অনুযায়ী তিনি তার হুকুম

বর্ণনা করেছেন। যেমন কোন মহিলা যাচ্ছেন তিন দিনের দূরত্বের সফরে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি মুহাররাম ছাড়া তাকে যেতে নিষেধ করেছেন। আবার কেউ এক দিনের দূরত্বের সফরে যাচ্ছেন এবং তিনি তাকেও থামিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিভিন্ন প্রশ্নকারীর বিভিন্ন অবস্থা এবং তাদের প্রত্যেককে তাঁর পৃথক পৃথক জবাব আসল জিনিস নয়। বরং আসল জিনিস হচ্ছে ওপরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি। অর্থাৎ সফর, সাধারণ পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয় কোন মেয়ের মুহাররাম ছাড়া এ ধরনের সফর করা উচিত নয়।

চার ঃ রসূলুল্লাহ (সা) মৌখিকভাবে এবং কার্যতও নারী ও পুরুষের মেলামেশা রোধ করার প্রচেষ্টা চালান। ইসলামী জীবনে জুম'আ ও জামা'আতের গুরুত্ব কোন ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির অজানা নয়। জুম্'আকে আল্লাহ নিজেই ফরয করেছেন। আর জামা'আতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্ব এ থেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই মসজিদে হাজির না হয়ে নিজ গৃহে নামায পড়ে নেয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি অনুযায়ী তার নামায গৃহীতই হয় না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারুকুত্‌নী ও হাকেম ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম্'আর নামায ফরয হওয়া থেকে মেয়েদেরকে বাদ রেখেছেন। (আবু দাউদ উম্মে আতীয়্যার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে দারুকুত্‌নী ও বাইহাকী জাবেরের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এবং আবু দাউদ ও হাকেম তারেক ইবনে শিহাবের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) আর জামা'আতের সাথে নামাযে শরীক হওয়াকে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক তো করেনইনি। বরং এর অনুমতি দিয়েছেন এভাবে যে, যদি তারা আসতে চায় তাহলে তাদেরকে বাধা দিয়ো না। তারপর এ সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ঘরের নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে ভালো। ইবনে উমর (রা) ও আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না।" (আবু দাউদ) অন্য রেওয়ায়াতগুলো বর্ণিত হয়েছে ইবনে উমর থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলী এবং এর সাথে সামঞ্জস্যশীল শব্দাবলী সহকারে ঃ

ائذنوا للنساء الى المساجد بالليل

"মহিলাদেরকে রাতের বেলা মসজিদে আসার অনুমতি দাও।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

অন্য একটি রেওয়ায়াতের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

لا تمنعوا نسائكُم المساجد وبيوتهن خير لهن

"তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না, তবে তাদের ঘর তাদের জন্য ভালো।" (আহমাদ, আবু দাউদ)

উম্মে হুমাইদ সায়েদীয়া বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার পেছনে নামায পড়তে আমার খুবই ইচ্ছা হয়। তিনি বললেন, "তোমার নিজের কামরায় নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চাইতে ভালো, তোমার নিজের ঘরে নামায পড়া নিজের মহল্লার মসজিদে

নামায পড়ার চাইতে ভালো এবং তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া জামে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে ভালো।" (আহমাদ ও তাবারানী) প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত উম্মে সালামার (রা) রেওয়ায়াতে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ خير مساجد النساء قعر بيوتهن "মহিলাদের জন্য তাদের ঘরের অভ্যন্তর ভাগ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মসজিদ।" (আহমদ, তাবারানী) কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) বনী উমাইয়া আমলের অবস্থা দেখে বলেন, "যদি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের আজকের অবস্থা দেখতেন তাহলে তাদের মসজিদে আসা ঠিক তেমনিভাবে বন্ধ করতেন যেমনভাবে বনী ইসরাঈলদের নারীদের আসা বন্ধ করা হয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) মসজিদে নববীতে নারীদের প্রবেশের জন্য নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দরজা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) নিজের শাসনামলে এ দরজা দিয়ে পুরুষদের যাওয়া আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। (আবু দাউদ ই'তিযালুন নিসা ফিল মাসাজিদ ও মা জাআ ফী খুরুজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ অধ্যায়) জামা'আতে মেয়েদের লাইন রাখা হতো পুরুষদের লাইনের পেছনে এবং নামায শেষে রসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফেরার পর কিছুক্ষণ বসে থাকতেন, যাতে পুরুষদের ওঠার আগে মেয়েরা উঠে চলে যেতে পারে। (আহমাদ, বুখারী উম্মে সালামার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পুরুষদের সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম লাইনটি এবং নিকৃষ্টতম লাইনটি হচ্ছে সবার পেছনের (অর্থাৎ মেয়েদের নিকটবর্তী) লাইনটি। আর মহিলাদের সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে সবচেয়ে পেছনের লাইন এবং নিকৃষ্টতম লাইন হচ্ছে সবার আগের (অর্থাৎ পুরুষদের নিকটবর্তী) লাইন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও আহমাদ) দুই ঈদের নামাযে মেয়েলোকেরা শরীক হতো কিন্তু তাদের জায়গা ছিল পুরুষদের থেকে দূরে। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার পরে মেয়েলোকদের দিকে গিয়ে তাদেরকে পৃথকভাবে সম্বোধন করতেন। (আবু দাউদ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনার মাধ্যমে বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাসের বর্ণনার মাধ্যমে) একবার মসজিদে নববীর বাইরে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, পথে নারী–পুরুষ এক সাথে মিশে গেছে। এ অবস্থা দেখে তিনি নারীদেরকে বললেন,

اِسْتَاْخِرْنَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْتَضِنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ –

"থেমে যাও, তোমাদের পথের মাঝখান দিয়ে চলা ঠিক নয়, কিনারা দিয়ে চলো।" এ কথা শুনতেই মহিলারা এক পাশে হয়ে গিয়ে একেবারে দেয়ালের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। (আবু দাউদ)

এসব নির্দেশ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, নারী–পুরুষের মিশ্র সমাবেশাদি ইসলামের প্রকৃতির সাথে কত বেশী বেখাপ্পা! যে দীন আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করার সময়ও উভয় গোষ্ঠীকে পরস্পর মিশ্রিত হতে দেয় না তার সম্পর্কে কে ধারণা করতে পারে যে, সে স্কুল–কলেজ, অফিস–আদালত, ক্লাব–রেস্তরাঁ ও সভা–সমিতিতে তাদের মিশ্রিত হওয়াকে বৈধ করে দেবে?

পাঁচ : নারীদেরকে ভারসাম্য সহকারে সাজসজ্জা করার তিনি কেবল অনুমতিই দেননি বরং অনেক সময় নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দিয়েছেন। সেকালে আরবের মহিলা সমাজে যে ধরনের সাজসজ্জার প্রচলন ছিল তার মধ্য থেকে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোকে তিনি অভিসম্পাতযোগ্য এবং মানব জাতির ধ্বংসের কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন :

- নিজের চুলের সাথে পরচুলা লাগিয়ে তাকে বেশী লম্বা ও ঘন দেখাবার চেষ্টা করা।
- শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উল্‌কি আঁকা ও কৃত্রিম তিল বসানো।
- ভূর চুল উপড়ে ফেলে বিশেষ আকৃতির ভ্রূ নির্মাণ করা এবং লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখ পরিষ্কার করা।
- দাঁত ঘসে ঘসে সুঁচালো ও পাত্‌লা করা অথবা দাঁতের মাঝখানে কৃত্রিম ছিদ্র তৈরী করা।
- জাফরান ইত্যাদি প্রসাধনীর মাধ্যমে চেহারায় কৃত্রিম রং তৈরী করা।

এসব বিধান সিহাহে সিত্তা ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আমীর মুআবীয়া (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় উদ্ধৃত হয়েছে।

আল্লাহ ও রসূলের এসব পরিষ্কার নির্দেশ দেখার পর একজন মু'মিনের জন্য দু'টোই পথ খোলা থাকে। এক, সে এর অনুসরণ করবে এবং নিজের ও নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে এমনসব নৈতিক অনাচার থেকে পবিত্র করবে, যেগুলোর পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ কুরআনে এবং তাঁর রসূল সুন্নাতে এমন বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন। দুই, যদি সে নিজের মানসিক দুর্বলতার কারণে এগুলোর বা এগুলোর মধ্য থেকে কোনটির বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে কমপক্ষে গোনাহ মনে করে করবে ও তাকে গোনাহ বলে স্বীকার করে নেবে এবং অনর্থক অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে গোনাহকে সওয়াবে পরিণত করার চেষ্টা করবে না। এ দু'টি পথ পরিহার করে যারা কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে কেবল পাশ্চাত্য সমাজের পদ্ধতি অবলম্বন করেই ক্ষান্ত থাকে না বরং এরপর সেগুলোকেই যথার্থ ইসলাম প্রমাণ করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দেয় এবং ইসলামে আদৌ পরদার কোন বিধান নেই বলে প্রকাশ্যে দাবী করতে থাকে তারা গোনাহ ও নাফরমানীর সাথে সাথে মূর্খতা ও মুনাফিকসুলভ ধৃষ্টতাও দেখিয়ে থাকে। দুনিয়ায় কোন ভদ্র ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি এর প্রশংসা করতে পারে না এবং আখেরাতে আল্লাহর কাছ থেকেও এর আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের চাইতেও দু'কদম এগিয়ে আছে এমন সব লোক যারা আল্লাহ ও রসূলের এসব বিধানকে ভুল প্রতিপন্ন করে এবং এমন সব পদ্ধতিকে সঠিক ও সত্য মনে করে যা তারা অমুসলিম জাতিসমূহের কাছ থেকে শিখেছে। এরা আসলে মুসলমান নয়। কারণ এরপরও যদি তারা মুসলমান থাকে তাহলে ইসলাম ও কুফর শব্দ দু'টি একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। যদি তারা নিজেদের নাম বদলে নিতো এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যেতো, তাহলে আমরা কমপক্ষে তাদের নৈতিক সাহসের স্বীকৃতি দিতাম। কিন্তু তাদের

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

তোমাদের মধ্যে যারা একা ও নিসংগ[৫০] *এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের মধ্যে যারা সৎ*[৫১] *ও বিয়ের যোগ্য তাদের বিয়ে দাও।*[৫২] *যদি তারা গরীব হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ আপন মেহেরবানীতে তাদেরকে ধনী করে দেবেন,*[৫৩] *আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।*

অবস্থা হচ্ছে, এ ধরনের চিন্তা পোষণ করেও তারা মুসলমান সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের চেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের মানুষ সম্ভবত দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ ধরনের চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী লোকদের থেকে যে কোন প্রকার জালিয়াতী, প্রতারণা, দাগাবাজী, আত্মসাত ও বিশ্বাসঘাতকতা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

৫০. মূলে ايامى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একে সাধারণত লোকেরা নিছক বিধবা শব্দের অর্থে গ্রহণ করে থাকে। অথচ আসলে এ শব্দটি এমন সকল পুরুষ ও নারীর জন্য ব্যবহৃত হয় যারা স্ত্রী বা স্বামীহীন। ايامى শব্দটি أَيِّم এর বহুবচন। আর أَيِّم এমন প্রত্যেক পুরুষকে বলা হয় যার কোন স্ত্রী নেই এবং এমন প্রত্যেক নারীকে বলা হয় যার কোন স্বামী নেই। তাই আমি এর অনুবাদ করেছি "একা" ও নিসংগ।"

৫১. অর্থাৎ তোমাদের প্রতি যাদের মনোভাব ও আচরণ ভালো এবং যাদের মধ্যে তোমরা দাম্পত্য জীবন যাপনের যোগ্যতাও দেখতে পাও। যে গোলাম ও বাঁদীর আচরণ মালিকের সাথে সঠিক নয় এবং যার মেজায দেখে বিয়ের পরে জীবন সংগীর সাথে তার বনিবনা হবে বলে আশাও করা যায় না তাকে বিবাহ দেবার দায়িত্ব মালিকের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। কারণ এ অবস্থায় সে অন্য এক ব্যক্তির জীবন নষ্ট করে দেবার জন্য দায়ী হবে। এ শর্তটি স্বাধীন লোকদের ব্যাপারে আরোপ করা হয়নি। কারণ স্বাধীন ব্যক্তির বিয়েতে অংশগ্রহণকারীর দায়িত্ব আসলে একজন পরামর্শদাতা, সহযোগী ও পরিচিত করাবার মাধ্যমের বেশী কিছু হয় না। বিবাহকারী ও বিবাহকারিনীর সম্মতির মাধ্যমে আসল দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু গোলাম ও বাঁদীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলার পূর্ণ দায়িত্ব হয় মালিকের। সে যদি জেনে বুঝে কোন হতভাগিনীকে একজন বদস্বভাব ও বদচরিত্রসম্পন্ন লোকের হাতে তুলে দেয় তাহলে এর সমস্ত দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে।

৫২. বাহ্যত এখানে আদেশমূলক ক্রিয়াপদ দেখে একদল আলেম মনে করেছেন, এ কাজটি করা ওয়াজিব। অথচ বিষয়টির ধরন নিজেই বলছে, এ আদেশটি ওয়াজিব অর্থে হতে পারে না। একথা সুস্পষ্ট, কোন ব্যক্তির বিয়ে করানো অন্যদের ওপর ওয়াজিব হতে পারে না। কার সাথে কার বিয়ে করানো ওয়াজিব? ধরা যাক, যদি ওয়াজিব হয়ও তাহলে যার বিয়ে হতে হবে তার অবস্থা কি? অন্য লোকেরা যার সাথেই তার বিয়ে দিতে চায় তার সাথে বিয়ে কি তার মেনে নেয়া উচিত? এটি যদি তার ওপর ফরয হয়ে থাকে তাহলে

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اٰتٰىكُمْ ۗ

আর যারা বিয়ে করার সুযোগ পায় না তাদের পবিত্রতা ও সাধুতা অবলম্বন করা উচিত, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।[৫৪]

আর তোমাদের মালিকানাধীনদের মধ্য থেকে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদন করে[৫৫] তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও[৫৬] যদি তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও।[৫৭] আর আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দাও।[৫৮]

বুঝতে হবে তার বিয়ে তার নিজের আয়ত্বে নেই। আর যদি তার অস্বীকার করার অধিকার থাকে তাহলে যাদের ওপর এ কাজ ওয়াজিব তারা কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে? এসব দিক ভালোভাবে বিবেচনা করে অধিকাংশ ফকীহ এ রায় দিয়েছেন যে, আল্লাহর এ উক্তি এ কাজটিকে ওয়াজিব নয় বরং "মান্‌দুব" বা পছন্দনীয় গণ্য করে। অর্থাৎ এর মানে হবে, মুসলমানদের সাধারণভাবে চিন্তা হওয়া উচিত তাদের সমাজে যেন লোকেরা অবিবাহিত অবস্থায় না থাকে। পরিবারের সাথে জড়িত লোকেরা, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী সবাই এ ব্যাপারে আগ্রহ নেবে এবং যার কেউ নেই তার এ কাজে সাহায্য করবে রাষ্ট্র।

৫৩. এর অর্থ এ নয় যে, যারই বিয়ে হবে আল্লাহ তাকেই ধনাঢ্য করে দেবেন। বরং এখানে বক্তব্য হচ্ছে, লোকেরা যেন এ ব্যাপারে খুব বেশী হিসেবী না বনে যায়। এর মধ্যে মেয়ে পক্ষের জন্যও নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে, সৎ ও ভদ্র রুচিশীল ব্যক্তি যদি তাদের কাছে পয়গাম পাঠায়, তাহলে নিছক তার দারিদ্র দেখেই যেন তা প্রত্যাখ্যান না করা হয়। ছেলে পক্ষকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোন যুবককে নিছক এখনো খুব বেশী আয়-রোজগার করছে না বলে যেন আইবুড়ো করে না রাখা হয়। আর যুবকদেরকেও উপদেশ দেয়া হচ্ছে, বেশী সচ্ছলতার অপেক্ষায় বসে থেকে নিজেদের বিয়ের ব্যাপারকে অযথা পিছিয়ে দিয়ো না। সামান্য আয় রোজগার হলেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিয়ে করে নেয়া উচিত। অনেক সময় বিয়ে নিজেই মানুষের আর্থিক সচ্ছলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীর সহায়তায় খরচপাতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। দায়িত্ব মাথার ওপর এসে পড়ার পর মানুষ নিজেও আগের চাইতেও বেশী পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অর্থকরী কাজে স্ত্রী সাহায্য করতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ভবিষ্যতে কার জন্য কি লেখা আছে তা কেউ জানতে পারে না। ভালো অবস্থা খারাপ অবস্থায়ও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং খারাপ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে ভালো অবস্থায়। কাজেই মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসেবী হওয়া উচিত নয়।

৫৪. এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোই এ আয়াতগুলোর সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে বিয়ে করতে পারে তার বিয়ে করে নেয়া উচিত। কারণ এটি হচ্ছে চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার এবং মানুষের সততা ও সতিত্ব রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। আর যার বিয়ে করার ক্ষমতা নেই তার রোযা রাখা উচিত। কারণ রোযা মানুষের দেহের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ النَّاكِحُ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। এক ব্যক্তি হচ্ছে, যে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, মুক্তিলাভের জন্য যে গোলাম লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তার মুক্তিপণ দেয়ার নিয়ত রাখে। আর তৃতীয় ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়।" (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ। এছাড়া আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, ২৫ আয়াত।)

৫৫. মূল শব্দ হচ্ছে مُكَاتَبَتْ এর শাব্দিক অর্থ লিপিবদ্ধ। কিন্তু পারিভাষিক দিক দিয়ে এ শব্দটি তখন বলা হয় যখন কোন গোলাম বা বাঁদী নিজের মুক্তির জন্য নিজের প্রভুকে একটি মূল্য দেবার প্রস্তাব দেয় এবং প্রভু সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয় তখন উভয়ের মধ্যে এর শর্তাবলী লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ইসলামে গোলামদের মুক্ত করার জন্য যেসব পথ তৈরী করা হয়েছে এটি তার অন্যতম। এ মূল্য অর্থ বা সম্পদের আকারে দেয়া অপরিহার্য নয়। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রভুর জন্য কোন বিশেষ কাজ করে দেয়াও মূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। চুক্তি হয়ে যাবার পর কর্মচারীর স্বাধীনতায় অনর্থক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অধিকার প্রভুর থাকে না। মূল্য বাবদ দেয় অর্থ সংগ্রহের জন্য সে তাকে কাজ করার সুযোগ দেবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গোলাম যখনই তার দেয় অর্থ বা তার ওপর আরোপিত কাজ সম্পন্ন করে দেবে তখনই সে তাকে মুক্ত করে দেবে। হযরত উমরের আমলের ঘটনা। একটি গোলাম তার কর্ত্রীর সাথে নিজের মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চুক্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে তার কাছে নিয়ে যায়। কর্ত্রী বলে, আমিতো সমুদয় অর্থ এক সাথে নেবো না। বরং বছরে বছরে মাসে মাসে বিভিন্ন কিস্তিতে নেবো। গোলাম হযরত উমরের (রা) কাছে অভিযোগ করে। তিনি বলেন, এ অর্থ বায়তুল মালে দাখিল করে দাও এবং চলে যাও তুমি স্বাধীন। তারপর কর্ত্রীকে বলে পাঠান, তোমার অর্থ এখানে জমা হয়ে গেছে, এখন তুমি চাইলে এক

সাথেই নিয়ে নিতে পারো অথবা আমরা বছরে বছরে মাসে মাসে তোমাকে দিতে থাকবো। (দারুকুত্‌নী, আবু সাঈদ মুকবেরীর রেওয়ায়াতের মাধ্যমে)।

৫৬. একদল ফকীহ এ আয়াতের এ অর্থ নিয়েছেন যে, যখন কোন বাঁদী বা গোলাম মূল্য দানের বিনিময়ে মুক্তিলাভের লিখিত চুক্তি করার আবেদন জানায় তখন তা গ্রহণ করা প্রভুর জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। এটি আতা, আমর ইবনে দীনার, ইবনে সীরীন, মাসরূক, দ্বাহ্হাক, 'ইক্‌রামাহ, যাহেরীয়্যা ও ইবনে জারীর তাবারীর অভিমত। ইমাম শাফে'ঈও প্রথমে এরই প্রবক্তা ছিলেন। দ্বিতীয় দলটি বলেন, এটি ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব ও মান্‌দুব তথা পছন্দনীয়। এ দলে শা'বী, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, হাসান বাস্‌রী, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ, সুফিয়ান সওরী, আবু হানীফা, মালেক ইবনে আনাসের মতো মনীষীগণ আছেন। শেষের দিকে ইমাম শাফে'ঈও এ মতের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম দলটির মতের সমর্থন করতো দু'টো জিনিস। এক, আয়াতের শব্দ كَاتِبُوهُمْ "তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করো।" এ শব্দাবলী পরিষ্কার প্রকাশ করে যে, এটি আল্লাহর হুকুম। দুই, নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ হয়, প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের পিতা সীরীন যখন তাঁর প্রভু হযরত আনাসের (রা) কাছে মূল্যের বিনিময়ে গোলামী মুক্ত হবার লিখিত চুক্তি করার আবেদন জানায় এবং তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তখন সীরীন হযরত উমরের (রা) কাছে নালিশ করে। তিনি ঘটনা শুনে দোর্‌রা নিয়ে হযরত আনাসের (রা) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বলেন, আল্লাহর হুকুম হচ্ছে, "গোলামী মুক্তির লিখিত চুক্তি করো।" (বুখারী) এ ঘটনা থেকে যুক্তি পেশ করা হয় ঃ এটি হযরত উমরের ব্যক্তিগত কাজ নয় বরং সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে তিনি এ কাজ করেছিলেন এবং কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাননি, কাজেই এটি এ আয়াতের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় দলটির যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহ শুধুমাত্র كَاتِبُوهُمْ বলেননি, বলেন فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا "তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করো যদি তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও।" এ কল্যাণের সন্ধান পাওয়াটা এমন একটি শর্ত নির্ভর করে এক মাত্র মালিকের রায়ের ওপর। এর এমন কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই যার ভিত্তিতে কোন আদালত এটা যাচাই–পর্যালোচনা করতে পারে। আইনগত বিধানের রীতি এ নয়। তাই এ হুকুমটিকে উপদেশের অর্থেই গ্রহণ করা হবে, আইনগত হুকুমের অর্থে নয়। আর সীরীনের যে নজির পেশ করা হয়েছে তার জবাব তারা এভাবে দেন ঃ সেকালে তো আর লিখিত চুক্তির আবেদনকারী গোলাম একজন ছিল না। নবীর যুগে ও খেলাফতে রাশেদার আমলে হাজার হাজার গোলাম ছিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র সীরীনের ঘটনাটি ছাড়া কোন প্রভুকে আদালতের হুকুমের মাধ্যমে গোলামী মুক্তির লিখিত চুক্তি করতে বাধ্য করার আর একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কাজেই হযরত উমরের এ কাজটিকে আদালতের ফায়সালা মনে করার পরিবর্তে আমরা একে এ অর্থে গ্রহণ করতে পারি যে, তিনি মুসলমানদের মাঝখানে কেবল কাযীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না বরং ব্যক্তি ও সমাজের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল পিতা ও সন্তানের মতো। অনেক সময় তিনি এমন অনেক বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতেন যাতে একজন পিতাতো হস্তক্ষেপ করতে পারেন কিন্তু একজন বিচারক পারেন না।

৫৭. কল্যাণ বলতে তিনটি জিনিস বুঝানো হয়েছে ঃ

এক ঃ চুক্তিবদ্ধ অর্থ আদায় করার ক্ষমতা গোলামের আছে। অর্থাৎ সে উপার্জন বা পরিশ্রম করে নিজের মুক্তি লাভের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করতে পারে। যেমন একটি মুরসাল হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

ان علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس

"যদি তোমরা জানো তারা উপার্জন করতে পারে তাহলে লিখিত চুক্তি করে নাও। তাদেরকে যেন লোকদের কাছে ভিক্ষা করতে ছেড়ে দিয়ো না।" (ইবনে কাসীর, আবু দাউদের বরাত দিয়ে)

দুই ঃ তার কথায় বিশ্বাস করে তার সাথে চুক্তি করা যায়, এতটুকু সততা ও বিশ্বস্ততা তার মধ্যে আছে। এমন যেন না হয় যে, লিখিত চুক্তি করার পর সে মালিকের খিদমত করা থেকে ছুটিও পেয়ে গেলো। আবার এ সময়ের মধ্যে যা কিছু আয়-রোজগার করে তাও খেয়ে পরে শেষ করে ফেললো।

তিন ঃ মালিক তার মধ্যে এমন কোন খারাপ নৈতিক প্রবণতা অথবা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার এমন কোন তিক্ত আবেগ-অনুভূতি পাবে না যার ভিত্তিতে এ আশংকা হয় যে, তার স্বাধীনতা মুসলিম সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হবে। অন্য কথায় তার ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, সে মুসলিম দেশের ও সমাজের একজন ভালো ও স্বাধীন নাগরিক হতে পারবে, কোন বিশ্বাসঘাতক ও ঘরের শত্রু আস্তিনের সাঁপে পরিণত হবে না। এ প্রসংগে একথা সামনে রাখতে হবে যে, বিষয়টি ছিল যুদ্ধবন্দী সংক্রান্তও এবং তাদের সম্পর্কে অবশ্যি এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল।

৫৮. এটি একটি সাধারণ হুকুম। প্রভু, সাধারণ মুসলমান এবং ইসলামী হুকুমাত সবাইকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রভুদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদনকারীদের দেয় অর্থ থেকে কিছু না কিছু মাফ করে দাও। কাজেই বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ হয় সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের চুক্তিবদ্ধ গোলামদের দেয় অর্থ থেকে বেশ একটা বড় পরিমাণ অর্থ মাফ করে দিতেন। এমন কি হযরত আলী (রা) হামেশা এক-চতুর্থাংশ মাফ করেছেন এবং এরি উপদেশ দিয়েছেন। (ইবনে জারীর)

সাধারণ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে কোন লিখিত চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার দেয় অর্থ আদায় করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানাবে, তাদেরকে যেন প্রাণ খুলে সাহায্য করে। কুরআন মজীদে যাকাতের যে ব্যয় ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে فى الرقاب তার মধ্যে একটি। অর্থাৎ "দাসত্বের জোয়াল থেকে গর্দানমুক্ত করা।" (সূরা তওবা, ৬০ আয়াত) আর আল্লাহর নিকট فك رقبة "গর্দানের বাঁধন খোলা" একটি বড় নেকীর কাজ। (সূরা বালাদ, ১৩ আয়াত) হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এক গ্রামীন ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমাকে এমন কাজ বলুন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তুমি অতি সংক্ষেপে অনেক বড় কথা জিজ্ঞেস

করেছো। গোলামকে মুক্ত করে দাও, গোলামদের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করো, কাউকে পশু দান করলে অত্যধিক দুধেল পশু দান করো এবং তোমার যে আত্মীয় তোমার প্রতি জুলুম করে তুমি তার সাথে সৎ ব্যবহার করো আর যদি তা না করতে পারো, তাহলে অভুক্তকে আহার করাও, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, মানুষকে ভালো কাজ করার উপদেশ দাও এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করো। আর যদি এগুও না করতে পারো, তাহলে নিজের মুখ বন্ধ করে রাখো। মুখ খুললে ভালোর জন্য খুলবে আর নয়তো বন্ধ করে রাখবে।" (বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান, আনিল বারাআ ইবনে আযিব।)

ইসলামী রাষ্ট্রকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বায়তুল মালে যে যাকাত জমা হয় তা থেকে লিখিত চুক্তিবদ্ধ গোলামদের মুক্তির জন্য একটি অংশ ব্যয় করো।

এ প্রসংগে উল্লেখ্য, প্রাচীন যুগে তিন ধরনের গোলাম হতো। এক, যুদ্ধবন্দী। দুই, স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে গোলাম বানানো হতো এবং তারপর তাকে বিক্রি করা হতো তিন, যারা বংশানুক্রমিকভাবে গোলাম হয়ে আসছিল, তাদের বাপ-দাদাকে কবে গোলাম বানানো হয়েছিল এবং ওপরে উল্লেখিত দু' ধরনের গোলামের মধ্যে তারা ছিল কোন্‌ ধরনের তা জানার কোন উপায় ছিল না। ইসলামের আগমনের সময় আরব ও আরবের বাইরের জগতের মানব সমাজ এ ধরনের গোলামে পরিপূর্ণ ছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা শ্রমিক ও চাকর বাকরদের চাইতে এ ধরনের গোলামদের ওপর বেশী নির্ভরশীল ছিল। ইসলামের সামনে প্রথম প্রশ্ন ছিল, পূর্ব থেকে এই যে গোলামদের ধারা চলে আসছে এদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আগামীর জন্য গোলামী সমস্যার কি সমাধান দেয়া যায়? প্রথম প্রশ্নের জবাবে ইসলাম কোন আকস্মিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্রাচীনকাল থেকে গোলামদের যে বংশানুক্রমিক ধারা চলে আসছিল হঠাৎ তাদের সবার ওপর থেকে মালিকানা অধিকার খতম করে দেয়নি। কারণ এর ফলে শুধু যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো তাই নয় বরং আরবকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের চাইতেও অনেক বেশী কঠিন ও ধ্বংসকর গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হতো। এরপরও মূল সমস্যার কোন সমাধান হতো না, যেমন আমেরিকায় হয়নি এবং কালোদের (Negroes) লাঞ্ছনার সমস্যা সেখানে রয়েই গেছে। এ নির্বোধ সুলভ ও অবিবেচনা-প্রসূত সংস্কারের পথ পরিহার করে ইসলাম فَكُّ رَقَبَةٍ তথা দাসমুক্তির একটি শক্তিশালী নৈতিক আন্দোলন শুরু করে এবং উপদেশ, উৎসাহ-উদ্দীপনা, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও দেশজ আইন-কানুনের মাধ্যমে লোকদেরকে গোলাম আজাদ করতে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে আখেরাতে নাজাত লাভ করার জন্য স্বেচ্ছায় গোলাম আজাদ করার অথবা নিজের গোনাহের কাফ্‌ফারা দেবার জন্য গোলামদেরকে মুক্তি দানের কিংবা অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। এ আন্দোলনের আওতাধীনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ৬৩ জন গোলামকে মুক্ত করে দেন। তার স্ত্রীগণের মধ্য থেকে একমাত্র হযরত আয়েশারই (রা) আজাদকৃত গোলামদের সংখ্যা ছিল ৬৭। রসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত আব্বাস (রা) নিজের জীবনে ৭০ জন গোলামকে স্বাধীন করে দেন। হাকিম ইবনে হিযাম ১০০, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ১০০০, যুল কিলাহ হিম্‌ইয়ারী ৮ হাজার এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ ৩০ হাজার গোলামকে আজাদ করে দেন। এমনি ধরনের ঘটনা অন্যান্য সাহাবীদের জীবনেও ঘটেছে। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর

আর তোমাদের বাঁদীরা যখন নিজেরাই সতী সাধ্বী থাকতে চায় তখন দুনিয়াবী স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করো না।[৫৯] *আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে এ জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*

আমি দ্ব্যর্থহীন পথনির্দেশক আয়াত তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিদের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তও তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশও দিয়েছি।[৬০]

(রা) ও হযরত উমরের (রা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি–লাভের একটি সাধারণ প্রেরণা। এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকেরা ব্যাপকভাবে নিজেদের গোলামদেরকেও মুক্ত করে দিতেন এবং অন্যদের গোলাম কিনে নিয়েও তাদেরকে আজাদ করে দিতে থাকতেন। এভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার আগেই পূর্ব যুগের প্রায় সমস্ত গোলামই মুক্তিলাভ করেছিল।

এখন প্রশ্ন হলো ভবিষ্যতে কি হবে। এ ব্যাপারে ইসলাম কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গোলাম বানানো এবং তার কেনা বেচা করার ধারাকে পুরোপুরি হারাম ও আইনগতভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। তবে যুদ্ধবন্দীদেরকে শুধুমাত্র এমন অবস্থায় গোলাম বানিয়ে রাখার অনুমতি (আদেশ নয় বরং অনুমতি) দেয় যখন তাদের সরকার আমাদের যুদ্ধবন্দীদের সাথে তাদের যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় করতে রাজী হয় না এবং তারা নিজেরাও নিজেদের মুক্তিপণ আদায় করে না। তারপর এ গোলামদের জন্য একদিকে তাদের মালিকদের সাথে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভ করার পথ খোলা রাখা হয় এবং অন্যদিকে প্রাচীন গোলামদের ব্যাপারে যেসব নির্দেশ ছিল তা সবই তাদের পক্ষে বহাল থাকে, যেমন নেকীর কাজ মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া অথবা গোনাহর কাফ্ফারা আদায় করার জন্য তাদেরকে আজাদ করা কিংবা কোন ব্যক্তির নিজের জীবদ্দশায় গোলামকে গোলাম হিসেবে রাখা এবং পরবর্তীকালের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া যে, তার মৃত্যুর পরই সে আজাদ হয়ে যাবে (ইসলামী ফিকাহর পরিভাষায় একে বলা হয় তাদবীর এবং এ ধরনের গোলামকে "মুদাব্বার" বলা হয়)। অথবা কোন ব্যক্তি নিজের বাঁদীর সাথে সংগম করা এবং তার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করা,

এ অবস্থায় মালিক অসিয়ত করুক বা না করুক মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথেই সে নিজে নিজেই স্বাধীন হয়ে যাবে। ইসলাম গোলামী সমস্যার এ সমাধান দিয়েছে। অজ্ঞ আপত্তিকারীরা এগুলো না বুঝে আপত্তি করে বসেন। পক্ষান্তরে ওজর পেশকারীগণ ওজর পেশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত এ বাস্তব সত্যটাকেই অস্বীকার করে বসেন যে, ইসলাম গোলামীকে কোন না কোন আকারে টিকিয়ে রেখেছিল। (তা যে কারণেই হোক না কেন।)

৫৯. এর অর্থ এ নয় যে, বাঁদীরা নিজেরা যদি সতীসাধ্বী না থাকতে চায়, তাহলে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, বাঁদী যদি স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে নিজের অপরাধের জন্য সে নিজেই দায়ী, তার অপরাধের জন্য আইন তাকেই পাকড়াও করবে। কিন্তু যদি তার মালিক জোর করে তাকে এ পেশায় নিয়োগ করে, তাহলে এ জন্য মালিক দায়ী হবে এবং সে পাকড়াও হবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, জোর করার প্রশ্ন তখনই দেখা দেয় যখন কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আর "দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে" বাক্যাংশটি দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়নি যে, যদি মালিক তার উপার্জন না খায় তাহলে বাঁদীকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করার কারণে সে অপরাধী হবে না বরং বুঝানো হয়েছে যে, এ অবৈধ বল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত উপার্জনও হারামের শামিল।

কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞাটির পূর্ণ উদ্দেশ্য নিছক এর শব্দাবলী ও পূর্বাপর আলোচনা থেকে বুঝা যেতে পারে না। একে ভালোভাবে বুঝতে হলে যে পরিস্থিতিতে এ হুকুমটি নাযিল হয় সেগুলোও সামনে রাখা জরুরী। সেকালে আরব দেশে দু'ধরনের পতিতাবৃত্তির প্রচলন ছিল। এক, ঘরোয়া পরিবেশে গোপন বেশ্যাবৃত্তি এবং দুই, যথারীতি বেশ্যাপাড়ায় বসে বেশ্যাবৃত্তি।

ঘরোয়া বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত থাকতো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঁদীরা, যাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিল না। অথবা এমন ধরনের স্বাধীন মেয়েরা, কোন পরিবার বা গোত্র যাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল না। তারা কোন গৃহে অবস্থান করতো এবং একই সংগে কয়েকজন পুরুষের সাথে তাদের এ মর্মে চুক্তি হয়ে যেতো যে, তারা তাকে সাহায্য করবে ও তার ব্যয়ভার বহন করবে এবং এর বিনিময়ে পুরুষরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবে। সন্তান জন্ম নিলে মেয়েরা যে পুরুষ সম্পর্কে বলে দিতো যে, এ সন্তান অমুকের। সে–ই সন্তানের পিতা হিসেবে স্বীকৃত হতো। এটি যেন ছিল জাহেলী সমাজের একটি স্বীকৃত প্রথা। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা একে এক ধরনের 'বিয়ে' মনে করতো। ইসলাম এসে বিয়ের জন্য 'এক মেয়ের এক স্বামী' এ একমাত্র পদ্ধতিকেই চালু করলো। এ ছাড়া বাদবাকি সমস্ত পদ্ধতি আপনা আপনিই যিনা হিসেবে গণ্য হয়ে অপরাধে পরিণত হয়ে গেলো: (আবু দাউদ, বাবুন ফী অজুহিন নিকাহ আল্লাতী কানা ইয়াতানাকিহু আহলুল জাহেলিয়াহ)।

দ্বিতীয় অবস্থাটি অর্থাৎ প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হতো বাঁদীদেরকেই। এর দু'টি পদ্ধতি ছিল। প্রথমত লোকেরা নিজেদের যুবতী বাঁদীদের ওপর একটি নির্দিষ্ট অংক চাপিয়ে দিতো। অর্থাৎ প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তাদেরকে দিতে হবে। ফলে তারা দেহ বিক্রয় করে তাদের এ দাবী পূর্ণ করতো। এ ছাড়া অন্য কোন

পথে তারা এ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতেও পারতো না। আর তারা কোন পবিত্র উপায়ে এ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে এনেছে বলে তাদের মালিকরাও মনে করতো না। যুবতী বাঁদীদের ওপর সাধারণ মজুরদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী রোজগার করার বোঝা চাপিয়ে দেবার এ ছাড়া আর কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল, লোকেরা নিজেদের সুন্দরী যুবতী বাঁদীদেরকে আলাদা ঘরে বসিয়ে রাখতো এবং তাদের দরজায় ঝাণ্ডা গেড়ে দিতো। এ চিহ্ন দেখে দূর থেকেই "ক্ষুধার্তরা" বুঝতে পারতো কোথায় তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে হবে। এ মেয়েদেরকে বলা হতো "কালীকীয়াত" এবং এদের গৃহগুলো "মাওয়াখীর" নামে পরিচিত ছিল। বড় বড় গণ্যমান্য সমাজপতিরা এ ধরনের বেশ্যালয় পরিচালনা করতো। স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক প্রধান, যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল এবং যে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর কাজে সবার আগে ছিল) মদীনায় এ ধরনের একটি বেশ্যালয়ের মালিক ছিল। সেখানে ছিল ছয়জন সুন্দরী বাঁদী। তাদের মাধ্যমে সে কেবলমাত্র অর্থই উপার্জন করতো না বরং আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নামী দামী মেহমানদের আদর আপ্যায়নও তাদের দিয়েই করাতো। তাদের অবৈধ সন্তানদের সাহায্যে সে নিজের পাইক, বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালের সংখ্যা বাড়াতো। এ বাঁদীদেরই একজনের নাম ছিল মু'আযাহ। সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং এ পেশা থেকে তাওবা করতে চাচ্ছিল। ইবনে উবাই তার ওপর জোর জবরদস্তি করলো। সে গিয়ে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে নালিশ করলো। তিনি ব্যাপারটি রসূলের (সা) কাছে পৌঁছে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) জালেমের কব্জা থেকে বাঁদীটিকে বের করে আনার হুকুম দিলেন। (ইবনে জারীর, ১৮ খণ্ড, ৫৫–৫৮ এবং ১০৩–১০৪ পৃষ্ঠা, আল ইস্তি'আব লি ইবনি আবদিল বার, ২ খণ্ড, ৭৬২ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩ খণ্ড, ২৮৮–২৮৯ পৃষ্ঠা)। এ সময়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আয়াত নাযিল হয়। এ পটভূমি দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে পরিষ্কার জানা যাবে, শুধুমাত্র বাঁদীদেরকে যিনার অপরাধে জড়িত হতে বাধ্য করার পথে বাধা সৃষ্টি করাই নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বেশ্যাবৃত্তির (Prostitution) ব্যবসায়কে সম্পূর্ণরূপে আইন বিরোধী গণ্য করা এবং এই সংগে যেসব মেয়েকে জোর জবরদস্তি এ ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয় তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণাও এখানে এর মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ফরমান এসে যাবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন لا مساعاة فى الاسلام "ইসলামে বেশ্যাবৃত্তির কোন অবকাশই নেই।" (আবু দাউদ, ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে, বাবুন ফী ইদ্দিআয়ে ওয়ালাদিয যিনা) দ্বিতীয় যে হুকুমটি তিনি দেন সেটি ছিল এই যে, যিনার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ হারাম, নাপাক ও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রাফে' ইবন খাদীজের রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (সা) مهر البغى অর্থাৎ যিনার বিনিময়ে অর্জিত অর্থকে নষ্ট, সর্বাধিক অকল্যাণমূলক উপার্জন, অপবিত্র ও নিকৃষ্টতম আয় গণ্য করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ) আবু হুজাইফা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) كسب البغى অর্থাৎ দেহ বিক্রয়লব্ধ অর্থকে হারাম গণ্য করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, আহ্‌মাদ) আবু মাস'উদ উকবাহ ইবনে আমরের রেওয়ায়াত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা) مهر البغى তথা যিনার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থের লেনদেনকে নিষিদ্ধ গণ্য করেছেন। (সিহাহে সিত্তা ও আহমদ) তৃতীয় যে হুকুমটি তিনি দিয়েছিলেন তা

ছিল এই যে, বাঁদীর কাছ থেকে বৈধ পন্থায় কেবলমাত্র হাত ও পায়ের শ্রম গ্রহণ করা যেতে পারে এবং মনিব তার ওপর এমন পরিমাণ কোন অর্থ চাপিয়ে দিতে বা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারে না যে সম্পর্কে সে জানে না এ অর্থ সে কোথা থেকে ও কিভাবে উপার্জন করে। রাফে' ইবনে খাদীজ বলেন ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ حَتّٰى يَعْلَمَ مِنْ اَيْنَ هُوَ –

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁদীর মাধ্যমে কোন উপার্জন নিষিদ্ধ গণ্য করেন যতক্ষণ না একথা জানা যায় যে, এ অর্থ কোথা থেকে অর্জিত হয়।" (আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারাহ)

রাফে' ইবনে রিফা'আহ আনসারীর বর্ণনায় এর চাইতেও সুস্পষ্ট হুকুম পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

نَهَانَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ اِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هٰكَذَا بِاَصَابِعِهِ نَحْوَا الْخُبْزِى وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ –

"আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁদীর সাহায্যে অর্থোপর্জন করতে আমাদের নিষেধ করেছেন, তবে হাতের সাহায্যে পরিশ্রম করে সে যা কিছু কামাই করে তা ছাড়া। এবং তিনি হাতের ইশারা করে দেখান যেমন এভাবে রুটি তৈরি করা, সূতা কাটা বা উল ও তুলা ধোনা।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারাহ)

একই বক্তব্য সম্বলিত একটি হাদীস আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে كسب الاماء (বাঁদীর কামাই) ও مهر البغى (ব্যভিচারের উপার্জন) গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেকালে আরবে প্রচলিত বেশ্যাবৃত্তির সকল পদ্ধতিকে ধর্মীয় দিক দিয়ে অবৈধ ও আইনগত দিক দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বরং আরো অগ্রসর হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই–এর বাঁদী মু'আযার ব্যাপারে যা কিছু সিদ্ধান্ত তিনি দেন তা থেকে জানা যায়, যে বাঁদীকে তার মালিক জোর করে এ পেশায় নিয়োগ করে তার ওপর থেকে তার মালিকের মালিকানা সত্বও খতম হয়ে যায়। এটি ইমাম যুহ্রীর রেওয়ায়াত। ইবনে কাসীর মুসনাদে আবদুর রাযযাকের বরাত দিয়ে তাঁর গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

৬০. এ আয়াতটির সম্পর্ক কেবলমাত্র ওপরের শেষ আয়াতটির সাথে নয়। বরং সূরার শুরু থেকে এখান পর্যন্ত যে বর্ণনা ধারা চলে এসেছে তার সবের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। দ্ব্যর্থহীন পথ নির্দেশক আয়াত বলতে এমনসব আয়াত বুঝানো হয়েছে যেগুলোতে যিনা, কাযাফ ও লি'আনের আইন বর্ণনা করা হয়েছে, ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলার সাথে মু'মিনদের বিয়েশাদী না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সৎ চরিত্রবান ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ওপর ভিত্তিহীন অপবাদ দেয়া এবং সমাজে দুষ্কৃতি ও অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসারের পথ বন্ধ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۭ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۭ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْۗءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۭ نُوْرٌ عَلٰي نُوْرٍ ۭ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۙ ٣٥

৫ রুকূ'

আল্লাহ[৬১] *আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর আলো।*[৬২] *(বিশ্ব-জাহানে) তাঁর আলোর উপমা যেন একটি তাকে একটি প্রদীপ রাখা আছে, প্রদীপটি আছে একটি চিমনির মধ্যে, চিমনিটি দেখতে এমন যেন মুক্তোর মতো ঝকমকে নক্ষত্র; আর এ প্রদীপটি যয়তুনের এমন একটি মুবারক*[৬৩] *গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়।*[৬৪] *যার তেল আপনা আপনিই জ্বলে ওঠে, চাই আগুন তাকে স্পর্শ করুক বা না করুক। (এভাবে) আলোর ওপরে আলো (বৃদ্ধির সমস্ত উপকরণ একত্র হয়ে গেছে।)*[৬৫] *আল্লাহ যাকে চান নিজের আলোর দিকে পথনির্দেশ করেন।*[৬৬] *তিনি উপমার সাহায্যে লোকদের কথা বুঝান। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস খুব ভালো করেই জানেন।*[৬৭]

করা হয়েছে, পুরুষ ও নারীকে দৃষ্টিসংযত ও যৌনাংগ হেফাজত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে, নারীদের জন্য পরদার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, বিবাহযোগ্য লোকদের বিবাহ না করে একাকী জীবন যাপনকে অপছন্দ করা হয়েছে, গোলামদের আজাদীর জন্য লিখিত চুক্তি করার নিয়ম প্রবর্তন করতে বলা হয়েছে এবং সমাজকে বেশ্যাবৃত্তির অভিশাপ মুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব কথা বলার পর বলা হচ্ছে, আল্লাহকে ভয় করে সহজ সরল পথ অবলম্বনকারীদেরকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া দরকার তাতো আমি দিয়েছি, এখন যদি তোমরা এ শিক্ষার বিপরীত পথে চলো, তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, তোমরা এমন সব জাতির মতো নিজেদের পরিণাম দেখতে চাও যাদের ভয়াবহ ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত আমি এ কুরআনে তোমাদের সামনে পেশ করেছি।—সম্ভবত একটি নির্দেশনামার উপসংহারে এর চেয়ে কড়া সতর্কবাণী আর হতে পারে না। কিন্তু অবাক হতে হয় এমন জাতির কার্যকলাপ দেখে যারা এ নির্দেশনামা তেলাওয়াতও করে আবার এ ধরনের কড়া সাবধান বাণীর পরও এর বিপরীত আচরণও করতে থাকে!

৬১. এখান থেকে শুরু হয়েছে মুনাফিকদের প্রসংগ। ইসলামী সমাজের মধ্যে অবস্থান করে তারা একের পর এক গোলযোগ ও বিভ্রাট সৃষ্টি করে চলছিল এবং ইসলাম,

ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী রাষ্ট্র ও দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবে তৎপর ছিল যেমন বাইরের প্রকাশ্য কাফের ও দুশমনরা তৎপর ছিল। তারা ছিল ঈমানের দাবীদার। মুসলমানদের অন্তরভুক্ত ছিল তারা। মুসলমানদের বিশেষ করে আনসারদের সাথে ছিল তাদের আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক। এ জন্য তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা বিস্তারের সুযোগও বেশী পেতো এবং কোন কোন আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানও নিজের সরলতা বা দুর্বলতার কারণে তাদের ক্রীড়নক ও পৃষ্ঠপোষকেও পরিণত হয়ে যেতো। কিন্তু আসলে বৈষয়িক স্বার্থ তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল এবং ঈমানের দাবী সত্ত্বেও কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদৌলতে দুনিয়ায় যে আলো ছড়িয়ে পড়ছিল তা থেকে তারা ছিল একেবারেই বঞ্চিত। এ সুযোগে তাদেরকে সম্বোধন না করে তাদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে তিনটি উদ্দেশ্য। প্রথমত তাদেরকে উপদেশ দেয়া। কারণ আল্লাহর রহমত ও রবুবিয়াতের প্রথম দাবী হচ্ছে, পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত মানুষকে তার সকল নষ্টামি ও দুষ্কৃতি সত্ত্বেও শেষ সময় পর্যন্ত বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়ত ঈমান ও মুনাফিকির পার্থক্যকে পরিষ্কার ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দেয়া। এভাবে কোন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য মুসলিম সমাজে মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যে ফারাক করা কঠিন হবে না। আর এ ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনার পরও যে ব্যক্তি মুনাফিকদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে সে তার নিজের এ কাজের জন্য পুরোপুরি দায়ী হবে। তৃতীয়ত মুনাফিকদেরকে পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দেয়া। তাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দেয়া যে, মুমিনদের জন্য আল্লাহর যে ওয়াদা রয়েছে তা কেবলমাত্র তাদের জন্য যারা সাচ্চা দিলে ঈমান আনে এবং তারপর এ ঈমানের দাবী পূরণ করে। এ প্রতিশ্রুতি এমন লোকদের জন্য নয় যারা নিছক আদম শুমারীর মাধ্যমে মুসলমানদের দলে ভিড়ে গেছে। কাজেই মুনাফিক ও ফাসিকদের এ প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে কিছু অংশ পাওয়ার আশা করা উচিত নয়।

৬২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী শব্দ সাধারণভাবে কুরআন মজীদে "বিশ্ব–জাহান" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই অন্য কথায় আয়াতের অনুবাদ এও হতে পারে ঃ আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব–জাহানের আলো।

আলো বলতে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যার বদৌলতে দ্রব্যের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ যে নিজে নিজে প্রকাশিত হয় এবং অন্য জিনিসকেও প্রকাশ করে দেয়। মানুষের চিন্তায় নূর ও আলোর এটিই আসল অর্থ। কিছুই না দেখা যাওয়ার অবস্থাকে মানুষ অন্ধকার নাম দিয়েছে। আর এর বিপরীতে যখন সবকিছু দেখা যেতে থাকে এবং প্রত্যেকটি জিনিস প্রকাশ হয়ে যায় তখন মানুষ বলে আলো হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলার জন্য "নূর" তথা আলো শব্দটির ব্যবহার এ মৌলিক অর্থের দিক দিয়েই করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ তিনি এমন কোন আলোকরশ্মি নন যা সেকেণ্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলে এবং আমাদের চোখের পরদায় পড়ে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রকে প্রভাবিত করে, আলোর এ ধরনের কোন অর্থ এখানে নেই। মানুষের মস্তিষ্ক যে অর্থের জন্য এ শব্দটি উদ্ভাবন করেছে, আলোর এ বিশেষ অবস্থা সে অর্থের মৌল তত্ত্বের অন্তরভুক্ত নয়। বরং তার ওপর এ শব্দটি আমরা এ বস্তুজগতে আমাদের অভিজ্ঞতায় যে আলো ধরা দেয় তার দৃষ্টিতে প্রয়োগ করি। মানুষের ভাষায় প্রচলিত যতগুলো শব্দ আল্লাহর জন্য বলা হয়ে থাকে সেগুলো তাদের

আসল মৌলিক অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে, তাদের বস্তুগত অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয় না। যেমন আমরা তাঁর জন্য দেখা শব্দটি ব্যবহার করি। এর অর্থ এ হয় না যে, তিনি মানুষ ও পশুর মতো চোখ নামক একটি অংগের মাধ্যমে দেখেন। আমরা তাঁর জন্য শোনা শব্দ ব্যবহার করি। এর মানে এ নয় যে, তিনি আমাদের মতো কানের সাহায্যে শোনেন। তাঁর জন্য আমরা পাকড়াও ও ধরা শব্দ ব্যবহার করি। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি হাত নামক একটি অংগের সাহায্যে ধরেন। এসব শব্দ সবসময় তাঁর জন্য একটি প্রায়োগিক মর্যাদায় বলা হয়ে থাকে এবং একমাত্র একজন স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ ভুল ধারণা করতে পারে যে, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় শোনা, দেখা ও ধরার যে সীমাবদ্ধ ও বিশেষ আকৃতি রয়েছে তার বাইরে এগুলোর অন্য কোন আকৃতি ও ধরন হওয়া অসম্ভব। অনুরূপভাবে "নূর" বা আলো সম্পর্কেও একথা মনে করা নিছক একটি সংকীর্ণ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এর অর্থের ক্ষেত্র শুধুমাত্র এমন রশ্মিরই আকারে পাওয়া যেতে পারে যা কোন উজ্জ্বল অবয়ব থেকে বের হয়ে এসে চোখের পরদায় প্রতিফলিত হয়। এ সীমিত অর্থে আল্লাহ আলো নন বরং ব্যাপক, সার্বিক ও আসল অর্থে আলো। অর্থাৎ এ বিশ্ব–জাহানে তিনিই একক আসল "প্রকাশের কার্যকারণ", বাকি সবই এখানে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যান্য আলোক বিতরণকারী জিনিসগুলোও তাঁরই দেয়া আলো থেকে আলোকিত হয় ও আলো দান করে। নয়তো তাদের কাছে নিজের এমন কিছু নেই যার সাহায্যে তারা এ ধরনের বিস্ময়কর কাণ্ড করতে পারে।

আলো শব্দের ব্যবহার জ্ঞান অর্থেও হয় এবং এর বিপরীতে অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতাকে অন্ধকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ অর্থেও আল্লাহ বিশ্ব–জাহানের আলো। কেননা, এখানে সত্যের সন্ধান ও সঠিক পথের জ্ঞান একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই এবং তার কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাঁর দান গ্রহণ করা ছাড়া মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার এবং তার ফলশ্রুতিতে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।

৬৩. মুবারক অর্থাৎ বহুল উপকারী, বহুমুখী কল্যাণের ধারক।

৬৪. অর্থাৎ যা খোলা ময়দানে বা উঁচু জায়গায় অবস্থান করে। যেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর রোদ পড়ে। তার সামনে পেছনে কোন আড় থাকে না যে, কেবল সকালের রোদটুকু বা বিকালের রোদটুকু তার ওপর পড়ে। এমন ধরনের যয়তুন গাছের তেল বেশী স্বচ্ছ হয় এবং বেশী উজ্জ্বল আলো দান করে। নিছক পূর্ব বা নিছক পশ্চিম অঞ্চলের যয়তুন গাছ তুলনামূলকভাবে অস্বচ্ছ তেল দেয় এবং প্রদীপে তার আলোও হালকা থাকে।

৬৫. এ উপমায় প্রদীপের সাথে আল্লাহর সত্তাকে এবং তাকের সাথে বিশ্ব–জাহানকে তুলনা করা হয়েছে। আর চিমনি বলা হয়েছে এমন পরদাকে যার মধ্যে মহাসত্যের অধিকারী সমস্ত সৃষ্টিকুলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন, অর্থাৎ এ পরদাটি যেন গোপন করার পরদা নয় বরং প্রবল প্রকাশের পরদা। সৃষ্টির দৃষ্টি যে তাঁকে দেখতে অক্ষম এর কারণ এটা নয় যে, মাঝখানে অন্ধকার আছে, বরং আসল কারণ হচ্ছে, মাঝখানের পরদা স্বচ্ছ এবং এ স্বচ্ছ পরদা অতিক্রম করে আগত আলো এত বেশী তীক্ষ্ণ, তীব্র, অবিমিশ্র ও পরিবেষ্টনকারী যে, সীমিত শক্তি সম্পন্ন চক্ষু তা দেখতে অক্ষম হয়ে গেছে। এ দুর্বল চোখগুলো কেবলমাত্র এমন ধরনের সীমাবদ্ধ আলো দেখতে পারে যার

মধ্যে কমবেশী হতে থাকে, যা কখনো অন্তরহিত আবার কখনো উদিত হয়, যার বিপরীতে কোন অন্ধকার থাকে এবং নিজের বিপরীতধর্মীর সামনে এসে সে সমুজ্জ্বল হয়। কিন্তু নিরেট, ভরাট ও ঘন আলো, যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীই নেই, যা কখনো অন্তরহিত ও নিশ্চিহ্ন হয় না এবং যা সবসময় একইভাবে সব দিক আচ্ছন্ন করে থাকে তাকে পাওয়া ও তাকে দেখা এদের সাধ্যের বাইরে।

আর "এ প্রদীপটি যয়তুনের এমন একটি মুবারক গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয় যা পূর্বেরও নয় পশ্চিমের নয়।" এ বক্তব্য কেবলমাত্র প্রদীপের আলোর পূর্ণাভা ও তার তীব্রতার ধারণা দেবার জন্য বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে যয়তুনের তেলের প্রদীপ থেকেই সর্বাধিক পরিমাণ আলোক লাভ করা হতো। এর মধ্যে আবার উঁচু ও খোলা জায়গায় বেড়ে ওঠা যয়তুন গাছগুলো থেকে যে তেল উৎপন্ন হতো সেগুলোর প্রদীপের আলো হতো সবচেয়ে জোরালো। উপমায় এ বিষয়বস্তুর বক্তব্য এই নয় যে, প্রদীপের সাথে আল্লাহর যে সত্তার তুলনা করা হয়েছে তা অন্য কোন জিনিস থেকে শক্তি (Energy) অর্জন করছে। বরং একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, উপমায় কোন মামুলি ধরনের প্রদীপ নয় বরং তোমাদের দেখা উজ্জ্বলতম প্রদীপের কথা চিন্তা করো। এ ধরনের প্রদীপ যেমন সারা ঘর বাড়ি আলোকোজ্জ্বল করে ঠিক তেমনি আল্লাহর সত্তাও সারা বিশ্ব-জাহানকে আলোক নগরীতে পরিণত করে রেখেছে।

আর এই যে বলা হয়েছে, "তার তেল আপনা আপনিই জ্বলে ওঠে আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও", এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদীপের আলোকে অত্যধিক তীব্র করার ধারণা দেয়া। অর্থাৎ উপমায় এমন সর্বাধিক তীব্র আলো দানকারী প্রদীপের কথা চিন্তা করো যার মধ্যে এ ধরনের স্বচ্ছ ও চরম উত্তেজক তেল রয়েছে। এ তিনটি জিনিস অর্থাৎ যয়তুন, তার পুরবীয় ও পশ্চিমী না হওয়া এবং আগুনের স্পর্শ ছাড়াই তার তেলের আপনা আপনি জ্বলে ওঠা উপমার স্বতন্ত্র অংশ নয় বরং উপমার প্রথম অংশের অর্থাৎ প্রদীপের আনুসংগিক বিষয়াদির অন্তরভুক্ত। উপমার আসল অংশ তিনটি ঃ প্রদীপ, তাক ও স্বচ্ছ চিমনি বা কাঁচের আবরণ।

আয়াতের "তাঁর আলোর উপমা যেমন" এ বাক্যাংশটিও উল্লেখযোগ্য। "আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর আলো" আয়াতের একথাগুলো পড়ে কারোর মনে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারতো ওপরের বাক্যাংশটির মাধ্যমে তা দূর হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহকে "আলো" বলার মানে এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ, আলোই তাঁর স্বরূপ। আসলে তিনি তো হচ্ছেন একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ সত্তা। তিনি জ্ঞানী, শক্তিশালী, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ইত্যাদি হবার সাথে সাথে আলোর অধিকারীও। কিন্তু তাঁর সত্তাকে আলো বলা হয়েছে নিছক তাঁর আলোকোজ্জ্বলতার পূর্ণতার কারণে। যেমন কারোর দানশীলতা গুণের পূর্ণতার কথা বর্ণনা করার জন্য তাকেই "দান" বলে দেয়া অথবা তার সৌন্দর্যের পূর্ণতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং তাকেই সৌন্দর্য আখ্যা দেয়া।

৬৬. যদিও আল্লাহর এ একক ও একচ্ছত্র আলো সমগ্র বিশ্ব-জাহান আলোকিত করছে কিন্তু তা দেখার, জানার ও উপলব্ধি করার সৌভাগ্য সবার হয় না। তা উপলব্ধি করার সুযোগ এবং তার দানে অনুগৃহীত হবার সৌভাগ্য আল্লাহই যাকে চান তাকে দেন। নয়তো অন্ধের জন্য যেমন দিনরাত সমান ঠিক তেমনি অবিবেচক ও অদূরদর্শী মানুষের জন্য

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

(তাঁর আলোর পথ অবলম্বনকারী) ঐ সব ঘরে পাওয়া যায়, যেগুলোকে উন্নত করার ও যেগুলোর মধ্যে নিজের নাম স্মরণ করার হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন।[৬৮] সেগুলোতে এমন সব লোক সকাল সাঁঝে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে। (আর তারা এসব কিছু এ জন্য করে) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেন এবং তদুপরি নিজ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ যাকে চান বেহিসেব দান করেন।[৬৯]

বিজলী, সূর্য, চাঁদ ও তারার আলো তো আলোই, কিন্তু আল্লাহর নূর ও আলো সে ঠাহর করতে পারে না। এ দিক থেকে এ দুর্ভাগার জন্য বিশ্ব–জাহানে সবদিকে অন্ধকারই অন্ধকার। দু'চোখ অন্ধ। তাই নিজের একান্ত কাছের জিনিসই সে দেখতে পারে না। এমনকি তার সাথে ধাক্কা খাওয়ার পরই সে জানতে পারে এ জিনিসটি এখানে ছিল। এভাবে ভিতরের চোখ যার অন্ধ অর্থাৎ যার অন্তরদৃষ্টি নেই সে তার নিজের পাশেই আল্লাহর আলোয় যে সত্য জ্বলজ্বল করছে তাকেও দেখতে পায় না। যখন সে তার সাথে ধাক্কা খেয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের শিকলে বাঁধা পড়ে কেবলমাত্র তখনই তার সন্ধান পায়।

৬৭. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, তিনি জানেন কোন্ সত্যকে কোন্ উপমার সাহায্যে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বুঝানো যেতে পারে। দুই, তিনি জানেন কে এ নিয়ামতের হকদার এবং কে নয়। যে ব্যক্তি সত্যের আলোর সন্ধানী নয়, যে ব্যক্তি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে নিজের পার্থিব স্বার্থেরই মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এবং বস্তুগত স্বাদ ও স্বার্থের সন্ধানে নিমগ্ন থাকে তাকে জোর করে সত্যের আলো দেখাবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। যার সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, সে এর সন্ধানী ও ঐকান্তিক সন্ধানী সে–ই এ দান লাভের যোগ্য।

৬৮. কোন কোন মুফাস্সির এ "ঘরগুলো"কে মসজিদ অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোকে উন্নত করার অর্থ নিয়েছেন এগুলো নির্মাণ ও এগুলোকে মর্যাদা প্রদান করা। আবার অন্য কতিপয় মুফাস্সির এর অর্থ নিয়েছেন মু'মিনদের ঘর এবং সেগুলোকে উন্নত

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ط
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ط
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن
فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ط ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط إِذَا
أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ط وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

কিন্তু যারা কুফরী করে[৭০] তাদের কর্মের উপমা হলো পানিহীন মরুপ্রান্তরে মরীচিকা, তৃষ্ণাতুর পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছুলো কিছুই পেলো না বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেলো, যিনি তার পূর্ণ হিসেব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসেব নিতে দেরী হয় না।[৭১] অথবা তার উপমা যেমন একটি গভীর সাগর বুকে অন্ধকার। ওপরে ছেয়ে আছে একটি তরংগ, তার ওপরে আর একটি তরংগ আর তার ওপরে মেঘমালা অন্ধকারের ওপর অন্ধকার আচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলে তাও দেখতে পায় না।[৭২] যাকে আল্লাহ আলো দেন না তার জন্য আর কোন আলো নেই।[৭৩]

করার অর্থ তাঁদের মতে সেগুলোকে নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করা। "সেগুলোর মধ্যে নিজের নাম স্মরণ করার আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন" এ শব্দগুলো বাহ্যত মসজিদ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার বেশী সমর্থক দেখা যায়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে এটি প্রথম ব্যাখ্যাটির মতো এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিরও সমান সমর্থক। কারণ আল্লাহর শরীয়াত বৈরাগ্যবাদগ্রস্ত ধর্মের ন্যায় ইবাদাতকে কেবল ইবাদাতখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না। পুরোহিত বা পূজারী শ্রেণীর কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া সেখানে বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করা যেতে পারে না। বরং এখানে মসজিদের মতো গৃহ ও ইবাদাতখানা এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের পুরোহিত। কাজেই এ সূরায় সকল প্রকার ঘরোয়া জীবন যাপনকে উচ্চ ও সমুন্নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পরিবেশ ও পরিস্থিতির দিক দিয়ে বেশী উপযোগী বলে আমাদের মনে হচ্ছে, যদিও প্রথম ব্যাখ্যাটিকে রদ করে দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ আমাদের কাছে নেই। বিচিত্র নয়, এর অর্থ হচ্ছে মু'মিনদের গৃহ ও মসজিদ দু'টোই।

৬৯. আল্লাহর আসল আলো উপলব্ধি ও তার ধারায় অবগাহন করার জন্য যেসব গুণের প্রয়োজন এখানে সেগুলোর ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ অন্ধ বন্টনকারী নন। যাকে ইচ্ছা এমনি বিনা কারণে তার পাত্র এমনভাবে ভরে দেবেন যে, উপচে পড়ে যেতে থাকবে আবার যাকে ইচ্ছা গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন, এটা আল্লাহর বন্টন নীতি নয়। তিনি

যাকে দেন, দেখেশুনেই দেন। সত্যের নিয়ামত দান করার ব্যাপারে তিনি যা কিছু দেখেন তা হচ্ছে ঃ মানুষের মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, আগ্রহ, আকর্ষণ, ভয় এবং তাঁর পুরস্কার গ্রহণের আকাংখা ও ক্রোধ থেকে বাঁচার অভিলাষ আছে। সে পার্থিব স্বার্থ পূজায় নিজেকে বিলীন করে দেয়নি। বরং যাবতীয় কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তার সমগ্র হৃদয়–মন আচ্ছন্ন করে থাকে তার মহান প্রতিপালকের স্মৃতি। সে রসাতলে যেতে চায় না বরং কার্যত এমন উচ্চমার্গে উন্নীত হতে চায় যেদিকে তার মালিক তাকে পথ দেখাতে চায়। সে এ দু'দিনের জীবনের লাভের প্রত্যাশী হয় না বরং তার দৃষ্টি থাকে আখেরাতের চিরন্তন জীবনের ওপর। এসব কিছু দেখে মানুষকে আল্লাহর আলোয় অবগাহন করার সুযোগ দেবার ফায়সালা করা হয়। তারপর যখন আল্লাহ দেবার জন্য এগিয়ে আসেন তখন এত বেশী দিয়ে দেন যে, মানুষের নিজের নেবার পাত্র সংকীর্ণ থাকলে তো ভিন্ন কথা, নয়তো তাঁর দেবার ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা এবং শেষ সীমানা নেই।

৭০. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ এবং সে সময় আল্লাহর নবী সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যের শিক্ষা দিচ্ছিলেন সরল মনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। ওপরের আয়াত নিজেই বলে দিচ্ছে, আল্লাহর আলো লাভকারী বলতে সাচ্চা ও সৎ মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাই এখন তাদের মোকাবিলায় এমন সব লোকের অবস্থা জানানো হচ্ছে যারা এ আলো লাভের আসল ও একমাত্র মাধ্যম অর্থাৎ রসূলকেই মেনে নিতে ও তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে। মন থেকে অস্বীকার করুক অথবা নিছক মৌখিক অস্বীকৃতির ঘোষণা দিক কিংবা মনে ও মুখে উভয়ভাবে অস্বীকৃতি জানাক তাতে কিছু আসে যায় না।

৭১. এ উপমায় এমনসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা কুফরী ও মুনাফিকী সত্ত্বেও বাহ্যত সৎকাজও করে এবং মোটামুটিভাবে আখেরাতকেও মানে আবার এ অসার চিন্তাও পোষণ করে যে, সাচ্চা ঈমান ও মুমিনের গুণাবলী এবং রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া এ কার্যাবলী তাদের জন্য আখেরাতে কোন কাজে লাগবে না। উপমার আকারে তাদেরকে জানানো হচ্ছে, তোমরা নিজেদের যেসব বাহ্যিক ও প্রদর্শনীমূলক সৎ–কাজের মাধ্যমে আখেরাতে লাভবান হবার আশা রাখো সেগুলো নিছক মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। মরুভূমিতে দূর থেকে চিকচিক করা বালুকারাশি দেখে যেমন পিপাসার্ত তাকে একটি তরংগায়িত পানির দরিয়া মনে করে নিজের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য উর্ধশ্বাসে সেদিকে দৌড়াতে থাকে, ঠিক তেমনি তোমরা এসব কর্মের ওপর মিথ্যা ভরসা করে মৃত্যু মনযিলের পথ অতিক্রম করে চলছো। কিন্তু যেমন মরীচিকার দিকে ছুটে চলা ব্যক্তি যখন যে স্থানে পানির দরিয়া আছে মনে করেছিল সেখানে পৌঁছে কিছুই পায় না ঠিক তেমনি তোমরা যখন মৃত্যু মনযিলে প্রবেশ করবে তখন জানতে পারবে সেখানে এমন কোন জিনিস নেই যা থেকে তোমরা লাভবান হতে পারবে। বরং এর বিপরীত দেখবে তোমাদের কুফরী ও মুনাফিকী এবং লোকদেখানো সৎকাজের সাথে তোমরা যেসব খারাপ কাজ করছিলে সেগুলোর হিসেব নেবার এবং পুরোপুরি প্রতিদান দেবার জন্য আল্লাহ সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

৭২. এ উপমায় সকল কাফের মুনাফিকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। লোক দেখানো সৎকাজকারীরাও এর অন্তরভুক্ত। এদের সবার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, জাগতিক পরিভাষায়

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ۖ
كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي
سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خِلٰلِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ
بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

৬ রুকূ'

তুমি[৭৪] কি দেখ না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে? প্রত্যেকেই জানে তার নামাযের ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা কিছু করে আল্লাহ তা জানেন। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, তারপর তার খণ্ডগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে একত্র করে একটি ঘন মেঘে পরিণত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার খোল থেকে বৃষ্টি বিন্দু একাধারে ঝরে পড়ছে। আর তিনি আকাশ থেকে তার মধ্যে সমুন্নত পাহাড়গুলোর বদৌলতে[৭৫] শিলা বর্ষণ করেন, তারপর যাকে চান এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং যাকে চান এর হাত থেকে বাঁচিয়ে নেন। তার বিদ্যুৎচমক চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

তারা মহাপণ্ডিত ও জ্ঞান সাগরের মহান দিশারী হলেও হতে পারে কিন্তু নিজেদের সমগ্র জীবন যাপন করছে তারা চরম ও পূর্ণ মূর্খতার মধ্যে। তারা হচ্ছে এমন ব্যক্তির মতো যে এমন কোন জায়গায় আবদ্ধ হয়ে আছে যেখানে পুরোপুরি অন্ধকারের রাজত্ব, আলোর সামান্যতম শিখাও যেখানে পৌঁছুতে পারে না। তারা মনে করে আনবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, শব্দের চেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন বিমান এবং চাঁদে ও গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার জন্য মহাশূন্য যান তৈরী করার নাম জ্ঞান। তাদের মতে, খাদ্য নীতি, অর্থনীতি,

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾
وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ
اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ
مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُوْلُوْنَ
اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

তিনিই রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষা।

আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণ বিশিষ্টকে এক ধরনের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ চলছে পেটে ভর দিয়ে, কেউ চলছে দু'পায়ে হেঁটে আবার কেউ চারপায়ে ভর দিয়ে। যা কিছু তিনি চান পয়দা করেন, তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

আমি পরিষ্কার সত্য বিবৃতকারী আয়াত নাযিল করে দিয়েছি তবে আল্লাহই যাকে চান সত্য সরল পথ দেখান।

তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি কিন্তু এরপর তাদের মধ্য থেকে একটি দল (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ ধরনের লোকেরা কখনোই মু'মিন নয়।[৭৬]

আইন শাস্ত্র ও দর্শনে পারদর্শিতা অর্জন করার নাম জ্ঞান। কিন্তু আসল জ্ঞান এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসের নাম। তার স্পর্শ থেকে তারা অনেক দূরে রয়ে গেছে। সেই জ্ঞানের দৃষ্টিতে তারা নিছক মূর্খ ও অজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে একজন অশিক্ষিত গেঁয়ো যদি সত্যকে চেনে ও উপলব্ধি করে তাহলে সে জ্ঞানবান।

৭৩. এখানে পৌঁছে আসল কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। এর সূচনা করা হয়েছিল اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর বিষয়বস্তু থেকে। বিশ্ব-জাহানে যখন মূলত আল্লাহর আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই এবং সে আলো থেকেই হচ্ছে যাবতীয় সত্যের

وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوٓا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوٓا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾

যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে, যাতে রসূল তাদের পরস্পরের মোকদ্দমার ফায়সালা করে দেন[৭৭] তখন তাদের মধ্যকার একটি দল পাশ কাটিয়ে যায়।[৭৮] তবে যদি সত্য তাদের অনুকূল থাকে, তাহলে বড়ই বিনীত হয়ে রসূলের কাছে আসে।[৭৯] তাদের মনে কি (মুনাফিকীর) রোগ আছে? না তারা সন্দেহের শিকার হয়েছে? না তারা ভয় করছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন? আসলে তারা নিজেরাই যালেম।[৮০]

প্রকাশ তখন যে ব্যক্তি আল্লাহর আলো পাবে না সে পূর্ণ ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে থাকবে না তো আর কি হবে? আর কোথাও তো আলো নেই। কাজেই অন্য কোথাও থেকে আলোর একটি শিখাও লাভ করার সম্ভাবনা কারো নেই।

৭৪. ওপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব–জাহানের আলো কিন্তু একমাত্র সৎ মুমিনরাই এ আলো লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, বাদবাকি সব লোকেরাই এ পূর্ণাংগ আলোর দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকেও ঘোর অন্ধকারে অন্ধের মতো হাতড়ে মরে। এখন এ আলোর দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি এখানে পেশ করা হচ্ছে। মনের চোখ খুলে কেউ সেগুলোর দিকে তাকালে সবসময় সবদিকে আল্লাহকেই সক্রিয় দেখতে পাবে। কিন্তু যাদের মনের চোখ অন্ধ তারা কপালের দুটো চোখ বিস্ফারিত করে দেখলেও জীববিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন রকম বিদ্যা তাদের চোখে ভালোমতোই সক্রিয় রয়েছে বলে তাদের চোখে ঠেকবে কিন্তু আল্লাহকে কোথাও সক্রিয় দেখতে পাবে না।

৭৫. এর অর্থ ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মেঘপুঞ্জও হতে পারে রূপক অর্থে একেই হয়তো আকাশের পাহাড় বলা হয়েছে। আবার পৃথিবীর পাহাড়ও হতে পারে, যা শূন্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোর চূড়ায় জমে থাকা বরফের প্রভাবে অনেক সময় বাতাস এত বেশী ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে, মেঘমালা জমে গিয়ে শিলা বৃষ্টি হতে থাকে।

৭৬. অর্থাৎ আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াই তাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়। তাদের এহেন কার্যকলাপ থেকে বুঝা যায় যে, তারা যখন বলেছে আমরা ঈমান এনেছি ও আনুগত্য স্বীকার করেছি তখন তারা অসত্য বলেছে।

৭৭. এ শব্দগুলো পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, রসূলের ফায়সালা হচ্ছে আল্লাহর ফায়সালা এবং তাঁর হুকুম আল্লাহরই হুকুমের নামান্তর মাত্র। রসূলের দিকে আহবান করা নিছক রসূলের দিকেই আহবান করা নয় বরং আল্লাহ ও রসূল উভয়েরই দিকে আহবান করা। তাছাড়া এ আয়াতটি এবং ওপরের আয়াতটি থেকে একথা নিসন্দেহে পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য ছাড়া ঈমানের দাবী অর্থহীন এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের এ ছাড়া আর কোন অর্থ নেই যে, মুসলমান ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেয়া আইনের অনুগত হবে। সে যদি এ কর্মনীতি অবলম্বন না করে, তাহলে তার ঈমানের দাবী একটি মুনাফিকী দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। (তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য সূরা নিসা ৫৯–৬১ আয়াত ৮৯–৯২ টীকা সহকারে দেখুন)

৭৮. উল্লেখ্য, এ ব্যাপারটি কেবল মাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেরই জন্য ছিল না বরং তাঁর পর যিনিই ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকের পদে আসীন থাকেন এবং আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী ফায়সালা দেন তাঁর আদালতের সমন হচ্ছে আসলে আল্লাহ ও রসূলের আদালতের সমন এবং যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে মূলত তা থেকে নয় বরং আল্লাহ ও রসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি মুরসাল হাদীসে এ বিষয় এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। হাসান বসরী রহমাতুল্লাহে আলাইহে এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

مَنْ دُعِيَ اِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لاَ حَقَّ لَهُ

"যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের আদালতের বিচারপতিদের মধ্য থেকে কোন বিচারপতির কাছে ডাকা হয় এবং সে হাজির হয় না সে জালেম, তার কোন অধিকার নেই।" (আহকামুল কুরআন জাসসাস, ৩ খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা)

অন্য কথায় এ ধরনের লোক শাস্তিলাভের যোগ্য আবার এ সংগে তাকে অন্যায়কারী প্রতিপন্ন করে তার বিরুদ্ধে একতরফা ফায়সালা দিয়ে দেয়াও ন্যায়সংগত।

৭৯. এ আয়াতটি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছে যে, শরীয়াতের লাভজনক কথাগুলোকে যে ব্যক্তি সানন্দে গ্রহণ করে নেয় কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতে যা কিছু তার স্বার্থ ও আশা–আকাংখার বিরোধী হয় তাকে সে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার মোকাবিলায় দুনিয়ার অন্যান্য আইনকে প্রাধান্য দেয়, সে মু'মিন নয় বরং মুনাফিক। তার ঈমানের দাবী মিথ্যা। কারণ সে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান রাখে না বরং ঈমান রাখে নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির ওপর। এ নীতি অবলম্বন করে এর সাথে সাথে সে যদি আল্লাহর শরীয়াতের কোন অংশকে মেনেও নেয়, তাহলে আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ধরনের মেনে নেয়ার কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

৮০. অর্থাৎ মানুষের এ কর্মনীতি অবলম্বনের পেছনে তিনটি সম্ভাব্য কারণই থাকতে পারে। এক, যে মানুষটি ঈমানের দাবীদার সে আসলে ঈমানই আনেনি এবং মুনাফিকী পদ্ধতিতে নিছক ধোঁকা দেবার এবং মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে অবৈধ স্বার্থলাভের জন্য মুসলমান হয়েছে। দুই, ঈমান আনা সত্ত্বেও তার মনে এ মর্মে সন্দেহ রয়ে গেছে যে, রসূল

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ
طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ
وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

৭ রুকূ'

মু'মিনদের কাজই হচ্ছে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রসূল তাদের মোকদ্দমার ফায়সালা করেন, তখন তারা বলেন, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম হবে। আর সফলকাম তারাই যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে চলে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকে।

এ মুনাফিকরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, "আপনি হুকুম দিলে আমরা অবশ্যই ঘর থেকে বের হয়ে পড়বো।" তাদেরকে বলো, "কসম খেয়ো না, তোমাদের আনুগত্যের অবস্থা জানা আছে।[৮১] *তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নন।"*[৮২] *বলো, "আল্লাহর অনুগত হও এবং রসূলের হুকুম মেনে চলো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখো, রসূলের ওপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য রসূলই দায়ী এবং তোমাদের ওপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই সৎ পথ পেয়ে যাবে, অন্যথায় পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন হুকুম শুনিয়ে দেয়া ছাড়া রসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।"*

আসলে আল্লাহর রসূল কি না, কুরআন আল্লাহর কিতাব কি না এবং কিয়ামত সত্যিসত্যিই অনুষ্ঠিত হবে কি না অথবা এগুলো সবই নিছক মুখরোচক গালগল্প বরং আসলে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে কি অথবা এটাও নিছক একটা কল্পনা, কোন বিশেষ স্বার্থোদ্ধারের

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ
الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ
لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۵﴾
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۶﴾
لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ
وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۵۷﴾

আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়–ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমার বন্দেগী করুক এবং আমার সাথে কাউকে যেন শরীক না করে।[৮৩] আর যারা এর পর কুফরী করবে[৮৪] তারাই ফাসেক। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে। যারা কুফরী করছে তাদের সম্পর্কে এ ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবে। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়।

উদ্দেশ্যে এ কাল্পনিক বিষয়টি তৈরী করে নেয়া হয়েছে। তিন, সে আল্লাহকে আল্লাহ এবং রসূলকে রসূল বলে মেনে নেবার পরও তাঁদের পক্ষ থেকে জুলুমের আশংকা করে। সে মনে করে আল্লাহর কিতাব অমুক হুকুমটি দিয়ে তো আমাদের বিপদে ফেলে দিয়েছে এবং আল্লাহর রসূলের অমুক উক্তি বা অমুক পদ্ধতি আমাদের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। এ তিনটি কারণের মধ্যে যেটিই সত্য হোক না কেন, মোটকথা এ ধরনের লোকদের জালেম হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ ধরনের চিন্তা সহকারে যে ব্যক্তি মুসলমানদের দলভুক্ত হয়, ঈমানের দাবী করে এবং মুসলিম সমাজের একজন সদস্য সেজে এ সমাজ থেকে

বিভিন্ন ধরনের অবৈধ স্বার্থ হাসিল করতে থাকে, সে একজন বড় দাগাবাজ, বিশ্বাসঘাতক, খেয়ানতকারী ও জালিয়াত। সে নিজের ওপরও জুলুম করে। রাত দিন মিথ্যাচারের মাধ্যমে নিজেকে সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বভাবের মানুষে পরিণত করতে থাকে। সে এমন ধরনের মুসলমানদের প্রতিও যুলুম করে যারা তার বাহ্যিক কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের ওপর নির্ভর করে তাকে এ মিল্লাতের একটি অংশ বলে মেনে নেয় এবং তারপর তার সাথে নানান ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

৮১. দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে, মু'মিনদের থেকে কাংখিত আনুগত্য হচ্ছে এমন পরিচিত ধরনের আনুগত্য যা সকল প্রকার সন্দেহ–সংশয়ের উর্ধে থাকে তা এমন ধরনের আনুগত্য নয় যার নিশ্চয়তা দেবার জন্য কসম খাবার প্রয়োজন হয় এবং এর পরও তার প্রতি অবিশ্বাস থাকে। যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশের অনুগত হয় তাদের মনোভাব ও কর্মনীতি গোপন থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কার্যধারা দেখে অনুভব করে, এরা আনুগত্যশীল লোক। তাদের ব্যাপারে এমন কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশই নেই যে, তা দূর করার জন্য কসম খাবার প্রয়োজন দেখা দেবে।

৮২. অর্থাৎ সৃষ্টির মোকাবিলায় এ প্রতারণা হয়তো সফল হয়ে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহর মোকাবিলায় কেমন করে সফল হতে পারে? তিনি তো প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থা বরং মনের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা, চিন্তা ও আশা–আকাংখাও জানেন।

৮৩. এ বক্তব্যের শুরুতেই আমি ইংগিত করেছি, এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফিকদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা যে, আল্লাহ মুসলমানদের খিলাফত দান করার যে প্রতিশ্রুতি দেন তা নিছক আদম শুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলমান হিসেবে লেখা হয়েছে তাদের জন্য নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্য যারা সাচ্চা ঈমানদার, চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সৎ, আল্লাহর পছন্দনীয় দীনের আনুগত্যকারী এবং সব ধরনের শিরক মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বকারী। যাদের মধ্যে এসব গুণ নেই, নিছক মুখে ঈমানের দাবীদার, তারা এ প্রতিশ্রুতিলাভের যোগ্য নয় এবং তাদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি দানও করা হয়নি। কাজেই তারা যেন এর অংশীদার হবার আশা না রাখে।

কেউ কেউ খিলাফতকে নিছক রাষ্ট্র ক্ষমতা, রাজ্য শাসন, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্থে গ্রহণ করেন। তারপর আলোচ্য আয়াত থেকে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, দুনিয়ায় যে ব্যক্তিই এ শক্তি অর্জন করে সে মু'মিন, সৎ, আল্লাহর পছন্দনীয় দীনের অনুসারী, আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বকারী এবং শিরক থেকে দূরে অবস্থানকারী। এরপর তারা নিজেদের এ ভুল সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য ঈমান, সৎকর্মশীলতা, সত্যদীন, আল্লাহর ইবাদাত ও শিরক তথা প্রত্যেকটি জিনিসের অর্থ বিকৃত করে তাকে এমন কিছু বানিয়ে দেন যা তাদের এ মতবাদের সাথে খাপ খেয়ে যায়। এটা কুরআনের নিকৃষ্টতম অর্থগত বিকৃতি। এ বিকৃতি ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিকৃতিকেও ম্লান করে দিয়েছে। এ বিকৃতির মাধ্যমে কুরআনের একটি আয়াতের এমন একটি অর্থ করা হয়েছে যা সমগ্র কুরআনের শিক্ষাকে বিকৃত করে দেয় এবং ইসলামের কোন একটি জিনিসকেও তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয় না। খিলাফতের এ সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর নিশ্চিতভাবে এমন সব লোকের ওপর এ আয়াত প্রযোজ্য হয় যারা কখনো দুনিয়ায় প্রাধান্য ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেছে অথবা বর্তমানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। তারা আল্লাহ, অহী, রিসালাত,

আখেরাত সবকিছু অস্বীকারকারী হতে পারে এবং ফাসেকী ও অশ্লীলতার এমন সব মলিনতায় আপ্লুতও হতে পারে যেগুলোকে কুরআন কবীরা গুনাহ তথা বৃহত পাপ গণ্য করেছে, যেমন সূদ, ব্যভিচার, মদ, জুয়া। এখন যদি এসব লোক সৎমুমিন হয়ে থাকে এবং এ জন্যই তাদেরকে খিলাফতের উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে, তাহলে এরপর ঈমানের অর্থ প্রাকৃতিক আইন মেনে নেয়া এবং সৎকর্মশীলতা অর্থ এ আইনগুলোকে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা ছাড়া আর কি হতে পারে? আর আল্লাহর পছন্দনীয় দীন বলতে প্রাণী বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে শিল্প, কারিগরী, বাণিজ্য ও রাজনীতিতে ব্যাপক উন্নতি লাভ করা ছাড়া আর কি হতে পারে? এরপর আল্লাহর বন্দেগী বলতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সাফল্য লাভ করার জন্য যেসব নিয়ম কানুন মেনে চলা প্রকৃতিগতভাবে লাভজনক ও অপরিহার্য হয়ে থাকে সেগুলো মেনে চলা ছাড়া আর কি হতে পারে? তারপর এ লাভজনক নিয়ম কানুনের সাথে কোন ব্যক্তি বা জাতি কিছু ক্ষতিকর পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাকেই শিরক নামে অভিহিত করা ছাড়া আর কাকে শিরক বলা যাবে? কিন্তু যে ব্যক্তি কখনো দৃষ্টি ও মন আচ্ছন্ন না রেখে বুঝে কুরআন পড়েছে সে কি কখনো একথা মেনে নিতে পারে যে, সত্যিই কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ঈমান, সৎকাজ, সত্য দীন, আল্লাহর ইবাদাত এবং তাওহীদ ও শির্কের এ অর্থই হয়? যে ব্যক্তি কখনো পুরো কুরআন বুঝে পড়েনি এবং কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নিয়ে সেগুলোকে নিজের চিন্তা–কল্পনা ও মতবাদ অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছে সে–ই কেবল এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অথবা এমন এক ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে, যে কুরআন পড়ার সময় এমন সব আয়াতকে একেবারেই অর্থহীন ও ভুল মনে করেছে যেগুলোতে আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ, তাঁর নাযিল করা অহীকে পথনির্দেশনার একমাত্র উপায় এবং তাঁর পাঠানো প্রত্যেক নবীকে চূড়ান্ত পর্যায়ে অপরিহার্যভাবে মেনে নেবার ও নেতা বলে স্বীকার করে অনুসরণ করার আহবান জানানো হয়েছে। আর এই সংগে বর্তমান দুনিয়াবী জীবনের শেষে দ্বিতীয় আর একটি জীবন কেবল মেনে নেবারই দাবী করা হয়নি বরং একথাও পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা এ জীবনে নিজেদের জবাবদিহির কথা অস্বীকার করে বা এ ব্যাপারে সকল প্রকার চিন্তা বিমুক্ত হয়ে নিছক এ দুনিয়ায় সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করবে তারা চূড়ান্ত সাফল্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। কুরআনে এ বিষয়বস্তুগুলো এত বেশী পরিমাণে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারবার বলা হয়েছে যে, খিলাফতলাভ সম্পর্কিত এ আয়াতের এ নতুন ব্যাখ্যাতাগণ এ ব্যাপারে যে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন, যথার্থ সততা ও আন্তরিকতার সাথে এ কিতাব পাঠকারী কোন ব্যক্তি কখনো তার শিকার হতে পারেন, একথা মেনে নেয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ খিলাফত ও খিলাফতলাভের যে অর্থের ওপর তারা নিজেদের চিন্তার এ বিশাল ইমারত নির্মাণ করেছেন তা তাদের নিজেদের তৈরী। কুরআনের জ্ঞান রাখে এমন কোন ব্যক্তি কখনো এ আয়াতের এ অর্থ করতে পারেন না।

আসলে কুরআন খিলাফত ও খিলাফতলাভকে তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে। প্রত্যেক জায়গায় পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় থেকে কোথায় এ শব্দটি কি অর্থে বলা হয়েছে তা জানা যায়।

এর একটি অর্থ হচ্ছে, "আল্লাহর দেয়া ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।" এ অর্থ অনুসারে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানব সন্তান পৃথিবীতে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "আল্লাহর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর শরীয়াতী বিধানের (নিছক প্রাকৃতিক বিধানের নয়) আওতায় খিলাফতের ক্ষমতা ব্যবহার করা।" এ অর্থে কেবলমাত্র সৎমুমিনই খলীফা গণ্য হয়। কারণ সে সঠিকভাবে খিলাফতের হক আদায় করে। বিপরীত পক্ষে কাফের ও ফাসেক খলীফা নয় বরং বিদ্রোহী। কারণ তারা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাকে নাফরমানীর পথে ব্যবহার করে।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, "এক যুগের বিজয়ী ও ক্ষমতাশালী জাতির পরে অন্য জাতির তার স্থান দখল করা।" খিলাফতের প্রথম দু'টি অর্থ গৃহীত হয়েছে "প্রতিনিধিত্ব" শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে। আর এ শেষ অর্থটি "স্থলাভিষিক্ত" শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এ শব্দটির এ দু'টি অর্থ আরবী ভাষায় সর্বজন পরিচিত।

এখন যে ব্যক্তিই এখানে এ প্রেক্ষাপটে খিলাফতলাভের আয়াতটি পাঠ করবে সে এক মুহূর্তের জন্যও এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এখানে খিলাফত শব্দটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা আল্লাহর শরীয়াতী বিধান অনুযায়ী (নিছক প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী নয়) তাঁর প্রতিনিধিত্বের যথাযথ হক আদায় করে। এ কারণেই কাফের তো দূরের কথা ইসলামের দাবীদার মুনাফিকদেরকেও এ প্রতিশ্রুতিতে শরীক করতে অস্বীকৃতি জানানো হচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে, একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের গুণে গুণান্বিত লোকেরাই হয় এর অধিকারী। এ জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফল হিসেবে বলা হচ্ছে, আল্লাহর পছন্দনীয় দীন অর্থাৎ ইসলাম মজবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর এ জন্য এ পুরস্কার দানের শর্ত হিসেবে বলা হচ্ছে, নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। এ বন্দেগীতে যেন শিরকের সামান্যতমও মিশেল না থাকে। এ প্রতিশ্রুতিকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আন্তর্জাতিক ময়দানে পৌঁছিয়ে দেয়া এবং আমেরিকা থেকে নিয়ে রাশিয়া পর্যন্ত যারই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ-পতিপত্তির ডংকা দুনিয়ায় বাজতে থাকে তারই সমীপে একে নজরানা হিসেবে পেশ করা চূড়ান্ত মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ শক্তিগুলো যদি খিলাফতের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকে থাকে তাহলে ফেরাউন ও নমরূদ কি দোষ করেছিল, আল্লাহ কেন তাদেরকে অভিশাপলাভের যোগ্য গণ্য করেছেন? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৯৯ টীকা)।

এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি পরোক্ষভাবে পৌঁছে যায়। প্রত্যক্ষভাবে এখানে এমন সব লোককে সম্বোধন করা হয়েছিল যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ছিলেন। প্রতিশ্রুতি যখন দেয়া হয়েছিল তখন সত্যিই মুসলমানরা ভয়-ভীতির মধ্যে অবস্থান করছিল এবং দীন ইসলাম তখনো হিজাযের সরজমিনে মজবুতভাবে শিকড় গেড়ে বসেনি। এর কয়েক বছর পর এ ভয়ভীতির অবস্থা কেবল নিরাপত্তায় বদলে যায়নি বরং ইসলাম আরব থেকে বের হয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বৃহত্তর অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শিকড় কেবল তার জন্মভূমিতেই নয়, বহির্বিশ্বেও মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাঁর এ প্রতিশ্রুতি আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক ও উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের জামানায় পুরা

করে দেন, এটি একথার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ। এরপর এ তিন মহান ব্যক্তির খিলাফতকে কুরআন নিজেই সত্যায়িত করেছে এবং আল্লাহ নিজেই এদের সৎমুমিন হবার সাক্ষ দিচ্ছেন, এ ব্যাপারে কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে সন্দেহ পোষণ করা কঠিন। এ ব্যাপারে যদি কারোর মনে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাঁর "নাহ্‌জুল বালাগায়" সাইয়েদুনা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণ পাঠ করা দরকার। হযরত উমরকে ইরানীদের বিরুদ্ধে সশরীরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি এ ভাষণটি দিয়েছিলেন। এতে তিনি বলেন ঃ এ কাজের বিস্তার বা দুর্বলতা সংখ্যায় বেশী হওয়া ও কম হওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। এ হচ্ছে আল্লাহর দীন। তিনি একে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করেছেন। আর আল্লাহর সেনাদলকে তিনি সাহায্য–সহায়তা দান করেছেন। শেষ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে তা এখানে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ নিজেই আমাদের বলেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ ... ...

আল্লাহ নিশ্চয়ই এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন এবং নিশ্চয়ই নিজের সেনানীদেরকে সাহায্য করবেন। মোতির মালার মধ্যে সূতোর যে স্থান, ইসলামে কাইয়েম তথা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারীও সে একই স্থানে অবস্থান করছেন। সূতো ছিড়ে গেলেই মোতির দানাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শৃংখলা বিনষ্ট হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর আবার একত্র হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে সন্দেহ নেই, আরবরা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে বিপুল সংখ্যায় পরিণত করেছে এবং সংঘবদ্ধতা তাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছে। আপনি কেন্দ্রীয় পরিচালক হিসেবে এখানে শক্ত হয়ে বসে থাকুন, আরবের যাঁতাকে নিজের চারদিকে ঘুরাতে থাকুন এবং এখানে বসে বসেই যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে থাকুন। নয়তো আপনি যদি একবার এখান থেকে সরে যান তাহলে সবদিকে আরবীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করবে এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছুবে যে, আপনাকে সামনের শত্রুর তুলনায় পেছনের বিপদের কথা বেশী করে চিন্তা করতে হবে। আবার ওদিকে ইরানীরা আপনার ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করবে। তারা মনে করবে, এই তো আরবের মূল গ্রন্থী, একে কেটে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কাজেই আপনাকে খতম করে দেবার জন্য তারা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। আর আজমবাসীরা এ সময় বিপুল সংখ্যায় এসে ভীড় জমিয়েছে বলে যে কথা আপনি বলেছেন এর জবাবে বলা যায়, এর আগেও আমরা তাদের সাথে লড়েছি, তখনো সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে লড়িনি বরং আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তাই আজ পর্যন্ত আমাদের সফলকাম করেছে।"

জ্ঞানী পর্যবেক্ষক নিজেই দেখতে পারেন হযরত আলী (রা) এখানে কাকে খিলাফতলাভের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করছেন।

৮৪. এখানে কুফরী করা মানে নিয়ামত অস্বীকার করাও হতে পারে আবার সত্য অস্বীকার করাও। প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর ক্ষেত্র হবে এমন সব লোক যারা খিলাফতের নিয়ামত লাভ করার পর সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়। আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে এর ক্ষেত্র হবে মুনাফিকবৃন্দ, যারা আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি শুনার পরও নিজের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতি পরিহার করে না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

৮ রুকু'

হে ঈমানদারগণ![৮৫] তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসী[৮৬] এবং তোমাদের এমন সব সন্তান যারা এখনো বুদ্ধির সীমানায় পৌছেনি,[৮৭] তাদের অবশ্যি তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত : ফজরের নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক ছেড়ে রেখে দাও এবং এশার নামাযের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়।[৮৮] এরপরে তারা বিনা অনুমতিতে এলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই এবং তাদেরও না।[৮৯] তোমাদের পরস্পরের কাছে বারবার আসতেই হয়।[৯০] এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজের বাণী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন ও বিজ্ঞ।

৮৫. এখান থেকে আবার সামাজিক বিধানের ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু হচ্ছে। সূরা নূরের এ অংশটি ওপরের ভাষণের কিছুকাল পরে নাযিল হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

৮৬. অধিকাংশ মুফাস্সির ও ফকীহের মতে "মালিকানাধীন" বলতে দাসদাসী উভয়কে বুঝানো হয়েছে। কারণ এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে উমর ও মুজাহিদ এ আয়াতে মামলুক তথা মালিকানাধীন শব্দটি কেবলমাত্র দাস অর্থে নিয়েছেন। তাঁরা দাসীকে এর বাইরে রেখেছেন। অথচ সামনের দিকে যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিলে এ বিশেষ অর্থের কোন কারণ দেখা যায় না। একান্তে অবস্থান করার সময় যেমন নিজের ছেলেমেয়েদের অকস্মাত এসে যাওয়া সংগত নয় তেমনি দাসী–চাকরানীর এসে যাওয়াও অসংগত।

এ আয়াতের আদেশ প্রাপ্ত বয়স্ক–অপ্রাপ্ত বয়স্ক উভয় ধরনের দাসদাসীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, এ ব্যাপারে সবাই একমত।

৮৭. দ্বিতীয় অনুবাদ হতে পারে, "প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো স্বপ্ন দেখার বয়সে পৌঁছেনি।" এ থেকেই ফকীহগণ স্বপ্নদোষকে ছেলেদের বয়ঃপ্রাপ্ত হবার সূচনা বলে মেনে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু আমি নিজে মূল অনুবাদে যে অর্থ করেছি তা অগ্রগণ্য হবার কারণ হচ্ছে এই যে, এ হুকুমটি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য। অন্যদিকে স্বপ্নদোষকে বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আলামত হিসেবে গণ্য করার পর হুকুমটি শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কারণ মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্ক হবার সূচনা হচ্ছে মাসিক ঋতুস্রাব, স্বপ্নদোষ নয়। কাজেই আমার মতে হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতদিন ঘরের ছেলে মেয়েরা যৌন চেতনা জাগ্রত হবার বয়সে পৌঁছে না ততদিন তারা এ নিয়ম মেনে চলবে। এরপর যখনই তারা এ নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছে যাবে তখনই তাদের যে হুকুম মেনে চলতে হবে তা সামনে আসছে।

৮৮. মূলে عورات (আওরাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "এ তিনটি সময় তোমাদের জন্য আওরাত।" আওরাত বলতে আমাদের ভাষায় মেয়েলোক বা নারী জাতি বুঝায়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর মানে হয় বাধা ও বিপদের জায়গা এবং যে জিনিসের খুলে যাওয়া মানুষের জন্য লজ্জার ব্যাপার এবং যার প্রকাশ হয়ে পড়া তার জন্য বিরক্তিকর হয় এমন জিনিসের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া কোন জিনিসের অসংরক্ষিত হওয়া অর্থেও এর ব্যবহার হয়। এ অর্থগুলো সবই পরস্পর নিকট সম্পর্কযুক্ত এবং আয়াতের অর্থের সাথে কোন না কোন পর্যায়ে সংযুক্ত। এর অর্থ হচ্ছে এ সময়গুলোতে তোমরা একাকী বা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে এমন অবস্থায় থাকো যে অবস্থায় গৃহের ছেলেমেয়ে বা চাকর বাকরদের হঠাৎ তোমাদের কাছে চলে যাওয়া সংগত নয়। কাজেই এ তিন সময়ে তারা যখন তোমাদের নির্জন স্থানে আসতে চায় তখন তাদের পূর্বাহ্নে অনুমতি নেবার নির্দেশ দাও।

৮৯. অর্থাৎ এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময় নাবালক ছেলেমেয়েরা এবং গৃহস্বামীর ও গৃহকর্ত্রীর মালিকানাধীন গোলাম ও বাঁদীরা সবসময় নারী ও পুরুষদের কাছে তাদের কামরায় বা নির্জন স্থানে বিনা অনুমতিতে যেতে পারে। এ সময় যদি তোমরা কোন অসতর্ক অবস্থায় থাকো এবং তারা অনুমতি ছাড়াই এসে যায় তাহলে তাদের হুমকি ধমকি দেবার অধিকার তোমাদের নেই। কারণ কাজের সময় নিজেদেরকে এ ধরনের অসতর্ক অবস্থায় রাখা তোমাদের নিজেদেরই বোকামী ছাড়া তো আর কিছুই নয়। তবে যদি তোমাদের শিক্ষা দীক্ষা সত্ত্বেও নির্জনবাসের এ তিন সময় তারা অনুমতি ছাড়াই আসে তাহলে তারা দোষী হবে। অন্যথায় তোমরা নিজেরাই যদি তোমাদের সন্তান ও গোলাম–বাঁদীদের এ আদব–কায়দা ও আচার–আচরণ শিক্ষা না দিয়ে থাকো, তাহলে তোমরা নিজেরাই গোনাহগার হবে।

৯০. উপরোক্ত তিনটি সময় ছাড়া অন্য সবসময় ছোট ছেলেমেয়ে ও গোলাম–বাঁদীদের বিনা হুকুমে আসার সাধারণ অনুমতি দেবার এটিই হচ্ছে কারণ। এ থেকে উসূলে ফিকাহর এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শরীয়াতের বিধানসমূহ কোন না কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক হুকুমের পেছনে নিশ্চিতভাবেই কোন না কোন কার্যকারণ আছেই, তা বিবৃত হোক বা না হোক।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

আর যখন তোমাদের সন্তানরা বুদ্ধির সীমানায় পৌঁছে যায়[৯১] তখন তাদের তেমনি অনুমতি নিয়ে আসা উচিত যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে থাকে। এভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াত তোমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন ও বিজ্ঞ।

আর যেসব যৌবন অতিক্রান্ত মহিলা[৯২] বিয়ের আশা রাখে না, তারা যদি নিজেদের চাদর নামিয়ে রেখে দেয়,[৯৩] তাহলে তাদের কোন গোনাহ নেই, তবে শর্ত হচ্ছে তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী হবে না।[৯৪] তবু তারাও যদি লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে তাহলে তা তাদের জন্য ভালো এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৯১. অর্থাৎ সাবালক হয়ে যায়, যেমন ৮৭ টীকায় বলা হয়েছে ছেলেদের ক্ষেত্রে স্বপ্নদোষ ও মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক ঋতুস্রাব থেকেই তাদের সাবালকত্ব শুরু হয়। কিন্তু যেসব ছেলেমেয়ে কোন কারণে বেশী বয়স পর্যন্ত এসব পরিবর্তন মুক্ত থাকে তাদের ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদের মতে এ অবস্থায় ১৫ বছরের ছেলেমেয়েকে সাবালক মনে করা হবে। ইমাম আবু হানীফার একটি উক্তি এর সমর্থন করে। কিন্তু ইমামের বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে এ অবস্থায় ১৭ বছরের মেয়ে ও ১৮ বছরের ছেলেকে সাবালক গণ্য করা হবে। কুরআন ও হাদীসের কোন বক্তব্য এ দু'টি উক্তির ভিত্তি নয় বরং এর ভিত্তি গড়ে উঠেছে ফিকাহভিত্তিক ইজতিহাদের ওপর। কাজেই সারা দুনিয়ায় চিরকালই যেসব ছেলের স্বপ্নদোষ হয়নি ও যেসব মেয়ের ঋতুস্রাব দেখা দেয়নি তাদের সাবালকত্বের জন্য ১৫ বা ১৮ বছর বয়সকেই যে সীমানা হিসেবে মেনে নেয়া হবে এমন কোন কথা নেই। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের অবস্থা বিভিন্ন হয়। আসলে, সাধারণত কোন দেশে যেসব বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বপ্নদোষ ও মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া শুরু হয় তাদের গড়পড়তা পার্থক্য বের করে নিতে হবে, তারপর যেসব ছেলেমেয়ের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক কারণে এ চিহ্নগুলো যথাযথ উপযোগী সময়ে প্রকাশিত না হয় তাদের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ বয়সের ওপর এ গড়পড়তার বৃদ্ধি ধরে

তাকে সাবালকত্বের বয়স গণ্য করতে হবে। যেমন কোন দেশে সাধারণত কমপক্ষে ১২ এবং বেশীর পক্ষে ১৫ বছর বয়সের ছেলের স্বপ্নদোষ হয়। এ ক্ষেত্রে গড়পড়তা পার্থক্য হবে দেড় বছর। আর অস্বাভাবিক ধরনের ছেলেদের জন্য আমরা সাড়ে ষোল বছর বয়ঃসীমাকে সাবালকত্বের বয়স গণ্য করতে পারবো। এ নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের আইনবিদগণ নিজেদের এলাকার অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি সীমা নির্ধারণ করতে পারেন।

১৫ বছরের সীমার পক্ষে একটি হাদীস পেশ করা হয়। এটি ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, "আমার বয়স ছিল চৌদ্দ, সে সময় ওহোদ যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আমাকে পেশ করা হয়। তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশ নেবার অনুমতি দেননি। তারপর খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে আবার পেশ করা হয়। তখন আমার বয়স হয় ১৫ বছর। এ সময় তিনি আমাকে অনুমতি দেন।" (সিহাহে সিত্তা ও মুসনাদে আহমাদ) কিন্তু দু'টি কারণে এ হাদীসটি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা যেতে পারে না। এক, ওহোদ যুদ্ধ ৩ হিজরীর শওয়াল মাসের ঘটনা এবং খন্দকের যুদ্ধ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের কথামত ৫ হিজরীর শওয়াল এবং ইবনে সা'দের বক্তব্য মতে ৫ হিজরীর যিলকদ মাসে সংঘটিত হয়। দুটো যুদ্ধের মধ্যে পুরো দু'বছর বা তার চেয়ে বেশী দিনের ব্যবধান রয়েছে। এখন যদি ওহোদ যুদ্ধের সময় ইবনে উমরের বয়স হয় ১৪ বছর তাহলে কেমন করে খন্দকের যুদ্ধের সময় তা শুধুমাত্র ১৫ বছর হয়?" হতে পারে তিনি ১৩ বছর ১১ মাস বয়সে ১৪ বছর এবং ১৫ বছর ১১ মাসকে ১৫ বছর বলেছেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য সাবালক হওয়া এক জিনিস এবং সামাজিক ব্যাপারের জন্য আইনগতভাবে সাবালক হওয়া অন্য জিনিস। এ দুয়ের মধ্যে কোন অনিবার্যতার সম্পর্ক নেই। কাজেই এদের একটিকে অন্যটির জন্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে না। তাই যেসব ছেলের স্বপ্নদোষ হয়নি তাদের সাবালকত্বের জন্য ১৫ বছর বয়ঃসীমা নির্ধারণ করা একটি আনুমানিক ও ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত, কুরআন ও হাদীসের হুকুম নয়, এ ব্যাপারে এটিই সঠিক কথা।

৯২. মূলে বলা হয়েছে قَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ অর্থাৎ "মহিলাদের মধ্য থেকে যারা বসে পড়েছে" অথবা "বসে পড়া মহিলারা।" এর অর্থ হচ্ছে, হতাশার বয়স অর্থাৎ মহিলাদের এমন বয়সে পৌঁছে যাওয়া যে বয়সে আর তাদের সন্তান জন্ম দেবার যোগ্যতা থাকে না। যে বয়সে তার নিজের যৌন কামনা মৃত হয়ে যায় এবং তাকে দেখে পুরুষদের মধ্যেও কোন যৌন আবেগ সৃষ্টি হতে পারে না। পরবর্তী বাক্য এ অর্থের দিকেই ইংগিত করছে।

৯৩. মূল শব্দ হচ্ছে يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ "নিজেদের কাপড় নামিয়ে রাখে।" কিন্তু এর অর্থ সমস্ত কাপড় নামিয়ে উলংগ হয়ে যাওয়া তো হতে পারে না। তাই সকল মুফাস্সির ও ফকীহ্ সর্বসম্মতভাবে এর অর্থ নিয়েছেন এমন চাদর যার সাহায্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখার হুকুম সূরা আহযাবের يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ আয়াতে দেয়া হয়েছিল।

৯৪. মূল শব্দ হচ্ছে غَيْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِيْنَةٍ "সৌন্দর্য সহকারে সাজসজ্জা প্রকাশকারী হয় না। تَبَرُّج মানে হচ্ছে প্রকাশ ও প্রদর্শনী করা। بَارِج বলা হয় এমন খোলা নৌকা বা জাহাজকে যার ওপরে ছাদ হয় না। এ অর্থে মহিলাদের জন্য এ শব্দটি তখনই বলা হয় যখন তারা পুরুষদের সামনে তাদের নিজেদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে। কাজেই

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

কোন অন্ধ, খঞ্জ বা রুগ্ন (যদি কারোর গৃহে খেয়ে নেয় তাহলে) কোন ক্ষতি নেই, আর তোমাদের কোন ক্ষতি নেই নিজেদের গৃহে খেলে অথবা নিজেদের বাপ–দাদার গৃহে, নিজেদের মা–নানীর গৃহে, নিজেদের ভাইয়ের গৃহে, নিজেদের বোনের গৃহে, নিজেদের চাচার গৃহে, নিজেদের ফুফুর গৃহে, নিজেদের মামার গৃহে, নিজেদের খালার গৃহে অথবা এমন সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছে কিংবা নিজেদের বন্ধুদের গৃহে।[৯৫] তোমরা এক সাথে খাও বা আলাদা আলাদা, তাতে কোন ক্ষতি নেই।[৯৬] তবে গৃহে প্রবেশ করার সময় তোমরা নিজেদের লোকদের সালাম করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে কল্যাণের দোয়া, বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সামনে আয়াত বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে।

আয়াতের অর্থ হচ্ছে, চাদর নামিয়ে দেবার এ অনুমতি এমন সব বৃদ্ধাদেরকে দেয়া হচ্ছে যাদের সাজসজ্জা করার ইচ্ছা ও শখ খতম হয়ে গেছে এবং যাদের যৌন আবেগ শীতল হয়ে গেছে। কিন্তু যদি এ আগুনের মধ্যে এখনো একটি স্ফুলিংগ সজীব থেকে থাকে এবং তা সৌন্দর্যের প্রদর্শনীর রূপ অবলম্বন করতে থাকে তাহলে আর এ অনুমতি থেকে লাভবান হওয়া যেতে পারে না।

৯৫. এ আয়াতটি বুঝতে হলে তিনটি কথা বুঝে নেয়া প্রয়োজন। প্রথমত এ আয়াতটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি রুগ্ন, খঞ্জ, অন্ধ ও অনুরূপ অন্যান্য অক্ষমদের ব্যাপারে এবং দ্বিতীয়

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

৯.রুকূ'

মু'মিন[৯৭] তো আসলে তারাই যারা অন্তর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানে এবং যখন কোন সামষ্টিক কাজে রসূলের সাথে থাকে তখন তার অনুমতি ছাড়া চলে যায় না।[৯৮] যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাসী। কাজেই তারা যখন তাদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায়[৯৯] তখন যাকে চাও তুমি অনুমতি দিয়ে দাও[১০০] এবং এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করো।[১০১] আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

অংশটি সাধারণ লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত কুরআনের নৈতিক শিক্ষাবলীর মাধ্যমে আরববাসীদের মন–মানসে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছিল সে কারণে হালাল–হারাম ও জায়েয–নাজায়েযের পার্থক্যের ব্যাপারে তাদের অনুভূতি হয়ে উঠেছিল চরম সংবেদনশীল। ইবনে আব্বাসের উক্তি অনুযায়ী আল্লাহ যখন তাদের হুকুম দিলেন : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (একে অন্যের সম্পদ নাজায়েয পথে খেয়ো না) তখন লোকেরা একে অন্যের বাড়িতে খাবার ব্যাপারেও খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগলো। এমনকি যতক্ষণ গৃহ মালিকের দাওয়াত ও অনুমতি একেবারে আইনগত শর্ত অনুযায়ী না হতো ততক্ষণ তারা মনে করতো কোন আত্মীয় ও বন্ধুর বাড়িতে খাওয়াও জায়েয নয়। তৃতীয়ত এখানে নিজেদের গৃহে খাবার যে কথা বলা হয়েছে তা অনুমতি দেবার জন্য নয় বরং একথা মনের মধ্যে বসিয়ে দেবার জন্য যে, নিজের আত্মীয় ও বন্ধুদের বাড়িতে খাওয়াও ঠিক তেমনি যেমন নিজের বাড়িতে খাওয়া। অন্যথায় একথা সবাই জানে, নিজের বাড়িতে খাবার জন্য কারোর অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল না। এ তিনটি কথা বুঝে নেয়ার পর আয়াতের এ অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, অক্ষম ব্যক্তি নিজের ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য প্রত্যেক গৃহে ও প্রত্যেক জায়গায় খেতে পারে। তার অক্ষমতাই সমগ্র সমাজে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তাই যেখান থেকেই সে খাবার জিনিস পাবে তা তার জন্য জায়েয হবে। আর সাধারণ লোকের ব্যাপারে বলা যায়, তাদের জন্য

তাদের নিজেদের গৃহ এবং যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের গৃহ সমান। তার মধ্যে যেখানেই তারা খাক না কেন সে জন্য গৃহস্বামীর যথারীতি অনুমতি পেলে তবে খাবে, অন্যথায় তা অবিশ্বস্ততা ও আত্মসাত বলে গণ্য হবে, এ ধরনের কোন শর্তের প্রয়োজন নেই। লোকেরা যদি তাদের মধ্য থেকে কারোর গৃহে যায়, সেখানে গৃহস্বামী উপস্থিত না থাকে এবং তার স্ত্রী–ছেলেমেয়েরা কিছু খাবার নিয়ে আসে তাহলে তারা নিসংকোচে তা খেতে পারে।

যেসব আত্মীয়–পরিজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সন্তানদের উল্লেখ এ জন্য করা হয়নি যে, সন্তানদের গৃহ নিজেরই গৃহ হয়ে থাকে।

বন্ধুদের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে, অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কথা বলা হয়েছে, যাদের অনুপস্থিতিতে অতিথি বন্ধুরা যদি তাদের সবকিছু খেয়েও চলে যায় তাহলে তারা নারাজ হওয়া তো দূরের কথা উলটো আরো খুশিই হবে।

৯৬. প্রাচীন আরবের কোন কোন গোত্রের আচার ও রীতিনীতি এই ছিল যে, তারা প্রত্যেকে নিজের জন্য খাবার নিয়ে আলাদা বসে খেতো। তারা সবাই মিলে এক জায়গায় বসে খাওয়াটা খারাপ মনে করতো। যেমন হিন্দুরা আজো এটা খারাপ মনে করে। অন্য দিকে কোন কোন গোত্র আবার একাকী খাওয়া খারাপ মনে করতো। এমন কি সাথে কেউ খেতে না বসলে তারা অভুক্ত থাকতো। এ আয়াতটি এ ধরনের বিধি–নিষেধ খতম করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।

৯৭. মুসলমানদের জামায়াতের নিয়ম–শৃংখলা আগের তুলনায় আরো বেশী শক্ত করে দেবার জন্য এ শেষ নির্দেশাবলী দেয়া হচ্ছে।

৯৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্তগণ এবং ইসলামী জামায়াত ব্যবস্থার আমীরগণের জন্যও এ একই বিধান। কোন সামগ্রিক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বা শান্তি যে কোন সময় মুসলমানদের যখন একত্র করা হয় তখন আমীরের অনুমতি ছাড়া তাদের ফিরে যাওয়া বা ছড়িয়ে পড়া কোনক্রমেই জায়েয নয়।

৯৯. এর মধ্যে এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, কোন যথার্থ প্রয়োজন ছাড়া অনুমতি চাওয়া তো আদতেই অবৈধ। বৈধতা কেবল তখনই সৃষ্টি হয় যখন যাবার জন্য কোন প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দেয়।

১০০. অর্থাৎ প্রয়োজন বর্ণনা করার পরও অনুমতি দেয়া বা না দেয়া রসূলের এবং রসূলের পর জামায়াতের আমীরের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। যদি তিনি মনে করেন সামগ্রিক প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাহলে অনুমতি না দেবার পূর্ণ অধিকার তিনি রাখেন। এ অবস্থায় একজন মু'মিনের এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

১০১. এখানে আবার সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, অনুমতি চাওয়ার মধ্যে যদি সামান্যতম বাহানাবাজীরও দখল থাকে অথবা সামগ্রিক প্রয়োজনের ওপর ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা সক্রিয় থাকে, তাহলে এ হবে একটি গোনাহ। কাজেই রসূল ও তাঁর স্থলাভিষিক্তের শুধুমাত্র অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হলে চলবে না বরং যাকেই অনুমতি দেবেন সংগে সংগে একথাও বলে দেবেন যে, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

হে মুসলমানরা! রসূলের আহবানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহবানের মতো মনে করো না।[১০২] আল্লাহ তাদেরকে ভালো করেই জানেন যারা তোমাদের মধ্যে একে অন্যের আড়ালে চুপিসারে সটকে পড়ে।[১০৩] রসূলের হুকুমের বিরুদ্ধাচারণকারীদের ভয় করা উচিত যেন তারা কোন বিপর্যয়ের শিকার না হয়[১০৪] অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব না এসে পড়ে। সাবধান হয়ে যাও, আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। তোমরা যে নীতিই অবলম্বন করো আল্লাহ তা জানেন। যেদিন লোকেরা তাঁর দিকে ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা কি সব করে এসেছে। তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

১০২. মূলে دُعَاء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ ডাকা ও আহবান করা হয় আবার দোয়া করাও হয়। তাছাড়া دعاء الرسول এর মানে রসূলের ডাক বা দোয়াও হতে পারে আবার রসূলের আহবানও হতে পারে। এসব বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে এবং তিনটি অর্থই সঠিক ও যুক্তিসংগত।

এক ঃ "রসূলের আহবানকে কোন সাধারণ মানুষের আহবানের মতো মনে করো না।" অর্থাৎ রসূলের আহবান অস্বাভাবিক গুরুত্বের অধিকারী। অন্য কারোর আহবানে সাড়া দেয়া না দেয়ার স্বাধীনতা আছে কিন্তু রসূলের আহবানে না গেলে বা মনে ক্ষীণতম সংকীর্ণতা অনুভব করলে ঈমান বিপন্ন হয়ে পড়বে।

দুই ঃ "রসূলের দোয়াকে সাধারণ মানুষের দোয়ার মতো মনে করো না" তিনি খুশী হয়ে দোয়া করলে তোমাদের জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন নিয়ামত নেই আর নারাজ হয়ে বদদোয়া করলে তার চেয়ে বড় আর কোন দুর্ভাগ্য তোমাদের জন্য থাকবে না।

তিন ঃ "রসূলকে ডাকা সাধারণ মানুষের একজনের অন্য এক জনকে ডাকার মতো হওয়া উচিত নয়।" অর্থাৎ তোমরা সাধারণ লোকদেরকে যেভাবে তাদের নাম নিয়ে উচ্চস্বরে ডাকো সেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকো না। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি চরম শিষ্টাচার ও মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। কারণ তাঁর প্রতি

সামান্যতম বেআদবীর জন্যও আল্লাহর কাছে জবাবদিহির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।

১০৩. মুনাফিকদের আর একটি আলামত হিসেবে একথাটি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইসলামের সামগ্রিক কাজের জন্য যখন ডাকা হয় তখন তারা এসে যায় ঠিকই কিন্তু এ উপস্থিতি তাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অপছন্দনীয় হয়, ফলে কোন রকম গা ঢাকা দিয়ে তারা সরে পড়ে।

১০৪. ইমাম জাফর সাদেক (র) বিপর্যয় অর্থ করেছেন "জালেমদের কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি।" অর্থাৎ যদি মুসলমানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তাদের ওপর জালেম ও স্বৈরাচারী শাসক চাপিয়ে দেয়া হবে। মোটকথা এটাও এক ধরনের বিপর্যয় হতে পারে। আর এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ধরনের বিপর্যয় হওয়া সম্ভবপর। যেমন পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, গৃহযুদ্ধ, নৈতিক অবক্ষয়, জামা'আতী ব্যবস্থায় বিশৃংখলা, আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য, রাজনৈতিক ও বস্তুগত শক্তি ভেঙ্গে পড়া, বিজাতির অধীন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।